সহযাত্রিণী

মণীন্দ্রলাল বসু

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা-৬

সহযাত্রিণী

শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু লিখিত

উপন্যাস

রমলা
জীবনায়ন

ছোটগল্প

রক্তকমল
সোণার হরিণ
কল্পলতা
ঋতুপর্ণ

ছেলেদের বই

অজয়কুমার
সোণার কাঠি

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়

প্রীতিভাজনেষু

এই উপন্যাসের নরনারী চরিত্রগুলি ও
ঘটনাবলী সম্পূর্ণ কাল্পনিক ও অমূলক।

হাওড়া স্টেশন।

পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফর্মে বোম্বে মেল দাঁড়িয়ে।

সাড়ে সাতটা বেজে গেছে। নানাবেশী নানাভাষী যাত্রীজনতার চঞ্চল বন্যা বৈদ্যুতিক আলোকমালার তীব্র দীপ্তিতে অর্থহীন অদ্ভুত মূর্তিস্রোতের মত। হাঁকাহাঁকি, ঠেলাঠেলি, ছুটোছুটির অন্ত নেই।

স্টেশনের এই জনতার দিকে ক্লান্ত চোখে চেয়ে কল্যাণকুমার ঘোষ পাইপে তামাক ভরলে। ইংলণ্ডে সে যে তামাক খেত সে তামাক সে অনেক খুঁজে যোগাড় করেছে, হিসেব করে খরচ করতে হবে। কিন্তু তাড়াতাড়ি ভরতে গিয়ে খানিকটা তামাক প্ল্যাটফর্মে পড়ে গেল। চারিদিকের ভিড়ে কোলাহলে তার মাথা ধরে গেছে।

কল্যাণ সদ্যইংলণ্ডপ্রত্যাগত বেকার যুবক। ইয়োরোপীয় জীবনের রঙীন আভা এখনও তার চোখে লেগে আছে সুখস্বপ্ন-স্মৃতির মত। প্যারিসের গার্ দ্য নর্ডের জনতার রূপ তার চোখে ভেসে উঠল। সে জনতার উদ্বেল তরঙ্গলীলায় যেমন একটা ছন্দ আছে তেমনি রঙের ঝলমলানি, ইন্‌প্রেসনিস্ট চিত্রকরের চিত্রপটের নানা বর্ণের ছোপের মত। এ জনতার গতি অসংলগ্ন, বর্ণের বৈচিত্র্য বা উজ্জ্বলতা নেই।

পকেট থেকে ছোট্ট ঝক্‌ঝকে লাইটার বাহির করে কল্যাণ পাইপে অগ্নিসংযোগ করলে। ছোট ভাগ্নী দীপিকা পাশে দাঁড়িয়েছিল, আইস-ক্রীম-বিক্রেতার গাড়ী কাছে এলেই ডাকবে। ঝক্‌ঝকে ছোট্ট-দেশলাই

দেখে সে লাফিয়ে উঠল। এমন আশ্চর্য্যকর দেশলাই সে আগে কখনও দেখেনি। একটা কল টিপ্‌লে আগুন জলে ওঠে। সে ব্যগ্র হয়ে বললে, রাঙামামা, আমাকে দাও একবার, আমি জালব না, শুধু হাতে ধরে থাকব।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মহিলা-গাড়ী হতে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে শিবাজী চেঁচিয়ে উঠল, আমি একবার জ্বালাব দিদি!

সরোজিনী ছোট খোকার বিছানা পাততে পাততে ধমক দিয়ে উঠল, শিবু, আবার জানলায় মুখ বাড়িয়েছ, দীপা দিয়ে দাও দেশালাই—

দেশলাই পাবার কোন আশা নেই দেখে শিবু চেঁচিয়ে উঠল, রাঙামামা, ইঞ্জিন দেখাবে বলেছিলে, ইঞ্জিন—

সরোজিনী একটু হতাশের সুরে বললে, দাদা, শিবুকে একটু ঘুরিয়ে নিয়ে এস, বড্ড গোলমাল করছে, আমি ততক্ষণ বিছানাগুলো পেতে নি।

মায়ের অনুমতি পেয়ে শিবাজী দরজা খুলে প্ল্যাটফর্ম্মে লাফিয়ে পড়ল। সরোজিনী একটু ভীতভাবে পঞ্চম সন্তানের দিকে চাইলে। ছোট খোকাকে নিয়ে সে ব্যস্ত, এদের দিকে মনোযোগ দিতে পাচ্ছে না। রায়গড়ে জন্ম হয়েছিল বলে তার নাম দেওয়া হয়েছিল, শিবাজী। সরোজিনীর আপত্তি ছিল, তার স্বামীই জোর করে এ নাম দিয়েছিলেন, এখন নামের গুণে ছেলেটি দিন দিন দুর্দ্দান্ত হয়ে উঠছে।

সরোজিনী চেঁচিয়ে বললে, দাদা ওদের হাত ধরে নিয়ে যেও, আর আইস-ক্রীম দিও না। খোকা চেঁচিয়ে ওঠাতে আর কিছু বলা হল না। সরোজিনী ভাবতে লাগল, বোম্বেতে বোধ হয় টেলিগ্রাম করা হয়নি, দাদা নিশ্চয় ভুলে গেছে।

সরোজিনীর স্বামী বোম্বেতে বড় কাজ করে। কল্যাণ এসেছিল

তাদের গাড়ীতে তুলে দিতে। সরোজিনীর বিশেষ ইচ্ছা ছিল, কল্যাণও তাদের সঙ্গে যায়, কিন্তু মায়ের মনে বিশেষ আপত্তি বুঝে কিছু বলে নি। মায়ের ভয়, বোম্বে গেলে কল্যাণ হঠাৎ কোন দিন কোন ইয়োরোপগামী জাহাজ চড়ে বসবে। অনেক চিঠি লেখা ও টেলিগ্রামের পর সাত বছর পরে কল্যাণ বাড়ী ফিরেছে। সেজন্য জগৎতারিণীকে রীতিমত একটি অসুখ পাকিয়ে তুলতে হয়েছিল। এখন সে ছেলেকে তিনি সহজে ছাড়তে রাজী নন।

সরোজিনীর দৃষ্টির আড়াল হতেই কল্যাণ তার ভাগনে ভাগিনেয়ীর হাত ছেড়ে দিল, তারা ছুটে চলল সামনে। হন্‌হন্‌ করে সেও চলল। দ্রুতছন্দে চলার বিলিতী অভ্যাস ছ'মাসের মধ্যেই চলে যায় নি।

পাইপটা হাতে ধরে কল্যাণ নাড়া দিলে। তামাকটা একটু কড়া, ঠিক সেই স্বাদ, সেই গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে না। ভায়লেট এ পাইপ তাকে উপহার দিয়েছিল, আর তিন কৌটা তামাক। সে তামাকের স্বাদ গন্ধ কেন পাওয়া যায় না! ভায়লেট! সে এখন কোথায় কে জানে! নিশ্চয় গ্লাসগোতে নেই। দু মেল তার কোন চিঠি পাওয়া যায় নি।

পাইপ টানতে টানতে কল্যাণ এগিয়ে চলল। চেহারা লম্বা নয়, কিন্তু ছিপ্‌ছিপে বলে তাকে বেঁটে দেখায় না; স্নিগ্ধ গৌর মুখশ্রী; বোম্বে-বন্দরে যখন সে নেমেছিল তখন এ গৌরবর্ণে ঘন রক্তিমা ছিল, এখন এ রঙ ফ্যাকাসে, ঘসা কাচের মত জৌলসহীন। মুখখানি গোল, এখন একটু কৃশ দেখায়, পাকা আম শুকিয়ে চুপ্‌সে গেলে যেমন হয়। প্রথমেই চোখে পড়ে খুব ছোট-করে চুল-ছাটা বড় মাথা, ভারী নিরেট গুলের মত। দেখে মনে হয় না, সেই মাথার মধ্যে পরমাণু-তত্ত্বের নূতন নূতন থিওরী, অঙ্কশাস্ত্রের বড় বড় ফরমুলা, জাহাজ তৈরি করবার নানা নব পরিকল্পনা ভরতি আছে। সুন্দর সরু নাকের দু'পাশে দীপ্ত চোখ দুটি

দেখলেই বোঝা যায় এ তীক্ষ্ণধী। উজ্জ্বল চোখ দু'টির উপর এখন ক্লান্তির ঔদাস্যের ছায়া এসে পড়েছে, যেমন তার গৌরবর্ণ মুখকান্তির ওপর পাইপের ধূম্রজাল ছড়িয়ে পড়েছে।

রুশীয় ব্লাউজ ধরনের সোনালী সিল্কের ঢিলে পাঞ্জাবি পরা, দেশী ধুতির কালোপাড় কোঁচা লুটিয়ে পড়েচে, পায়ে তালতলার নব সংস্করণের কটকী চটিজুতা, বেশের বাহুল্য নেই কিন্তু সুষ্ঠু ব্যক্তিত্ব আছে, বিলাতে দীর্ঘকাল থেকেও সে বাঙ্গালীয়ানা ভোলেনি।

ইঞ্জিন তখনও এসে পৌছায়নি। কি একটা গোলমাল হয়েছে! ক্ষতিপূরণস্বরূপ দীপু ও শিবুকে আইস-ক্রীম খাওয়াতে হল।

ফেরার পথে কল্যাণ প্রথম শ্রেণীর এক কুপের সামনে থমকে দাঁড়াল। পাইপে লম্বা টান লাগিয়ে সে শিবুর হাত ছেড়ে দিলে। গাড়ীর ভেতর রূপবতী বাঙ্গালী মহিলা একা বসে। গজদন্তশুভ্র কপোলের এক অংশ দেখা যাচ্ছে, চিবুকের চারু-রেখা যেন সুদূরে বিলীন, ঘননীল বর্ণের ব্লাউজের ফোলা হাত রক্তবর্ণ স্থলপদ্মের মত। নয়নানন্দকর এ রূপলাবণ্য।

কল্যাণ চমকে উঠল। এ মুখ ত তার চেনা। ওই কালো ভুরুর টান, কপোলের কুঞ্চন, চিবুকের বঙ্কিমভঙ্গী, ওই মুখের প্রতি রেখা, ওই অদ্ভুত শুভ্র রঙ, বুঝি তার জানা। যেন কোন অপূর্ব্ব অজানা দেশে স্বপ্নে দেখেছিল, তারপর ভুলে গিয়েও ভুলতে পারে নি।

পাইপের আগুন নিভে গেছে। দীপার হাত ধরে কল্যাণ এগিয়ে চলল। সরোজিনী উদ্বিগ্নভাবে জানালায় মুখ বাড়িয়ে আছে। চেঁচিয়ে বলল, দাদা, আর গাড়ী ছাড়বার বেশি দেরি নেই, ওদের তুলে দিয়ে গাড়ীর দরজা বন্ধ করে দাও।

গাড়ীতে এক বর্ষিয়সী মহিলা উঠে হাঁপাচ্ছেন। তিনটি ট্রাঙ্ক, দু'টো

বস্তা, গুড়ের নাগরি, চারটে পুঁটলি, তাঁর জিনিসপত্তরে গাড়ীর ভেতর ভরে গেছে।

তকমা-পরা এক চাপরাসী এসে কল্যাণকে লম্বা সেলাম করে বললে, মেমসাহেব আপনাকে সেলাম দিয়েছেন।

মেমসাহেব যে কে তা কল্যাণ বেশ বুঝলে, তবু আশ্চর্য্যের ভান করলে।

সরোজিনী উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, না দাদা, তুমি এখন কোথাও যেও না, টেলিগ্রাম করেছ?

পাইপ ধরিয়ে কল্যাণ বললে, এক মিনিট, আমি আসছি, এখনও গাড়ী ছাড়তে দেরি আছে।

শিবাজী বলে উঠল, হাঁ, মা, এখনও ইঞ্জিন লাগেনি।

কৃষ্ণ ভ্রূলতার তলে আয়ত নয়নের কৃষ্ণতারকার রূপ তেমনি জ্যোতির্ম্ময়, তেমনি মায়াময়, তেমনি রহস্যঘন। কল্যাণের বুকের রক্ত দুলে উঠল। অন্তরের এ অপূর্ব্ব শিহরণ সে বহুদিন অনুভব করেনি। ইয়োরোপে তাকে একেবারে blasé করে দেয় নি। মুগ্ধ হয়ে সে চেয়ে রইল।

—কল্যাণ নাকি!

—তাইত মনে হচ্ছে।

—মনে ত হচ্ছিল না, পেয়াদা দিয়ে মনে করিয়ে দিতে হল, ভেতরে এসো।

—গাড়ী ছাড়তে বোধ হয় বেশি দেরি নেই।

—টাইম-টেবিল অনুসারে নেই, কিন্তু ছাড়তে দেরি হবে।

দরজা খুলে কল্যাণ গাড়ীতে প্রবেশ করল।

—ভাই, পাইপটা—

—ভেরি সরি, মনে ছিল না।

অনেক কথাই ধীরে ধীরে কল্যাণের মনে হল। মনে পড়ল, অনুপমা এখন অতি উচ্চপদস্থ এক ভারতীয় গভর্ণমেণ্ট অফিসারের স্ত্রী; মনে পড়ল, তামাকের ধোঁয়া অনুপমার সহ্য হয় না; মনে পড়ল, গলাকাটা ব্লাউজের রঙীন লেসের ফাঁক দিয়ে যে সুচিক্কণ শুভ্রচর্ম্মের আভা দেখা যায়, তাহারি কোমল আবরণতলে বক্ষপঞ্জরের মধ্যে দক্ষিণ ফুসফুসে যক্ষ্মা-জীবাণুর সঙ্গে সংগ্রামের সুদীর্ঘ ইতিহাস গোপনে লেখা আছে। হৃদযন্ত্রের ধক্‌ধক্ শব্দে সে সংগ্রামের জয়ধ্বনি কি অহর্নিশি বাজছে, অথবা সে যুদ্ধ চলছে দিন রাত ধরে?

—কি দেখছ, মোটা হয়েছি!

—বোধ হয় হয়েছ, কেমন আছ আজকাল?

—কেমন আছি? বেশ আছি, মন্দ কি, জ্বরটা অনেক দিন হয়নি—তারপর, কবে ফিরলে, এসে একটা খবরও দাওনি!

—মা'র অসুখে কোথাও যাওয়া হয়নি।

—হাঁ, জেঠাইমার অসুখ করেছিল, শুনেছিলাম, কেমন আছেন তিনি?

—মা'র অসুখের জন্যই ত তাড়াতাড়ি ফিরতে হল, গ্লাসগোতে কোস টা শেষ করে আসতে পারলুম না।

—তোমার ত কেম্ব্রিজে ডিগ্রি হয়ে গেছে।

—হাঁ, তারপর গ্লাসগোতে গেছলুম জাহাজ তৈরি শিখতে; খুব সুবিধা পাওয়া গেছল—

—ভালই করেছ, চলে এসেছ, শুনছি শীগ্‌গীর যুদ্ধ বাধবে।

কল্যাণের চোখে গ্লাসগোর ঘরের ছবি ভেসে উঠল। কাচের টেবিলের ওপর ককটেলের গেলাস। মিন্টি ইজিচেয়ারে ভায়লেট এলিয়ে বসে। কি গভীর নীল তার চোখ! আর অনুপমার চোখ কি ঘন কৃষ্ণ! ভায়লেটের বাবা এক বড় পোত নির্ম্মাতা কোম্পানীর ডিরেক্টার, তাঁরি সুপারিশে সে জাহাজ তৈরি শেখার সুবিধা পেয়েছিল। কল্যাণ চুপ করে রইল।

স্তব্ধতা ভঙ্গ করে অনুপমা বললে, জেঠাইমা কেমন আছেন বললে না ত?

—মা, একরকম সেরে গেছেন, এ বয়সে এদেশে এর চেয়ে আর কি ভাল থাকবেন।

—দেখতে যাবার বড় ইচ্ছে ছিল।

—কিন্তু অন্য নানা ইচ্ছার মত কার্য্যে পরিণত হয়নি।

—ঠিক বলেছ। আমি যে কি বন্দিনী তুমি জান না।—

কল্যাণ অনুপমার দিকে স্থিরদৃষ্টিতে চাইল। অধর রাঙ্গা হয়ে উঠেছে, কালো চোখ শ্রাবণের জলভরা মেঘের মত আরও ঘন কালো।

—বন্দিনী, মুক্তির প্রতীক্ষায় বসে আছ? এ বন্ধন বড় সুখের!

—ঠাট্টা নয়, কল্যাণ। জান ত শহর থেকে দূরে থাকতে হয়, তবে গঙ্গার ধারে বাড়ীটা বড় সুন্দর, মস্ত বড় আমবাগান আছে, সেই রাজসাহীর আমবাগানের মত—

—বা, এমন জানলে একদিন যেতুম।

রাজসাহীতেই দুই পরিবারের মধ্যে পরিচয় হয়, কল্যাণের মা অনুপমার জেঠাইমা হলেন। তারপর কলিকাতায় সে হৃদ্যতা ঘনীভূত হয়েছে। বন্ধু-মহল অনেক রকম অনুমান ও ঠাট্টা করেছে। কল্যাণ হঠাৎ বিলেত চলে যাওয়াতে সবাই বিস্ময় প্রকাশ করেছিল। তারপর

অনুপমা যখন জগদীশকে বিবাহ করলে, বন্ধু মহল আরও বিস্মিত হলেও বিজ্ঞজনেরা বললে, অনুপমার সংসার-জ্ঞান আছে, যৌবন চাঞ্চল্যে শুভবুদ্ধি হারায়নি। বিবাহের ছ'মাস পরেই ঘুসঘুসে জ্বর আরম্ভ হল।

অনুপমা বলে যেতে লাগল, তারপর জান ত, ওই পোড়া অসুখ কখন যে তার কি মর্জি হয়, শুয়ে আছি ত দিনের পর দিন শুয়েই আছি। তারপর ডাক্তারদের যদি অনুমতি পাওয়া গেল বাহির হবার, ভদ্রলোকের আর সময় হয় না, কাজ, খালি কাজ,—আর আমাকে একাও কোথা যেতে দেবেন না—খালি কাজ—

—এখানে ত একা ছেড়ে দিয়ে গেছেন দেখছি। .

—দেখ না, এসেই গেছেন টেলিফোন করতে, এতদিন পরে ছুটি মঞ্জুর হয়েছে, কিন্তু ডাক পড়লেই ছুটে আসতে হবে, একটা প্রোগ্রাম করবার জো নেই, ওই ফুলের তোড়াটা সরিয়ে রাখ ত, বড় উগ্র গন্ধ—

—আমার সঙ্গে লণ্ডনে একবার দেখা হয়েছিল, তখন জানলে ভাল করে আলাপ করতুম।

—সে দুঃখ এখন দূর করতে পার।

—কত দূর যাচ্ছ?

—ঠিক আছে কি? ইচ্ছে অজন্তা ইলোরা দেখে বোম্বে যাব, সেখান থেকে মালাবার পর্য্যন্ত—তুমি?

—আমি ত কোথাও যাচ্ছি না। আমার বোন সরোজকে তুলে দিতে এসেছি।

—সরোজ কে? বুঁচি, বোম্বেতে যার বিয়ে হয়েছে, সে যাচ্ছে এ গাড়ীতে—তুমিও চল বোম্বেতে, বেশ মজা হবে।

—তুমি কি ভাবছ আমরা রাজসাহী যাচ্ছি, যে দুপুরে আমবাগানে কাঁচা আম পাড়বে, কাঁচা লঙ্কা দিয়ে খাবে?

—অথবা নোয়াখালি—সেই নৌকা বেয়ে চলা—ও good old days! নয় কল্যাণ?

কল্যাণ মুগ্ধভাবে অনুপমার মুখের দিকে চাইলে। এ মুখ শুধু অনুপম সুন্দর নয়, মনের ভাবের সঙ্গে এ মুখের রং বদলায়, নির্ম্মল আকাশে ভোরের আলোর মত স্বর্ণময় স্নিগ্ধ আভা।

স্নিগ্ধস্বরে অনুপমা বললে, বোসো, উঠো না।

—দেখি, দীপা আবার কি বলে।

—ওই বুঝি বুঁচির মেয়ে, কি রে, আয় ভেতরে—

দীপিকা গাড়ীর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বিস্ময়মুগ্ধনেত্রে অনুপমাকে দেখছিল। কানের হীরার ফুল কি সুন্দর! হাতের চুড়িগুলি কি ঝক্‌ঝক্ করছে, নখগুলি লাল রঙ করা কেন? তার মায়ের ত এরকম নেই। সে চমকে বললে, রাঙামামা, খোকা ন্যাকার করেছে, তুমি শীগ্‌গীর এসো।

—দেখি খোকা আবার কি কাণ্ড বাধালে।

—আবার আসছ ত, চল বোম্বে—গাড়ীতে বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে। আর মালতী মল্লিক যাচ্ছে, আলাপ করিয়ে দেব, বুঝলে?

কল্যাণ দেখলে, অনুপমার কটাক্ষে এখনও বিদ্যুৎ খেলে যায়, গুরুগুরু ধ্বনি সে শুনলে আপন বক্ষে।

সরোজিনীর গাড়ীতে এসে কল্যাণ দেখলে ছোট খোকা সামান্য বমি করেছে, একটু দুধ তুলেছে মাত্র, কিন্তু তার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠেছে, সে ভয়ঙ্কর চেঁচাচ্ছে। আর সরোজিনীর মুখ পাংশুবর্ণ।

—দাদা, যদি ফিট হয়!

সরোজিনী রীতিমত ভয় পেয়েছে। বর্ষিয়সী মহিলাটি অভয় দিচ্ছেন, ও কিছু নয় মা, গরম নেগেছে মা, বাছার গরম—

—না মাসীমা, আপনি জানেন না, ফিট হবার আগে ওর অমনি মুখ চোখ লাল হয়।

এরি মধ্যে মাসীমা পাতান হয়ে গেছে।

প্ল্যাটফর্ম্মে, বিশেষতঃ পাশের দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়ীর সামনে, অসম্ভব ভিড় হয়েছে। কে একজন সাধু যাচ্ছেন, তাঁর শিষ্য-শিষ্যা-ভক্তবৃন্দে চারিদিক পরিপূর্ণ।

কল্যাণ ধীরে বললে, ভাবছি আমি তোদের সঙ্গে যাই।

—হাঁ, দাদা, মাকে আমি বুঝিয়ে লিখব'খন, তুমি চল। খোকা যদি পথে অসুখ করে বসে।

—সেই জন্যেই ত বলছি।

—কিন্তু টিকিট কিনে আনার সময় আছে কি? আমি টাকা দিচ্ছি।

—এখানে গার্ডকে বলে দিচ্ছি, বর্দ্ধমানে কিনে নিলেই হবে।

সরোজিনীর মুখে ভয়ের ভাব কেটে গেল। সে স্নিগ্ধস্বরে বললে, চুপ কর খোকা অত চেঁচাস্ নে, রাঙামামা সঙ্গে যাচ্ছে, চুপ কর্ সোনা। খোকার কিন্তু চীৎকারের বিরাম নেই। কুলিদের চেঁচানো, সন্ন্যাসীর ভক্তবৃন্দের কলরব, স্টেশনের সব কোলাহল ছাড়িয়ে তার চীৎকারধ্বনি। সরোজিনী উদ্বিগ্ন হয়ে বললে, এ যে থামতে চায় না, দাদা, কি হয়েছে খোকা!

দত্তগিন্নি বললেন, আমার কোলে দাও ত মা, বোধ হয় পেট কামড়াচ্ছে।

সরোজিনী রেগে বলে উঠল, যদি পেট কামড়ায় ত আপনার কোলে গেলে থামবে কি করে?

কল্যাণ বললে, বোধ হয় জলতেষ্টা পেয়েছে, ওর মুখে চোখে একটু জল দে দেখি।

—ওই ত জল খাওয়ালুম, চুপ কর্! হাড় জ্বালিয়ে খেলে।

খোকার কান্নার শব্দ সন্ন্যাসী প্রেমদাসের কানে পৌঁছাল। তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। তখন পায়ের ধূলো নেবার ব্যস্ততা ও ভিড় জমে উঠেছে। প্রেমদাস তাঁর এক ডাক্তার শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করলেন, পাশের গাড়ীর খোকা বড্ড কাঁদছে?

ডাক্তার শিষ্য ব্যস্ত হয়ে বললে, আপনি উঠবেন না, আমি দেখছি।

শিষ্যদের ভিড় ঠেলে সন্ন্যাসী উঠে বললেন, তুমি ওষুধ দিতে গেলে ওরা নেবে না, আমার মধুর শিশিটা দাও।

ভক্তিমতী এক প্রৌঢ়া বললেন, শিশুর কান্না শুনলে ঠাকুর কি আর স্থির থাকতে পারেন!

সরোজিনী খোকাকে নিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে। খোকাকে কোলে চেপে দুই বেঞ্চির মাঝখানে সরু জায়গায় চঞ্চল হয়ে ঘুরছে। দত্তগিন্নির ট্র্যাঙ্ক পুঁটলি বস্তা জিনিসপত্তরে গাড়ীতে নড়বার বেশি জায়গা নেই। কল্যাণ অসহায় ও বিরক্তভাবে চারিদিকে চাইছে। অন্য কোন গাড়ীতে জায়গা খুঁজে নিতে হবে, সময় বেশি নেই, সারারাত জেগেই কাটাতে হবে বোধ হয়। এমন সময় এক সন্ন্যাসী শিশি হাতে তাদের গাড়ীতে উঠছে দেখে সে রেগে উঠল।

—মশাই, এটা মেয়েদের গাড়ী।

—এটা যে শিশুদেরও গাড়ী!

কল্যাণ বলতে যাচ্ছিল, আপনি কি শিশু, কিন্তু সন্ন্যাসীর প্রশান্ত আননে বেদনাময় কারুণ্যের রূপ দেখে সে স্তব্ধ হয়ে গেল। কান্নার শব্দে লোকটা সত্যই বেদনা পাচ্ছে, মনে হ'ল।

প্রেমদাস ব্যথিত কণ্ঠে বললেন, কেন কাঁদছে মা এত?

সরোজিনী কোন কথা কইতে পারলে না।

গেরুয়া রঙের আলখাল্লা-পরা, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কালো লম্বা কোঁকড়া চুল বৈরাগীদের মত, কাঁচাপাকা দাড়ি, চোখে দীপ্ত জ্যোতি, তেজ ও করুণার সম্মিলন। অপূর্ব্ব এ পুরুষের মূর্ত্তি।

সরোজিনী ভীত মুগ্ধ হয়ে গেল।

প্রেমদাস বললেন, ও যে কাঁদার চেয়ে কাশছে বেশি, ওর গলা খুস্ খুস্ করছে—এই মধু একটু দাও ত মা।

সরোজিনীর করতলে প্রেমদাস একটু মধু ঢেলে দিলেন। মুখে আঙুলে করে মধু দিতেই ছোটখোকা দুই ঠোঁট দিয়ে আঙুল চেপে চুষতে লাগল। সন্ন্যাসীর অপূর্ব্ব মূর্ত্তি দেখেই হোক অথবা মধুর গুণে, খোকা চুপ করলে। হাত বাড়িয়ে সন্ন্যাসীর দাড়ি ধরে টানবার চেষ্টা করলে।

ভক্তবৃন্দ গাড়ীর জানলার ওপর ঝুঁকে পড়েছিল, সবাই জয়ধ্বনি করে উঠল। ঠাকুর যাবার আগে কি মাহাত্ম্য দেখিয়ে গেলেন!

মধুর শিশি সরোজিনীর হাতে দিয়ে প্রেমদাস বললেন, রোজ সকালে এক ঝিনুক মধু খেতে দিও মা, তাহলে খোকার গলা সেরে যাবে।

কল্যাণ ভাবলে, লোকটা সন্ন্যাসী হবার আগে কবিরাজ ছিল, তাতে সুবিধে হল না দেখে এ ব্যবসা ধরেছে। সে ধীরে জিজ্ঞাসা করলে, মশাই ও শুধু মধু, না, ওতে ওষুধ মেশান আছে?

প্রেমদাস হো হো করে হেসে উঠলেন, আরে শুধু মধুতে কি হয়, আছে বৈকি কিছু মেশান, প্রেমরস! প্রেমরস!

সন্ন্যাসীর প্রাণ-খোলা হাসি কল্যাণের ভাল লাগল। লোকটা বোধ হয় ভণ্ড নয়, তবে নতুন শিষ্য যোগাড় করবার আর্ট জানে।

ডাক্তার শিষ্যটি এগিয়ে এসে বললে, ইনি ঠাকুর প্রেমদাস।

'সেক্ হ্যাণ্ড' বলে কল্যাণ হেসে হাত বাড়িয়ে দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু সেটা বড় বিসদৃশ হবে ভেবে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

প্রেমদাস! দত্তগিন্নি পায়ের ধুলো নেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, কিন্তু সম্মুখে ডালের পুঁটলি, নারিকেলের বস্তা পথরোধ করে। তিনি চেঁচিয়ে উঠলেন, ঠাকুর, একটু দাঁড়ান। ঠিক সেই সময়ে গাড়ী সশব্দে নড়ে উঠল। কে যেন দত্তগিন্নিকে ঠেলে বেঞ্চিতে বসিয়ে দিলে। মোটা ভারী শরীর কাঁপতে লাগল।

দীপিকা চেঁচিয়ে উঠল, ওই ইঞ্জিন লেগেছে।

প্রেমদাস গাড়ী থেকে নেমে গেলেন। প্রশান্ত স্নিগ্ধ মুখ।

দত্তগিন্নি হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, আহা পায়ের ধুলো নেওয়া হল না। সরোজিনীও লজ্জিতভাবে ভাবলে, তাই ত, প্রণাম করা হল না। ধীরে সে জিজ্ঞেস করলে, দাদা, উনি বুঝি পাশের গাড়ীতে আছেন, তুমি যাচ্ছ ত দাদা।

—কি বলিস্?

—হাঁ চল দাদা, আমার একা যেতে সাহস হচ্ছে না, কেমন ভয় করছে।

—ভয় কিসের! দেখি, কাছাকাছি কোন গাড়ীতে যদি জায়গা পাই, ছিটকিনিগুলো ঠিকমত বন্ধ করিস্।

পাশের গাড়ী থেকে প্রেমদাসের শিষ্যারা নেমেছেন, শিষ্যরা সবাই এখনও নামেনি। খালি বার্থ আছে কি-না বোঝা যাচ্ছে না।

দু'দিক থেকে দু'জনে কল্যাণকে ডাকলে। ধুতি-পাঞ্জাবি পরা একটি ইংরেজ ও জিপ্‌লাগান সিল্কের চেক্‌শার্ট ও যোধপুরী ব্রিজেস্‌-পরা একটি বাঙ্গালী।

—হ্যালো ঘোষ!

—হ্যালো কল্যাণ!

কল্যাণ অবাক হয়ে দেখলে বাঙ্গালী সাজে আর্থার গ্রেগরি তার সম্মুখে।

—হ্যালো আর্থার, কি আশ্চর্য্য, তুমি এখানে, এই বেশে—excuse me—আরে কনক! May I present আমার শিল্পীবন্ধু কনক রায়, আর ইনি আমার কেম্ব্রিজের সহপাঠী আর্থার গ্রেগরি, আমরা একসঙ্গে রাদারফোর্ডের কাছে কাজ করেছি।

—নমস্কার কনক রায় মহাশয়।

—বা, তুমি ত বেশ ভাল বাংলা শিখেছ আর্থার।

কনক বললে, তুমি কি যাচ্ছ এ গাড়ীতে?

—হাঁ, যাবার ত ইচ্ছা, তবে টিকিট কিনিনি, বার্থও রিজার্ভ করিনি, তাই জায়গা খুঁজছি।

—বেশ, এ গাড়ীতে আমার একটা বার্থ রিজার্ভ করা আছে, তুমি এসো।

গ্রেগরি বললে, আমারও এ গাড়ীতে বার্থ, কিন্তু প্রবেশ করবার উপায় দেখছি না।

কনক বললে, তার চেয়ে চলো রেস্তোরাঁ কারে, পরের স্টেশনে এসে ওঠা যাবে, বড় তেষ্টা পেয়েছে, কি বলেন মিস্টার গ্রেগরি।

—আমার ত খুবই মত, কারণ আমার ক্ষুধা পেয়েছে।

—আপনাদের কি সব সময়ই খিদে পায়—এ গরমে আমার ত খালি তেষ্টা পাচ্ছে।

—প্রবল ক্ষুধা আছে বলেই ত এরা পৃথিবীর এতখানি গ্রাস করতে পেরেছে—

—আর কনেকের তৃষ্ণার পরিমাণ তুমি জান না আর্থার—

—না হে, সে প্যারিসীয় তৃষ্ণা আর নেই।

কনক কল্যাণের কলেজের সহপাঠী ছিল, কিন্তু বন্ধুত্ব জন্মেছিল প্যারিসে। বুলেভারের নৃত্যশালায়, মমার্তের কাবারেতে কত রাত সে ছিল কনকের সঙ্গী।

তিনজনে রেস্তোরাঁ-গাড়ীর দিকে এগিয়ে চল। প্যারিসীয় প্রমোদ-রাতির স্মৃতিতে স্টেশনের আলোগুলি যেন রঙীন হয়ে উঠেছে।

হন্‌হন্ করে চলে ইন্টার ক্লাশের গাড়ী পেরিয়ে কল্যাণ একটু থামলে। বললে, তোমরা এগোও, আমি একটু আসছি।

কল্যাণ ধীরপদে পিছনে ফিরে এল। মধ্যমশ্রেণীর মহিলা-গাড়ীর সামনে একটু দূরে সে ভিড়ের আড়ালে দাঁড়াল। পাইপে তামাক ভরতে লাগল।

মহিলা-গাড়ীতে এক বাঙ্গালী তরুণী একাকিনী বসে। বৃহৎ শূন্য তীব্রালোকিত কক্ষের এক কোণে সে একা। গাড়ীর আলোকদীপ্তিতে তার শুভ্র মুখশ্রী বিবর্ণ, করুণ। চওড়া কপাল হতে লম্বা দৃঢ় চোয়াল দিয়ে উন্নত সরু চিবুক পর্য্যন্ত মুখের সুন্দর রেখা অসমভাবে গড়িয়ে পড়েছে; কুমোরের হাতে মাটির ফলের মত, সে মুখ পেলব, নরম;

এখনও আগুনে-পোড়া সুদৃঢ় কঠিন রূপ নেয় নি। মুখের উঁচু চোয়ালের ওপর সরু নাকের পাশে একটু বসা চোখ জল্‌জল্‌ করছে, পাহাড়ের তলে সূর্য্য-হসিত গভীর হ্রদের মত। শূন্য গাড়ীর জানলা দিয়ে সে কালো চোখের দীপ্ত দৃষ্টিতে কিসের সঙ্কেত! কালো মাটির প্রদীপের মুখের চঞ্চল শীর্ণ শিখার মত। যেন কার প্রতীক্ষায় সে একা জেগে।

বিম্বৌষ্ঠী। হৃদয়ের আগুনের আভা ওষ্ঠে অধরে লেগেছে বুঝি।

কল্যাণ ভাবলে, এই বোধ হয় মালতী মল্লিক?

সে এমন একা যাচ্ছে কেন! সে কি অনুভব করতে চায় তার সাহস আছে।

কিন্তু সাহসিকার অন্তরে যে শঙ্কা, চক্ষে প্রতীক্ষা। ফ্রেমে বাঁধান ছবির মত তার মূর্ত্তি, ওই হালকা সবুজ শাড়ীর সোনালী পাড় যেন ভোরের পৃথিবী কপোলে অরুণের স্বর্ণরেখা।

পাইপ টানতে টানতে কল্যাণ গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল। একলা-বসা তরুণীকে সে কিছু বলতে চায়। কি বলতে চায় সে জানে না। হয়ত সে বলত, তুমি কি মালতী মল্লিক? অথবা, ওগো যাত্রিণী, কতদূর তোমার একা যাত্রা!

ঠিক সেই সময় পাঁচ মিনিটের ঘণ্টা পড়ল। ভ্রূকুঞ্চিত করে তরুণী চাইল। ছাই-ওড়া অঙ্গারের মত চোখের দৃষ্টি।

মুখ হতে ধূমের কুণ্ডলী বাহির করে কল্যাণ দ্রুতপদবিক্ষেপে রেস্তোরাঁ গাড়ীর দিকে এগিয়ে গেল। মনে মনে সে হেসে উঠল। উনত্রিশ বৎসর বয়সে তার উনিশ বছরের স্বপ্নময় মন আবার জেগে উঠতে চায়। এ কি বাংলার বাতাসের গুণ অথবা অনুপমা তার প্রথম যৌবনের স্বপ্নমায়া জাগিয়ে দিল।

২

প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে হাওড়া স্টেশনের ইয়ার্ড পেরিয়ে বোম্বে মেল ছুটে চলেছে, যেন রূপকথার বৃহৎ সরীসৃপ, মাথায় মানিক জ্বলছে, মণিমুক্তাখচিত দেহ অন্ধকারে ঝকমক করছে, গর্জনে নিশ্বাসে অগ্নি ও ধূম চতুর্দিকে বিকীর্ণ।

কাচের জানলা ফেলে দেবপ্রিয় বাহিরের আকাশের দিকে চাইলে। ইয়ার্ডের লাল নীল সাদা অগণিত আলোর ছটায় আকাশের নীলিমা মুছে গেছে।

কালো চশমা খুলে দেবপ্রিয় গাড়ীর ভেতর চাইলে। চোখ তার খারাপ নয়, তবু সে একটা কালো চশমা পরে থাকে, তীব্র আলো তার চোখে সয় না। চোখকে বিশ্রাম দেবার জন্য অথবা ভাববার জন্য অনেক সময় সে চোখ বুজে থাকে, অথচ জানাতে চায় না, সে চোখ বুজে আছে। চশমাটা সযত্নে খাপে রেখে সে এক কোণে ঠেসান দিয়ে বসল।

গাড়ীটা বেশ বড় ও নতুন। সবুজ রঙের রেক্সিন চকচক করছে। ছ'বার্থওয়ালা গাড়ী, মাঝখানে ফাঁকা অনেকখানি জায়গা। দেবপ্রিয়ের বেঞ্চিটি গাড়ীর পেছনের অংশ জুড়ে। তার ডানদিকের বেঞ্চিতে সন্ন্যাসী প্রেমদাস। বামদিকের বেঞ্চিতে কোটপ্যাণ্টপরিহিত মধ্যবয়স্ক এক বাঙ্গালী চুপ করে বসে, মাথার টুপি এখনও খোলে নি। হাঁপানি রোগী বায়ুহীন গ্রীষ্মের রাত্রে বিনিদ্র নয়নে যেমন অসহায়ভাবে বসে থাকে তেমনি ব্যথিত মুখে লোকটি জানলার দিকে চেয়ে বসে আছে। ট্রেন যখন ছেড়ে দিয়েছে, লোকটি ছুটতে ছুটতে এসে লাফিয়ে উঠল,

হাতে একটা ছোট স্যুটকেশ। প্রেমদাস তাকে ধরে টেনে না নিলে হয়ত সে প্ল্যাটফর্মে পড়ে যেত। কিন্তু সেজন্য প্রেমদাসকে সে কোন কথাও বললে না, ধন্যবাদও জ্ঞাপন করলে না, সামনের খালি বেঞ্চে গুম্ হয়ে বসে পড়ল।

মাথার টুপি খুলে লোকটি একবার দাঁড়িয়ে আবার বসে পড়ল আকাশের অন্ধকারের দিকে চেয়ে।

দেবপ্রিয় লোকটিকে চিনতে পেরে বিস্মিত হল। রাধাকান্ত মিত্তির, বহুলক্ষপতি রাধাকান্ত মিত্তির! পাঁচ-সাতটা বড় কোম্পানীর ডিরেক্টার। কিছুদিন আগে তার ছবি দেবপ্রিয়দের কাগজে বাহির হয়েছিল। এক কোম্পানীর নতুন আফিস-বাড়ী উদ্বোধন-উৎসবে সাব এডিটার হিসাবে দেবপ্রিয়ের নিমন্ত্রণ হয়েছিল। উদ্বোধনে সে যেতে পারেনি কিন্তু কাগজে লম্বা প্যারাগ্রাফ লিখতে হয়েছিল।

কিন্তু রাধাকান্ত মিত্তির সেকেণ্ড ক্লাশে কেন? নতুন তাপ-নিয়ন্ত্রিত গাড়ীতেই রাধাকান্ত বোম্বে যায়, দেখেছে। বোধ হয় জরুরী কোন ব্যবসায়সংক্রান্ত ব্যাপারে তাড়াতাড়ি যেতে হচ্ছে।

দেবপ্রিয়ের বেঞ্চির আর এক কোণে এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক বসে। ছাই-রঙের গলাবন্ধ কোট, মাথায় চুলগুলি যেমন খড়ির মত সাদা মুখ তেমনি আরক্ত, শুভ্রতা ও রক্তবর্ণের বৈষম্যে লোকটিকে অস্বাভাবিক করে তুলেছে!

বেশিক্ষণ কথা না কইলে দেবপ্রিয় হাঁপিয়ে ওঠে। তিন সহযাত্রীর মধ্যে সন্ন্যাসীর সঙ্গেই কথা কওয়া সহজ।

দেবপ্রিয় উঠে সন্ন্যাসীর সামনে দাঁড়াল। সন্ন্যাসী একদৃষ্টে রাধাকান্তের দিকে চেয়ে আছেন, সে দৃষ্টির করুণ কাতরতা দেখে দেবপ্রিয় অবাক হল।

প্রেমদাস পরিচিত বন্ধুর মত দেবপ্রিয়কে বল্লেন, এসো, বোসো—

—আমার নাম দেবপ্রিয়।

—দেবপ্রিয়, বা সুন্দর নাম, না, না, প্রণাম করতে হবে না।

প্রেমদাস দেবপ্রিয়ের হাত ধরে তাঁর পাশে বসিয়ে বল্লেন, আমরা এখন সহযাত্রী, দু'ঘণ্টার জন্যেই হোক, দু'দিনের জন্যই হোক, এক পথের পথিক।

—আমি বোম্বে যাচ্ছি।

—আমারও বোম্বে যাবার ইচ্ছা।

—বোম্বেতে কি থাকবেন ?

—না, ওই পথ দিয়ে দ্বারকায় যাব।

—মা একবার আপনার দর্শন চান, যদি বোম্বেতে থাকেন তা হলে গাড়ীতে বিরক্ত করব না।

—তোমার মা ? পাশের গাড়ীর ওই মোটা গিন্নিটি বোধ হয়।

—ঠিক বলেছেন।

—আচ্ছা বোম্বেতেই দেখা হবে, ও গাড়ীতে যেতে আর সাহস হচ্ছে না, সে সাহেবী মেজাজী ছোকরাটি যে রকম রুখে উঠেছিল, 'এটা মেয়েদের গাড়ী—'

প্রেমদাস হো হো করে হেসে উঠলেন।

—বোসো, আলাপ করা যাক্।

—আপনি এখন বিশ্রাম করুন।

—না, না, আমার ঘুম বড় কম, গত দু'রাত্রি ঘুম হয়নি, এরাত্রেও বোধ হয় হবে না; আর মানুষের সঙ্গে আলাপ করার মত আনন্দ কি আছে—তুমি পণ্ডিত লোক তোমার সঙ্গে আলাপ করার মত আনন্দ কি আছে—তুমি পণ্ডিত লোক, তোমার সঙ্গে কথা কয়ে জ্ঞানও লাভ হবে।

—কি ঠাট্টা করছেন, আমি পণ্ডিত! খবরের কাগজের সাব-এডিটার মাত্র।

—কত দূর পড়েছ।

—এক সময় পড়েছিলুম বটে, ইউনিভারসিটির ডবল্ এম্-এ, ফার্স্ট ক্লাসও পেয়েছিলুম।

—ওই খুলি-জোড়া টাক দেখেই বুঝেচি, তুমি পণ্ডিত।

দেবপ্রিয় ধীরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। তাহার জীবনের স্বপ্ন, আদর্শ ছিল বটে সে পণ্ডিত হবে, ভারতের ইতিহাসের এক নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে বই লিখবে, স্পেঙ্গলার যেমন লিখেছেন Decline of the West. ইতিহাসে এম্-এ পাশ করে দর্শনে এম্-এ পড়েছিল; কিন্তু কোন কলেজে একটা কাজও যোগাড় করতে পারেনি। হঠাৎ যখন তার বাবা মারা গেলেন, মর্টগেজ-করা বাড়ী ও কয়েক হাজার টাকা দেনা রেখে, যৌবনের সব স্বপ্ন মিলিয়ে গেল। এখন সে সামান্য মাহিনার এক কাগজের সাব-এডিটার। সারাদিন প্রুফ দেখে ফরমাস-করা প্রবন্ধ লিখে সন্ধ্যায় শ্রান্ত হয়ে ছোট্ট ভাড়াটে বাড়ীতে আসে, তারপর শুনতে হয়, খোকার জ্বর হয়েছে, খুকীর পেটের অসুখ, গৃহিণীর বুকের ব্যথাটা বেড়েছে। বিরক্ত হয়ে পাড়ার তাসের আড্ডায় আশ্রয় নিতে হয়, "প্রাচ্যে অরুণোদয়" খসড়া হয়ে পড়েই আছে। কিন্তু এ সন্ন্যাসী তার অন্তরের গভীর বাসনার কথা জানলে কি করে! সে বই এখন থাক। দেবপ্রিয় ভাবতে লাগল, আর একখানা বই লেখার মাল-মশলা বোম্বেযাত্রাপথে ট্রেনেতে যোগাড় করা যেতে পারে। সন্ন্যাসী প্রেমদাসের এক জীবনী লিখতে পারলে নিশ্চয় খুব বিক্রি হবে; অথবা প্রেমদাসের উপদেশাবলী, ইংরেজীতে নাম হবে Philosophy of Sadhu Premdas. কোন ধনী শিষ্য ছাপাবার ভার নিতে পারে। ইংরেজী বইখানা আমেরিকায় খুব বিক্রি হবে।

দেবপ্রিয় বলল, দেখুন আমার একটি নিবেদন আছে।

প্রেমদাস তার কথায় বাধা দিয়ে বললেন, দেবপ্রিয়, লোকটি কে? চেন?

রাধাকান্ত তখন পকেট থেকে নোটবুক বাহির করে হিসেব করতে ব্যস্ত।

—মনে হয়, চিনি।

—লোকটি বড় দুঃখী।

—দুঃখী? উনি লক্ষপতি। অর্থের দুঃখ নয়, এটা ঠিক?

—দুঃখ কি কেবল টাকার?

—আমাদের মত সংসারী মানুষের কাছে তাই বটে।

—তুমি গভীরভাবে ভেবেছ কি আমাদের সত্যিকার দুঃখ কিসের জন্য?

ছাইরঙের কোট-পরা প্রৌঢ় লোকটি আলোচনায় যোগদান করবার জন্য অধীর হয়ে উঠছিল, সে বলে উঠল, বাসনাই সব দুঃখের মূল নয় কি?

প্রেমদাস উৎসাহের সঙ্গে বললেন, আসুন, এগিয়ে আসুন, আপনি সুন্দর কথা বলেছেন, শাস্ত্রে বলে বটে—

—আমাকে বোধ হয় চিনতে পাচ্ছেন না, আমি বিরিঞ্চি।

—ও বিরিঞ্চিবাবু আমাদের, আপনার ওপরই ত টিকিট কেনার ভার ছিল।

—হাঁ, ঠাকুরের সব মনে থাকে। রেল কোম্পানীর টিকিট বেচে চুল পাকিয়ে ফেললুম, এদিকে দক্ষিণে লিলুয়ার বেশি কখনও যাইনি। লোকে বলে, দিনত মশাই একটা আম্বালার টিকিট, একটা আমেদাবাদের টিকিট, টিকিট দি, পয়সা গুণি আর ভাবি কি সুন্দরই সব জায়গা পৃথিবীতে। তাই, পেনসন নেবার আগে ঠিক করলুম এক লম্বা পাড়ি

দেব, বড়সাহেব শুনে খুব খুশি, নিজে বোম্বে যাবার পাশ লিখে দিলেন, তারপরে যেখানে খুশি যাও,—ঠাকুর, আপনি দ্বারকায় যাবেন, তা হলে আপনার সঙ্গে যাই।

প্রেমদাস স্থিরদৃষ্টিতে বৃদ্ধ বিরিঞ্চির দিকে চাইলেন, অতি ধীরে বললেন, বহুদূরে আপনার যাত্রা।

—হাঁ, এতদিন রেল কোম্পানীর চাকরি করলুম, এবার কোম্পানীর পয়সায় যতদূর সম্ভব ঘুরে আসবার ইচ্ছা।

—আপনি সুদূরপথের যাত্রী, আপনাকে দেখে ধন্য হলুম।

প্রেমদাস বিরিঞ্চিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। বিরিঞ্চির বুক কেঁপে উঠল, ঠাকুরের সহজ কথার অর্থ সে যেন বুঝতে পারছে না। স্তব্ধ হয়ে সে বসল।

প্রেমদাস হেসে বললেন, দেবপ্রিয়, তুমিও যে নোটবুক বাহির করলে দেখছি, কি টুকছো?

—প্রশ্নের উত্তরটা কি দেন, তাই লিখে নেব।

—প্রেস রিপোর্টারের কাজও কর নাকি?

—দরকার হলে করতে হয়, যাতে দু'পয়সা আসে।

—প্রেমদাস বৈরাগীর সঙ্গে ইন্‌টারভিউ ট্রেনে, দু'পয়সা পাবে, বেশ, বেশ, লেখ, লেখ। প্রশ্ন হচ্ছে, মানব-জীবনে দুঃখের কারণ কি? তুমি বলছ, অর্থের অভাব; বিরিঞ্চি বলছেন, বাসনা কামনা। এ অভাবাত্মক দৃষ্টি। ভাবাত্মক দৃষ্টি দিয়ে দেখ, দুঃখ কেন? প্রেম নেই বলে দুঃখ। মানুষ প্রেম চায়, হৃদয়ের স্পর্শ। অন্তরে প্রেমের চন্দ্রমা উদিত হলে দুঃখের নিবিড় অন্ধকার দূর হয়ে যায়। এই যে আমাদের গাড়ীগুলো টানতে টানতে ইঞ্জিন ছুটে চলেছে, রাত্রির ঘন অন্ধকারে তার মাথায় সার্চ-লাইট জ্বলছে, নিজের পথ নিজে আলোকিত করে

চলেছে, প্রেমের হেড্-লাইট জ্বেলে চলো, জীবনপথে কলিসন হবার ভয় নেই—

দেবপ্রিয় হাত চালিয়ে লিখে চললো। মনে মনে সঙ্কল্প করলে, জীবন লেখার প্রস্তাবটা কাল সকালেই করতে হবে।

সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বরে রাধাকান্ত চমকে উঠল, তারপর নোটবুক বন্ধ করে তারাভরা রাত্রির প্রবহমান অন্ধকার স্রোতের দিকে চেয়ে বসে রইল।

ধূসর নীল পর্দার মত মুক্ত আকাশ, একপ্রান্তে একফালি চাঁদ। রাতের আকাশের দিকে, চাঁদের দিকে সে কখনও এমন করে বসে চায়নি। তার সময় কোথায়!

তার দিন কেটেছে অফিসে, ব্যাঙ্কে, শেয়ার মার্কেটে, কারখানায়; তার রাত কেটেছে হিসেবের বই পরীক্ষা করে, টাকা গুণে, নূতন নূতন ব্যবসার প্ল্যান তৈরি করে। মাঝে মাঝে যখন শ্রান্তি এসেছে, তখন সে গেছে বন্ধুদের দল নিয়ে কোন অভিনেত্রীর রঙ্গগৃহে, অথবা তার বাগানবাড়ীতে কোন বাঈজীকে এনে প্রমোদোৎসবের আয়োজন করেছে। সে ক্ষণিকের খেলা। তার আসল খেলা টাকা নিয়ে। নারী তার মন ভুলায় না, মদ তাকে মাতাল করে না, তার একমাত্র নেশা টাকা। একদিকে টাকা জমাবে আর একদিকে টাকা খেলাবে।

এমনি একটি ছোট স্যুটকেস হাতে সাতাশ বছর আগে সে কলিকাতায় এসেছিল, গৃহহীন, নিঃস্ব, নগণ্য পথিক। আজ সে বহু-লক্ষপতি। কিন্তু টাকা সে জমায়নি, টাকা সে অনবরত খেলিয়ে চলেছে। খেলার

নেশায় মেতে এখন সে মহাবিপদে পড়েছে! এতদিন জিতের খেলার পর বুঝি এবার হারের খেলা আরম্ভ হল! যে সোনার চাকা সে ঘোরাচ্ছিল, বেশি জোর ঘোরাতে গিয়ে, সে চাকা তার গলায় এসে চেপে আটকে গেছে। আবার চাকা ঘুরবে, হঠাৎ কয়েক লাখ টাকার টানাটানি পড়ে গেল, বাজারে কিছুতেই যোগাড় করে উঠতে পারল না। শেয়ার মার্কেটে এত মরীয়া হয়ে খেলা ঠিক হয় নি, রেসের ঘোড়াটাও পা ভেঙে বসল, লোহার কলের নূতন যন্ত্রটা প্রথমদিন চালাতে গিয়েই ভাঙল, ইউরোপ থেকে ইঞ্জিনিয়ার না এলে সারান যাবে না, সে তিন মাসের ধাক্কা, এদিকে তার কোম্পানীর শেয়ারের দর ভয়ঙ্কর নেমে গেছে। এখন নগদ তিন লাখ টাকা না হলে বাজারে তার ব্যবসা বন্ধ হবে, সাতটা হুণ্ডি এক সপ্তাহের মধ্যে এসে পড়বে। সে আজ দু'খানা চেক কেটেছে, একখানা কুড়িহাজারের, একখানা ত্রিশ হাজারের। ব্যাঙ্ক বরাবর এর চেয়েও বেশি ওভারড্রাফট্ দিয়েছে, কিন্তু ম্যানেজার বললে, ওভারড্রাফট্ দেওয়া অসম্ভব, লণ্ডন থেকে কেবল্ এসেছে খুব সাবধানে কাজ করবে, ওভারড্রাফট্ বন্ধ কর। হঠাৎ এরকম কেবল্ এল কেন ম্যানেজারও বুঝতে পারছে না। কাল সে চেক ব্যাঙ্কে ভাঙাতে নিয়ে যাবে, dishonoured হবে। রাধাকান্ত মিত্তিরের সই-করা চেক কাগজ মাত্র!

আজ নানা জায়গা ঘুরে দেখল, বাজারে তার ক্রেডিট নেই। একটা মিলে ধর্ম্মঘট, আর একটা কারখানার যন্ত্র বিকল, বাজারে দেনা খুব বড় অঙ্কের, নূতন যন্ত্রপাতি সব ধারে কেনা।

ইন্‌সল্‌ভেন্সি! মন্দ কি!

নোটবুকে রাধাকান্ত যে হিসাব করছিল, টাকার সে বড় বড় অঙ্কগুলি তার মাথায় ঘুরতে লাগল, চোখের সামনে নাচতে লাগল।

তিনটে কোম্পানী লিকুইডেসনে যাবে, সেই সঙ্গে তার আলিপুরের বাড়ী, বারাকপুরের বাগানবাড়ী—সব যাবে।

মন্দ কি! একদিন সে কপর্দকশূন্য হয়ে কলিকাতা হতে চলে যাবে তার গ্রামে, নদীর ধারে পিতামহের ভাঙা বাড়ীটা সারিয়ে থাকবে, রোজ রাতে দেখবে এমনি চাঁদ, তারকাপুঞ্জের ঝল্‌মলানি। হাঁপানিতে রাতের পর রাত জাগতে হবে না—কোম্পানীর হিসাবের খাতার বড় বড় অঙ্কগুলি চোখের সামনে তাণ্ডব নৃত্য করবে না—

বেশি নয় দেড়লাখ টাকা যোগাড় করতে পারলে, কয়েকটা দেনা শুধতে পারলে আবার বাজারে ধার পাবে।

না, সে হার মানবে না।

গাড়ীর দরজা ভাল করে বন্ধ করে পাশের দুটো জানলার কাচ ফেলে দিয়ে মালতী পিঠে একটা কুশান ঠেশ দিয়ে বসল। এত বড় গাড়ীতে সে একা। সব জানলা বন্ধ করে যাওয়া যায় না। যদি বর্ধমানে কোন মেয়ে না ওঠে, আসানসোলেও কেউ না ওঠে, তাকে সারারাত জেগে একা যেতে হবে।

মালতী টাইম টেবল খুলে দেখতে লাগল, গাড়ী কখন বর্ধমান পৌছবে। বোম্বে পৌছতে দু'রাত কাটাতে হবে এই ট্রেনে। কি লম্বা পাড়ি! ট্রেনগুলো একশ-দেড়শ' মাইল বেগে যায় না কেন?

মালতী একটা নভেল খুলে বসল। রাশিয়ান উপন্যাস, সোভিয়েট রাসিয়ার শ্রমিক ও কৃষকদলের নবস্বপ্নের কথা।

বেশিক্ষণ সে নভেল পড়তে পারল না। গা কেমন ছম্‌ছম্ করছে।

ট্রেন ছুটে চলেছে ক্ষ্যাপা দৈত্যের মত। ট্রেনের ঝাঁকুনিতে বোধ হয় শরীর ভাল বোধ হচ্ছে না।

মালতী উঠে বেঞ্চির তলাগুলি ভাল করে দেখলে। না, কেউ কোথাও লুকিয়ে নেই।

একা সে কখনও ট্রেনে ভ্রমণ করেনি; ইণ্টারক্লাসেও কখনও চড়েনি। থার্ডক্লাসে গেলে মন্দ হত না, সে গাড়ীতে দুটো হিন্দুস্থানী মেয়েকে বসে থাকতে দেখেছে।

না, সাহসের পরীক্ষায় সে হার মানবে না। এ তার এ্যাডভেনচার। বাড়ীর সবার অমতে দৃপ্ত যৌবনের গর্বে জনসেবার প্রেরণায় সে একা চলেছে। প্রথমে সে ভারতবর্ষ ঘুরে দেখবে,—চাষীদের জীবন, শ্রমিক-দের থাকবার ব্যবস্থা। তারপর যাবে ইয়োরোপে। বিবাহ এখন সে করছে না।

বই বন্ধ করে মালতী জানলার কাচ ফেলে দিলে। কি সুন্দর চাঁদ উঠেছে, রূপালী নৌকা। গান গাইতে ইচ্ছা করে।

মালতী গান গেয়ে উঠল, নিবিড় অমাতিমির হতে বাহির হল—

এক লাইন গেয়ে সে থামল। মনে হল গাড়ীতে কে যেন প্রবেশ করেছে। কিন্তু কো[illegible]ও কাউকে দেখা যাচ্ছে না।

মালতী আর একটা গান আরম্ভ করলে,—চলি গো, চলি গো, যাই গো চলে—

গাড়ীর চাকাগুলো সে গানের ছন্দে সুরে উন্মত্তের মত ছুটে চলেছে। সমস্ত ট্রেন গান গাইছে—চলি গো, চলি গো!

এবার ট্রেনটা গানের একটা লাইন বার বার গাইছে, ছড়িয়ে চলি চলার হাসি—ছড়িয়ে চলি চলার হাসি—ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্—ছড়িয়ে চলি চলার হাসি—ঝক্ ঝক্ ঝক্ ঝক্—

যেন ট্রেনটা অগ্রসর হচ্ছে না, একই পথে বার বার ঘুরে ঘুরে গাইছে।

হঠাৎ গাড়ীতে কে হো হো করে হেসে উঠল।

মুখ ফিরিয়ে মালতী আঁৎকে চাইলে। ভয়ে কেঁপে সে চেঁচিয়ে উঠল।

তার সামনের বেঞ্চে একটা কুলী বসে! হাঁ, স্টেশনের কুলীর সাজ, কিন্তু মাথায় একটা খদ্দরের টুপি। লোকটা এল কোথা হতে!

—টানবেন না, অনুগ্রহ করে চেন টানবেন না।

কুলীর মত গলা নয় ত।

—কে তুমি?

—হাঃ, হাঃ কমরেড মালতী, ভেবেছিলুম, তুমি শুধু সুন্দরী নও, তোমার সাহসও আছে।

—নিশ্চয়ই আছে!

—তবে চেন ধরে আছ কেন—স্থির হয়ে বোসো।

—কে তুমি!

মাথার টুপি ও মোটা কালো গোঁফ খুলে যুবকটি বললে, এখন চিনতে পাচ্ছ বোধ হয়, চেঁচিও না। আমাকে সাহায্য করতে হবে।

—তুমি, সমর!

—চুপ, আস্তে কথা বল।

কলেজের সহপাঠি সোসিয়লিস্ট সমর।

—কোথায় ছিলে?

গাড়ীর এক কোণে আঙুল দেখিয়ে সমর জানলার খড়খড়ি তুলে বসল।

হাসির তরঙ্গে দেহ দুলিয়ে মালতী বসল। কালো চোখ জল্‌জল্‌ করছে। মুখে রক্তাভা, শরৎপ্রভাতের স্বর্ণদীপ্তির মত।

—হাঃ, হাঃ, কি চমকেই দিয়েছিলে! আমি ত ক্যাপিটালিস্ট নই, আমাকে ভয় দেখাতে আসা কেন? ব্যাপার কি?

—যদি বলি, তোমাকে একা দেখে গাড়ীতে উঠে পড়েছিলুম, তা হলে খুশি হবে—

—মোটেই নয়। তা ছাড়া, তোমার কোন মৎলব আছে।

—সুন্দরী তরুণীর সঙ্গলাভ।

হঠাৎ ট্রেনের গতি মন্দ হ'য়ে এল।

সমর চম্‌কে দাঁড়িয়ে বলে উঠল,—একি! শীগ্‌গির একটা শাড়ী বের করো!

—তুমি পরবে নাকি?

—উপায় কি! যদি ট্রেন থামিয়ে এখন সার্চ করে—

—তুমি শাড়ী পরে ঘোমটা টেনে বসে থাকবে—হাঃ হাঃ—না, না, আমি—হঠাৎ আমি হেসে ফেলব—সে আমি দেখতে পারব না।

ট্রেন থামল না। আবার ক্রমবর্ধমান গতিতে ছুটে চলল।

—বোসো, ট্রেন থামছে না।

প্রথম শ্রেণীর কুপেতে আলো জল্‌জ্বল্ করছে।

জগদীশ এক সরকারী ফাইলের পাতা ওল্টাচ্ছিল। অনুপমা অর্ধশায়িতা, শুব্ধ চেয়ে আছে আকাশের দিকে। ম্লান চাঁদের আলোভরা আকাশের টুকরা নীলার মত ঝক্‌মক্ করে ওঠে, গাছের কালো ছায়া দৈত্যের মত ছুটে এসে চলে যায়, অন্ধকারের স্রোত স্বচ্ছ স্রোতস্বিনীর

মত, এ যেন অসীম কাল-স্রোত প্রবাহিত হয়ে চলেছে তার চক্ষের সম্মুখে! এ অনন্তস্রোতে একবার উজান ঠেলে অনুপমা অতীতে যেতে চায়। কল্যাণ তার জীবনতরীর মুখ যেন ঘুরিয়ে দিলে।

ক্লান্ত উদাসস্বরে অনুপমা বললে, ওগো শুনছ!

মোটা ফাইল বন্ধ করে জগদীশ একটু চমকে চাইলে, ধীরে বললে, তোমার সেই ওষুধটা খাবার সময় হল বোধ হয়!

—না, ওষুধ আমি আজ খাচ্ছি না, এ ঝাঁকুনীতেই আমার গা গুলোচ্ছে—ফাঁইলটা রাখ না।

—এই ফাইল বন্ধ হল।

—এই ইয়ারিং আর হারটা তুলে রাখ দেখি।

হারের সঙ্গে কয়েকগাছা চুড়িও অনুপমা খুলে দিলে। অলঙ্কার-শোভিতা হয়ে আরাম করে শোয়া যাচ্ছে না।

এ্যাটাচি-কেশে গয়নাগুলি রেখে জগদীশ ঔষধের শিশি বা'র করলে!

—ওষুধ ত খাব না বললুম; বরঞ্চ আমাকে সেই মটরমালাটা দাও।

সোনার মালা অনুপমা গলায় পরলে না, হাতে জড়িয়ে খেলা করতে লাগল। জগদীশকে সে বললে, এবার তুমি শুয়ে পড়। একটা আলো নিভিয়ে দাও।

জগদীশ দু'টো আলোই নিভিয়ে দিলে।

একটু ভয়ের স্বরে অনুপমা বললে, না, না, একটা আলো জেলে রাখো, গাড়ীতে অন্ধকার করে যেতে আমার কেমন ভয় করে।

একটা আলো জেলে জগদীশ অনুপমার পাশে একটা বালিশ ঠেসান দিয়ে বসল. হেসে বললে, ধরো তোমায় যদি একা গাড়ীতে যেতে হত।

—যেতুম। চারটে আলো জ্বেলে। ওগো মালতীর গাড়ীতে মেয়েরা কেউ উঠেছে দেখলে? ধন্যি, সাহস মেয়ের!

—ওর গাড়ীতে আর কোন মেয়ে ওঠেনি।

—সে কি! মেয়েটা একাই যাচ্ছে! বর্ধমানে একবার খোঁজ কোরো, যদি আমাদের গাড়ীতে আসতে চায়—

—ভয় নেই, একা যাচ্ছে না। হীরাসিংকে কড়া নজর রাখতে বলেছি, ওর পাশের গাড়ীতেই বসিয়ে দিয়েছি। তার রিপোর্ট ত রীতিমত রোমান্টিক।

—কি, রোমান্টিক আবার কি? তোমরা সবেতেই রোমান্স দেখছ!

—না, গো! তোমার বোন রীতিমত মডার্ন—বুঝলে—শুধু একা দেশভ্রমণ নয়, elope করবার আনন্দও পেতে চান—

—কি হেঁয়ালী বলছ!

—হীরাসিং এর রিপোর্ট হচ্ছে, ট্রেন ছাড়বার কিছু আগেই, সে একটি বাঙালী যুবককে ওই গাড়ীতে উঠতে দেখেছে; যুবকটি উঠেই এক কোণে লুকিয়ে রইল, আর মাল্‌তি-বাবা একটু হেসে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে রইল। ব্যাপারটা আগে থেকে পরামর্শ করে ঠিক করা, এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই। সুতরাং তোমার আধুনিকা মাতৃস্বসাদুহিতা তরুণ প্রেমিকের সঙ্গে আনন্দালাপ করতে করতে যাচ্ছে, একা নেই।

—বাবা, মাল্‌তির এত বিদ্যে! আচ্ছা, ছেলেটি কে দেখলে?

অনুপমা সোজা হয়ে উঠে বসল।

—আমি কিছুই দেখিনি। বল ত, বর্ধমানে দেখতে পারি। তবে খোঁজটা কাল সকালেও করা যেতে পারে।

—হাঁ, আজ রাতে থাক। তা, বাবু বললেই পারে, ওর মা ত মেয়ের বিয়ে দেবার জন্য পাগল।

—মায়ের এক কথায় বিয়ে করে ফেললে, মডার্ন গার্ল হবে কি করে—চাই লভ্, ট্রেনে রঁদেভু।

—মাল্তি বোধ হয় জানত না, আমরাও এ ট্রেনে যাচ্ছি, বড্ড ধরা পড়ে গেছে।

মধুর হাসি খেলে গেল অনুপমার মুখে। জগদীশ মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল। অনুপমার এ রূপলাবণ্যময় হাস্যের অলৌকিক শক্তি আছে, জগদীশ মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে আসে, অনুপমা সরে যায়, হাসি মিলিয়ে যায় আলেয়ার আলোর মত।

অন্ধকার কোণে সরে গিয়ে জানলার দিকে একটু মুখ ফিরিয়ে অনুপমা এলিয়ে বসল, স্থির গম্ভীর রূপ।

অনুপমার মনের আকাশে কখন কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে, কখন চাঁদের আলো ভরে যায়, কখন অরুণের সোনার আভা ঝলমল করে, তার সুন্দর আননের রূপ-পরিবর্তন দেখে জগদীশ বুঝতে পারে। অসুখের আগে অনুপমার সহজ স্থির গাম্ভীর্য ছিল, সহজে সে চঞ্চলা হত না। এখন তার স্নায়ুমণ্ডল বীণা-যন্ত্রের ঢিলে তারগুলির মত, একটু আঘাতেই বেসুরো বেজে ওঠে। অতি সাবধানে জগদীশকে চলতে হয়। মাঝে মাঝে তার শ্রান্তি লাগে। সব সময় সপ্রেম ব্যবহার, আদর-ভরা কথা, মন খুশি করবার প্রয়াস। যেন সে অভিনয় করে চলেছে।

নির্নিমেষ নয়নে অনুপমা চাইলে কৃষ্ণতারকা হতে অদ্ভুত জ্যোতি বার হয়। জগদীশের ভয় করে। অগ্রসর হতে সে পারে না।

মুখের থম্থমে ভাব কেটে গেছে। হেঁয়ালীর সুরে অনুপমা বললে, স্টেশনে কার সঙ্গে দেখা হল জান! Guess?

—পুরুষ, না মহিলা ?

—কল্যাণের সঙ্গে দেখা হল, বহুদিন পরে।

—কল্যাণ!

—তোমার সঙ্গে ত দেখা হয়েছিল বিলেতে,—জেঠাইমার ছেলে।

—ও, তোমার old flame!

জগদীশ কুশান চেপে বসে পড়ল।

—ফ্লেম্! আর ঠাট্টা করতে হবে না।

—আহা, আমি কিছু mean করিনি—কি পাশ করে এল ?

—এই গাড়ীতেই যাচ্ছে, গিয়ে জিজ্ঞেস করে আসতে পার।

জগদীশ চুপ করে রইল। সে কথা কাটাকাটি করতে চায় না। ভাবলে, আগুন কি একেবারে নিভে গেছে? বোধ হয় অঙ্গার রয়েছে ছাই-চাপা। সে অঙ্গারের অগ্নি-আভা অনুপমার গণ্ডে লেগেছে বুঝি!

গাড়ী ছুটে চলেছে। দু'জনে স্তব্ধ। কালের স্রোত বয়ে চলেছে অসীমতার অভিমুখে।

একটু পরে অনুপমা হেসে উঠল; জগদীশকে ঠেলা দিয়ে বললে, কি, গুম্ হয়ে বসলে কেন? ওষুধটা দাও খাই।

—ওষুধ খাবে না যে বললে।

—Changed my mind, dear,—কি বল!

—ভাল কথা। ডাক্তারের কথা ত শোনা উচিত।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়, আর এত উদ্যোগ করে বেড়াতে নিয়ে চলেছ, হঠাৎ অসুখ করে বসলে হবে কেন—একটা কর্তব্য-বোধ আছে ত।

—কার প্রতি?

—শরীরের প্রতি এবং তোমার প্রতি, বুঝলে?

ওষুধ খেয়ে অনুপমা বললে, এবার তুমি শুয়ে পড়। ওপরের বাঙ্কে

বিছানা পাতা আছে, স্লিপিং স্যুটটা বিছানার ওপর আছে বোধ হয়। চাপরাসীকে রাখতে বলেছিলুম।

নানা রঙের কুশান্-ছড়ান রঙীন চাদর-পাতা বেঞ্চির দিকে জগদীশ চাইলে। সুপ্রশস্ত গদি-ওয়ালা বেঞ্চি, তার অর্ধেক জুড়ে কোঁকড়ান চুল এলিয়ে ধূসর হলদে রঙের বালিশ ঠেসান দিয়ে অনুপমা পা ছড়িয়ে বসে, খোলা জানালার দিকে চেয়ে আছে। কিংশুক বর্ণের শাড়ীর প্রান্তভাগ নীচে ঝুলে পড়েছে।

জগদীশ ধীরে বললে, এর মধ্যে শোব কি! বর্ধমানের পর শোয়া যাবে। বেঞ্চির আর এক কোণে বসে সে অনুপমার দিকে চেয়ে রইল। অনুপমার দৃষ্টি তারাভরা আকাশের দিকে।

এমনি চুপ করে একা উদাসভাবে অনন্ত আকাশের দিকে চেয়ে বসে-থাকা অনুপমাকে দেখলে জগদীশের মন ব্যথায়, আশঙ্কায় ভরে ওঠে। এ যেন কোন অজানা, অপরূপা নারী; প্রতিদিনের-জানা অনুপমা তার কাছ থেকে কত দূরে সরে গেছে, কোন্ অজানা পথে বহুদূর চলে গেছে, সে পথে সে একাকিনী যাত্রিণী, জগদীশের সঙ্গ ত্যাগ করে চলেছে। অনুপমার রূপ তাকে মুগ্ধ করে; তার কালো চোখের চাউনিতে বক্ষের রক্ত দুলে ওঠে, তারপর অনুপমা দূরে সরে যায়।

ওয়াল্টেয়ারের নির্জন সমুদ্রতীরে অনন্ত আকাশের তলে এমনি একা-বসে-থাকা অনুপমাকে দেখেই সে বিমুগ্ধ হয়েছিল, ভালবেসেছিল। সোনালী বালুচরে সন্ধ্যার আলোয় এমনি খোলা চুলে কিংশুক বর্ণের শাড়ী পরে সমুদ্রের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে ছিল অনুপমা। যেন একা, বড় একা সে। যেন সে ভেনাসের মত শুক্তির দোলায় সমুদ্রের তল হতে উঠে এসেছে, বিজন পৃথিবীতে পথ খুঁজে পাচ্ছে না।

সেই একাকিনী সৌন্দর্যময়ীকে সে জীবন-সঙ্গিনী করেছে, প্রেম-

প্রদীপ জ্বালিয়ে আহ্বান করেছে অন্তরে; নিবিড়ভাবে তাকে পেতে চায়। কিন্তু নিকটে গিয়েও পরিপূর্ণভাবে মিলন হয় না।

অনুপমা জগদীশকে সরিয়ে রাখে না, কোথাও বাধা দেয় না, অথচ সহসা এক আবরণ সৃষ্টি করে, অদৃশ্য জালের মত। সৌন্দর্যমায়ার আবরণ, অসীম উদাস স্তব্ধতার আবরণ।

অনুপমা অজানা, সুদূরগতা। অদৃশ্য ভেদ-জাল কে ছিন্ন করতে পারে?

ব্যথায় মন খচ্‌খচ্‌ করে।

জগদীশকে সুপুরুষ বলা চলে না। কালো, মোটা দেখতে। থ্যাবড়া মুখ, নাক মোটা, ছোট চোখ; মোটা কাচ-ভরা কাচকড়ার চশমার ফ্রেম মুখখানি বিসদৃশ করে তুলেছে। অনুপমার পাশে বসলে জগদীশকে বিশ্রী দেখায়। "Beauty and the Beast" ছিল তার বিবাহের পরে বন্ধু-মহলে প্রচলিত ঠাট্টা!

সরকারী চাকরির পদগৌরব ও মোটা মাহিনার অঙ্ক কষ্টিপাথরের গায়ে স্বর্ণাভরণের মত তার দেহের অসৌন্দর্য দূর করেছে।

অনুপমার সঙ্গে জগদীশের আলাপ হয়েছিল ওয়াল্‌টেয়ারের সমুদ্র তীরে। অহৈতুক আলাপ। বিবাহের কোন প্রস্তাব প্রথমে ছিল না।

জগদীশ বিশেষ আকৃষ্ট হলেও প্রস্তাব করতে সাহস করেনি।

অনুপমার এক মামা প্রস্তাবটি আনেন। অনুপমার মত নিয়ে তিনি এসেছিলেন। জগদীশ তাতেও সন্তুষ্ট হয়নি। নিভৃতে সে নিজে প্রশ্ন করে অনুপমার নিকট হতে সম্মতি জেনেছিল। অনুপমা তাকে ভালবেসে বিবাহ করেছে কি-না, এ প্রশ্ন তখন মনে উদয় হয়নি। প্রশ্ন করলে বোধ হয় উত্তর পেত না। বিবাহের পর একথা বহুবার মনে হয়েছে, কিন্তু প্রশ্ন করতে সাহস হয়নি। দু'জনার মধ্যে যে অতি সূক্ষ্ম

অদৃশ্য বাধার জাল রয়েছে, প্রশ্ন করতে তার ভয় করে। সে অনুভব করে, অনুপমাকে সে গভীরভাবে ভালবাসে। ভাল যদি না বাসত অনুপমাকে সে সহ্য করতে পারত না, অনুপমার আরোগ্যের জন্য অকাতরে এত অর্থব্যয় করতে পারত না।

—এখনও তুমি শোওনি, অমন চুপ করে বসে ভেবো না।

জগদীশ ধীরে উঠে দাঁড়াল। ওপরের বাঙ্কেই তাকে শুতে হবে ধীরে বললে, তুমিও শুয়ে পড়। জানালাটা বন্ধ করে দি।

—জান ত, ট্রেনে আমার ঘুম হয় না। মিছে তুমি জেগে থাকবে আমার জন্যে।

—অত মুখ বাড়িও না। চোখে কয়লার গুঁড়ো পড়বে।

—বেশ সুন্দর লাগছে রাতটা—যেন হু হু করে ভেসে চলেছি—আচ্ছা তুমি এরোপ্লেনে চড়েছ ?

—হাঁ, সেবার দিল্লী থেকে এলুম।

—আমার এরোপ্লেন চড়তে ইচ্ছে করছে—খুব জোরে ছুটে যাবে—আকাশের নীলিমায় উল্কার মত ছুটে চলবে—আচ্ছা এরোপ্লেন ঘণ্টায় তিন-চার শ' মাইল যেতে পারে ?

—যেতে পারে, তবে যাত্রী-এরোপ্লেন নয়। জলের বোতলটা কোথায় ?

—ওই কোণে রেখেছ—না, আমি জল খাব না—দরকার হলে সোড়া খাব'খন।

—শুয়ে পড়ি ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

—বর্ধমানে ডেকে দিও। কেমন tired লাগছে।

অনুপমাকে আলগা চুম্বন করে জগদীশ ওপরের বাঙ্কে উঠে শুয়ে

পড়ল। ফাইলটা শেষ করে শুয়ে পড়লেই ভাল হত। ট্রেনেতেই রিপোর্ট লিখে পাঠাতে হবে।

বড় ক্লান্তি লাগে। মাথায় নানা চিন্তা। কল্যাণ ঠিক এই ট্রেনে এল কি করে? যা প্ল্যান করা যায়, কামনা করা যায়,—কোথা থেকে অঘটন ঘটে—কোন দুষ্টগ্রহ সব সময়ে তাকে ব্যঙ্গ করছে।

বালিশে মুখ চেপে জগদীশ চোখ বুজলো।

মালতীর সামনের বেঞ্চিতে সমর বসেছে, মুখোমুখি। পাশে রুশ-লেখক সোলোকভের "Virgin Soil Upturned" উপন্যাসখানি খোলা।

মালতীকে সে জিজ্ঞাসা করলে, এবার দেবগ্রামে কৃষক-কন্‌ফারেন্সে তোমায় দেখলুম না?

মালতীকে 'তুমি' বলবার মত ঘনিষ্ঠ আলাপ না থাকলেও সমর কোন সমবয়স্ক মেয়েকে "আপনি" বলে না। তা ছাড়া, মালতী তাদের দলের; "আপনি" বলা বুর্জোয়া মনোবৃত্তির পরিচায়ক। কোন মেয়েকেও সে "আপনি" বলতে দেয় না।

মালতী বলল, না, এবার কন্‌ফারেন্সে যাওয়া হয়নি, শরীর ভাল ছিল না।

—শরীরের কথা ভাবলে কি কাজ করা চলে। আজ সারাদিন ত আমার খাওয়া হয়নি।

—কিছু খাওনি? আমার সঙ্গে ত খাবার নেই কিছু।

—তিন কাপ চা আর দুটো ফাউল-কাট্‌লেট্‌—খাবার কথা

যাক্, কোনরকমে আমায় বোম্বে পৌছতে হবে। টাকাও হাতে নেই।

—টাকা কিছু দিতে পারি।

—টাকা থাক্। রেলওয়ে টিকিট থাকে ত দাও। টিকিট নেই বলে শেষে ধরা না পড়ে যাই।

—তোমার নামে কি ওয়ারেণ্ট বার হয়েছে ?

—না, ওয়ারেণ্ট বার হয়নি। তবে খোঁজ হচ্ছে। ভবেন্দ্রকে ধরেছে,—

—অপরাধ ?

—রাধাকান্ত মিলে ধর্মঘটের কথা শোননি ? বক্তৃতাটা গরম হয়ে গেছ্‌ল। সিতিকণ্ঠ একটা স্লিপ পাঠালে, সরে পড়। তাই সরে পড়ছি।

—কেন, ভয় কিসের ?

—জেলকে আমি ভয় করি না, বুঝলে কমরেড—তবে কেন মিছিমিছি যাই—

—আমারও তাই মত।

—তা ছাড়া, এবার লম্বা পাড়ি দেবার ইচ্ছে আছে, এত দিন বার হতে পারিনি মায়ের জন্যে, এবার বুঝিয়ে এলুম, জেলে যাওয়ার চেয়ে ইউরোপে যাওয়া ত ভাল হবে।

—তোমার মা নিশ্চয় খুব ভাবছেন !

—ভাবছেন বৈ কি ! ভাবাটাই তাঁদের একমাত্র কাজ। তা আমার মা শক্ত আছেন। শোন কমরেড, আমার ঠিকানাটা লিখে নাও, কাল একটা চিঠি লিখে দিও মাকে—ভণিতা কিছু করতে হবে না, শুধু লিখে দিও, আপনার ছেলের সঙ্গে দেখা হ'ল, ভাল আছে, তার অভীষ্টপথে চলেছে—বুঝলে—একটা জংসন স্টেশনে পোস্ট কোরো,—

খামে লিখো আর বেশ মেয়েলিছাঁদে ঠিকানা লিখে—'শ্রীচরণেষু', ওই সবই লাগিয়ে দিও।

মালতীর বিবর্ণ মুখ রাঙা হয়ে উঠেছে, কালো চোখ জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে অন্ধকার আকাশে শুকতারার মত।

ছোট নোটবুক বা'র করে সে ধীরকণ্ঠে বললে—বলো ঠিকানা, নামটা বলো।

—মা'র নাম? দেখ, মায়ের নাম মনে পড়ছে না, মা, মা—শুধু 'মা' লিখে দিয়ে, কেয়ার অফ—মনে পড়েছে, 'যোগমায়া'—কাল সকালেই লিখে দিও।

ব্যাগ থেকে রেল টিকিট বা'র করে মালতী বললে, টিকিটটা রাখো। ব্যাগ নেই?

ব্যাগটা কোথায় পড়ে গেছে দেখছি, একটা ছিল ট্যাঁকে।

—আচ্ছা এ মনিব্যাগটাও রাখ, বেশি টাকা নেই।

—থাক্, তোমার কাছে, পরে নেব। দরকার হবে না বোধ হয়।

—তুমি কি এই কম্পার্টমেণ্টেই থাকতে চাও?

—বর্ধমানে নেমে একবার দেখব—অন্য গাড়ীতে যদি সুবিধে হয়—এক কাজ কর, জানালাগুলো সব তুলে দিয়ে আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়।

—আলো না জ্বালা থাকলে আমার ভয় করবে।

—ভয়?

—না, ভয় নয়, কিন্তু অন্ধকারে আমি থাকতে পারি না, আমার ত ঘুম আসবে না।

—আচ্ছা, আলো জেলেই চলো, আমি সহজে নড়ছি না।

মালতী কোন উত্তর দিলে না। গণ্ডদেশে রক্তের ছোপ মিলিয়ে

গেছে। মণিবন্ধে বাঁধা ছোট ঘড়িটা দেখলে। কলিকাতার এক ছোট গলিতে তাদের পুরাতন বাড়ীর এক অংশ তার চোখে ভেসে উঠল। মায়ের কথা মনে পড়ল।

মায়ের রান্না বোধ হয় শেষ হয়ে গেছে। আজ আর বেশি রাঁধবেন না। ছোট ভাইপো মন্টু বোধ হয় এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। আসবার সময় তার মা চক্ষের জল কষ্টে রোধ করেছিলেন, কিন্তু মন্টু চীৎকার করে বাড়ী মাৎ করে দিয়েছিল।

মা যদি অবুঝ হন কি করা যায়! তার জীবনের আদর্শকে সে কত বোঝাতে চেষ্টা করেছে, মা কিছুতেই বোঝেন না; বলেন, গরীব দুঃখীর সেবা করতে চাও, খুব ভাল, কিন্তু সেজন্য বিয়ে না করে টো টো করে ঘোরা কেন! আজ রাতে মায়েরও ঘুম হবে না! মাকেও একটা চিঠি লিখতে হবে ট্রেন থেকে।

মালতীর ইচ্ছা হ'ল, সমরের সঙ্গে মায়ের গল্প আরও করে। কিন্তু সঙ্কোচে সে চুপ করে রইল। সোসিয়ালিজম্-মন্ত্রে সে দীক্ষিতা। হৃদয়ের কোনরূপ দুর্বলতা প্রকাশ করলে চলবে না।

সমরের দিকে সে উৎসুকভাবে চাইলে। সমরও বোধ হয় তার মায়ের কথা ভাবছে।

মালতী ভাবলে, সে যদি সমরের মত মুক্ত, স্বাধীন হত, চলে যেতে পারত দেশ দেশান্তরে!

রেস্তোরাঁ-গাড়ীতে ত্রয়ীর আহার শেষ হয়ে পান-পর্ব আরম্ভ হয়েছে। কল্যাণ ও আর্থার লিকার নিয়ে বসেছে, কনকের হুইস্কি চলছে।

সাক্রুজের গেলাসে একটু চুমুক দিয়ে কল্যাণ বললে, আর্থার, তোমার এ ছদ্মবেশ কেন ?

পাঞ্জাবির হাতটা গুটিয়ে আর্থার বললে, এ দেশে এই বেশ বড় আরামের। আর আমি ঠিক করেছি, যে দেশে যাইব, সে দেশের বেশভূষা পরিব।

—আইডিয়া ভাল, কিন্তু তোমার মৎলব কি ?

—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে আমি একটা বই লিখ্ছি।

কনক বললে, দোহাই, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে অনেক বিদেশী আবর্জনা জমেনি কি ?

আর্থার বললে, আপনারা যদি নিজ দেশ সম্বন্ধে বই লিখিতেন ত ভাল হইত। আপনারা যে লেখেন না। দেখ, প্রাচীন ভারতের বিষয় জানিতে হলে সেই বিদেশী হুয়েন সাঙের বৃত্তান্ত পড়িতে হয়।

—তার কারণ, নিজের ধর্ম, সমাজ সম্বন্ধে বই লেখা যেতে পারে, কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বড় বড় মন্তব্য করে বই লেখা যায় না, অনেক ইংরেজ আমেরিকান সাংবাদিক পয়সার জন্য অথবা ভারতবর্ষকে হেয় করবার জন্য অনেক বই লিখেছে, তুমি ত তা করবে না আর্থার ?

—আমি ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বই লিখিতেছি বলিলে ঠিক হবে না, এ হচ্ছে ভারতবর্ষকে আমার বুদ্ধি দিয়ে হৃদয় দিয়ে বুঝিবার চেষ্টা, তার ধর্ম, সভ্যতাকে, বইখানার নাম Soul of India হবে।

গেলাসে সোডা ঢালতে ঢালতে কনক হেসে উঠল, Soulকে খুঁজে পেয়েছ কি ? ওই কথাগুলি হচ্ছে তোমাদের সম্মোহন বাণ, একেই ত আমরা ধর্মের গাঁজা খেয়ে বুঁদ হয়ে আছি—

—সেজন্য স্কচ হুইস্কি দিয়ে নেশা কাটাবার চেষ্টা করছ !

—ঠিক বলেছ, আজ পৃথিবী জুড়ে ইয়োরোপীয় সভ্যতার শক্তি সম্পদ

দেদীপ্যমান, ভারতবর্ষ যদি সেই সভ্যতাকে, এই যন্ত্র-শক্তি, বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাকে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করতে পারে, তবেই সে বাঁচবে।

—তোমার মত শিল্পীর নিকট হতে এ কথা আশা করি নাই।

—শিল্প কি আমাদের রক্ষা করতে পারল? লৌহ-যন্ত্র কি জয়ী হল না? জয় যন্ত্র! জয় যন্ত্র!

এক চুমুকে গেলাস শূন্য করে কনক চেঁচিয়ে উঠল, শোন যন্ত্রের জয়ধ্বনি—ঝক্ ঝক্, ঘর্ ঘর্, ঘড়্ ঘড়্ চলেছে—গরুর গাড়ীর চাকার সুর আপনার কাছে যতই মধুর লাগুক মিস্টার গ্রেগরি—

—কিন্তু যন্ত্র-দানবের তাণ্ডব নাচের প্রলয়ধ্বনি আপনি শোনেন নি—বিগত মহাযুদ্ধে আমি ফ্লান্ডারসের যুদ্ধক্ষেত্রে ছিলাম—

—তুমি যুদ্ধে ছিলে, তোমার বয়স তখন খুব অল্প হবে।

—হাঁ, বয়স ভাঁড়িয়ে আমি গেছলাম। যৌবনের রঙীন আদর্শবাদে অনুপ্রাণিত হয়ে ভাবিয়াছিলাম, এই পৃথিবীর শেষ যুদ্ধ, তারপর মানব-সভ্যতার নবযুগ আরম্ভ হইবে, জাতিতে জাতিতে প্রীতি, দেশে দেশে শান্তি কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হইবে—তার জন্যে প্রাণ দিতে প্রস্তুত ছিলাম।

—তোমার মত কত যুবক প্রাণ দিয়েছে, তারা শুধু দেশরক্ষার জন্য, সাম্রাজ্যরক্ষার জন্য যায়নি; মানব-সভ্যতার এক নতুন যুগের জন্ম দেবার জন্য তারা পৃথিবীকে নিজেদের রক্তে রাঙা করেছিল।

—কিন্তু ফল কি হ'ল! পেশাদার রাজনৈতিক নেতাদের চক্রান্ত আরও কুটিল হয়েছে, জাতীয় দম্ভ আরও ভয়ানক, শক্তিলোলুপতা আরও তীব্র, শ্রেণীগত স্বার্থপরতা আরও উগ্র হয়েছে—যুদ্ধের ঝঞ্ঝা আসন্ন।

গ্রেগরি অতি গম্ভীরভাবে বললে, ভগবান ইয়োরোপকে রক্ষা করুন, আগামী যুদ্ধ যে কি ভয়ানক হইবে, আমি কল্পনা করিতে পারি না।

—কেম্ব্রিজে তুমি ত প্যাসিফিস্ট ছিলে।

—এখনও আছি। তবে কোন বিশেষ মতকে ধরে থাকতে আমি চাই না। আসল কথা, যুদ্ধ কোরবো না বলিলে ত হবে না। যুদ্ধ যাহাতে করিতে না হয়, যুদ্ধ করা প্রয়োজন না হয়, পৃথিবীর সেরূপ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

—সে ব্যবস্থা কি করে হবে?

—প্রথমত আমাদের মনকে তৈরি করিতে হবে, জাতির প্রতি জাতির মনোভাব বদল হবে—moral armament—

—কথাটা আগে কোথায় শুনেছি, খৃস্টের প্রেম-নীতিরই নতুন সংস্করণ করতে চাও।

বোতলটা নিঃশেষে গেলাসে ঢেলে কনক বললে, মিস্টার গ্রেগরি, আপনি এতদিন ভারতবর্ষে না ঘুরে যদি ইয়োরোপে ঘুরতেন আপনার প্রেমের বাণী প্রচার করে, এই আসন্ন যুদ্ধ আপনি ঠেকাতে পারতেন মনে হয়?

গ্রেগরি চমকে উঠল। প্রশ্ন করলে, যুদ্ধ কি বাধছে? আমি কয়েকদিন খবরের কাগজ পড়িনি। একটা দূরে গ্রামে গেছিলাম।

—কাগজ পড়নি?

—না, খবরের কাগজ পড়িতে শুধু বিরক্তি নয়, কেমন বেদনা অনুভব করি। কাগজগুলিতে থাকে ঝুড়ি-ভরা মিথ্যা—নিজ দলের প্রপাগাণ্ডা, আমার হাতে শক্তি থাকিলে আমি খবরের কাগজের রূপ বদলে দিতাম।

—দেখ, তুমিও শক্তিকামী হয়ে উঠছ।

—আচ্ছা, আজ নতুন খবর কি আছে কাগজে?

—পোল্যাণ্ডের কাছে জার্মানী যা দাবি করেছে, তার উত্তর দেবার সময় বোধ হয় এতক্ষণে শেষ হয়ে এল—তারপর জার্মানী পোল্যাণ্ড আক্রমণ করবে সুনিশ্চিত।

গ্রেগরি উত্তেজিত হয়ে বললে, তা হলে ইংলণ্ড তাহার শর্ত রাখিবে, তাহার কর্তব্য করিবে—

কল্যাণ হেসে বললে, তা হলে দেখছ আর্থার তুমি শান্তিবাদী নও, যুদ্ধবাদী, অর্থাৎ বন্দুক কামান নিয়ে যুদ্ধ করে সমস্যার সমাধান করতে চাও, ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করতে চাও, মহাত্মা গান্ধীর মত নিরস্ত্র ধর্মযুদ্ধ নয়।

—ওখানে আমি গান্ধীকে বুঝিতে পারি না।

টেবিলে গেলাস ঠুকে কনক বললে, তা হলে আপনি ভারতবর্ষকেও বুঝতে পারবেন না। সত্যিকথা বলতে কি, আমিও বুঝতে পারি না। তুমি পার ঘোষ?

কল্যাণ কোন কথা বললে না। সিগারেটের বাক্স খুলে তাদের সামনে ধরলে, তারপর নিজে একটা সিগারে অগ্নি-সংযোগ করলে।

বাংলার উন্মুক্ত প্রান্তর দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ, চাঁদ ঢাকা পড়েছে। যেন অন্ধকার রাতে দৈত্যের দল মশাল জ্বেলে হুঙ্কার করে ছুটে চলেছে।

ড্রাইভার ড্রামণ্ড এতক্ষণ সার্চলাইট-আলোকিত লৌহবর্ত্ম দেখছিল। জাতিতে স্কচ্; হাইল্যাণ্ডে এক পার্বত্য গ্রামে তার বাড়ী। বাড়ীতে বুড়ি মা আছে। তার স্ত্রীও মার সঙ্গে বাস করছিল, একমাস হল হেলেন লণ্ডনে এসেছে, কার সঙ্গে লণ্ডনে আছে লেখেনি, নিশ্চয়ই ওগিলভির সঙ্গে। ব্যাপারটা ডাইভোর্স কোর্টে শেষ পর্যন্ত না গড়ায়। গত মেলে হেলেনকে সে লিখেছে, ছুটির জন্য দরখাস্ত করেছে। কিন্তু ছুটি পাবার এখন সম্ভাবনা নেই। হেলেনকে ভারতবর্ষেও সে

আনতে চায় না। বাংলার গগনচুম্বী অবারিত মাঠের মধ্যে স্কট্‌লণ্ডের গিরিচূড়া, বনভূমি, হ্রদের ছবি জেগে উঠল ড্রামণ্ডের চোখে। সহকারী ইঞ্জিনচালককে সে বললে, তুমি চালাও। তার চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে আসছে।

ঘননীল শার্ট-পরা, আস্তিন-গোটান, মাথায় কালো বেরে-টুপি, অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান যুবকটি এগিয়ে বসল। কুলীকে বললে, বয়লারে কয়লা ঢালতে।

৩

বর্ধমান যাবার রাজপথ দিয়ে একটি গরুর গাড়ী চলেছে, ভারতবর্ষের পথপ্রান্তর জুড়ে লক্ষ লক্ষ গরুর গাড়ী যেমন ভাবে চলে তেমনি মন্থর-গতিতে এঁকে বেঁকে চলেছে। রাজা গণেশ যখন বাংলার রাজা তখন গ্রামের পথ দিয়ে গরুর গাড়ী যেভাবে যেত, সম্রাট আকবর যখন দিল্লীর সিংহাসনে অথবা মুর্শিদকুলি খাঁ যখন মুর্শিদাবাদে সুবেদার তখন বর্ধমানের এই পথ দিয়ে রাতের অন্ধকারে গরুগুলি যেমন ঘুমের ঘোরে গাড়ী টানত, চাষা-চালক যেমন ঝিমোতে ঝিমোতে গাড়ী চালাত, তেমনি তন্দ্রা-ভরা চোখে পথের দিকে না চেয়ে গরুগুলি পিঠের বোঝা টানতে টানতে সামনে এগিয়ে চলেছে; মাঝে মাঝে গাড়ীতে বোঝাই-করা খড়ের গন্ধে চঞ্চল হয়ে জোরে ছুটছে, আবার মন্দগতিতে চলেছে; হঠাৎ ঝাঁকুনি খেয়ে চালকটির ঘুম মাঝে মাঝে ভেঙে যাচ্ছে, গরুগুলিকে গালাগাল দিয়ে সে আবার খড়ের গাদায় ঠেস দিয়ে আরামে ঝিমোচ্ছে। ষ্টিভেন্‌সন্ যে ষ্টিম ইঞ্জিন তৈরি করেছেন, আমেরিকায় এডিসনের জন্ম হয়েছিল, ফোর্ড মোটর গাড়ী নির্মাণ করছেন—পৃথিবীর এসব ঘটনা বাংলার এ গরুর গাড়ী-চালকের জীবন-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন করতে পারে নি। রাতের অন্ধকারে তারার আলোয় সে সনাতন গরুর গাড়ীতে বসে ঝিমোচ্ছে, গরুর গাড়ী চলছে মন্দগতি।

চাষাটির নাম গদাধর মণ্ডল। সে শুধু ঝিমোচ্ছে না, সে ঝিমোতে ঝিমোতে ভাবছে। সে ভাবছে টাকার কথা। গায়ে জাপানী ছিটের হাত-কাটা ফতুয়া, পরনে হাটে-কেনা আট-হাতি বোম্বে মিলের মোটা ধুতি; হাতে একটা লাঠি গোঁজা। খড়গুলি বেচতে সে বর্ধমান চলেছে।

গদাধর ভাবছে, খড় বেচে সে কত টাকা পেতে পারে। স্টেশনের কাছে এক দোকান আছে, সেখানে বেচলে কিছু বেশি পাওয়া যেতে পারে, তিন-চার আনা বেশি ত হবেই, কিন্তু সেদিকে যাওয়া চলবে না। সেদিকে রামহরি পোদ্দারের দোকান, তার কাছে ধার রয়েছে; খড়ের গাড়ী দেখলে আটক করে বসতে পারে। খড়গুলি রাতারাতি বেঁচে বর্ধমান ছাড়তে পারলেই সুবিধে; রামহরির সঙ্গে আবার পথে দেখা হয়ে না যায়!

অথচ উকিলবাবুর সঙ্গে একবার দেখা করে না আসতে পারলে হবে না। সালিশী-বোর্ড ব্যাপারটা সে ঠিক বুঝতে পারছে না। সেটা নাকি খুব সুবিধের, দেনার টাকা কিছুই দিতে হবে না, শুধু একটা দরখাস্ত হাকিমের কাছে,—দেখাতে হবে তার কিছুই নেই। এদিকে উকিল বাবু দেড় টাকার কম কথা কইবেন না বলেছেন। তা হলে ত খড় বেচে—

গাড়ীর চাকা এক গর্তে পড়ে যাওয়াতে গদাধর ঝাঁকুনি খেয়ে চোখ মেলে চাইলে, গরু দু'টোকে গালাগাল দিয়ে উঠল।

গরুর গাড়ির পর গরুর গাড়ি পার হয়ে গণেশ হালদার তার মোটরকার হাঁকিয়ে চলেছে। সুবৃহৎ নীল নতুন-কেনা মোটরকার, লম্বা সুচোলো বনেট গণ্ডারের দাঁতের মত; রাত্রের আলো-ছায়ায় গাড়ীটাকে কালো দেখাচ্ছে, যেন একটা বন্যবরাহ ক্ষেপে ছুটে চলেছে।

গণেশ সাধারণত নিজে গাড়ী চালায় না। কারণ সে আস্তে গাড়ী চালাতে পারে না। মোটরগাড়ী যদি ঘণ্টায় ষাট-সত্তর মাইল

বেগে না যায়, তা হলে ঘোড়ার গাড়ীর সঙ্গে প্রভেদ রইল কি! বর্তমান জগতে বাঁচতে হলে জীবন উপভোগ করতে স্পীড্ চাই, এই তার মত। শান্ত ছন্দে মধুর ভাবরসাভিষিক্ত হয়ে চলা নয়, চাই উদ্দাম গতি, নটরাজের নৃত্যের ছন্দ, বন্যার স্রোতের মত উচ্ছল চঞ্চল জীবন।

গণেশকে টাকা রোজগার করতে হয়নি। তার পিতৃপিতামহগণ পাঁচ পুরুষ ধরে যে টাকা জমিয়ে গেছেন, বহুবৎসরসঞ্চিত ধনরাশি সে এখন স্পীডের সঙ্গে খরচ করে চলেছে। সে বলে, live intensively, live dangerously—অনুভব কর, তুমি বেঁচে আছ বর্তমান যুগে।

গণেশকে দেখলে লক্ষপতি যুবক বলে মনে হয় না। লম্বা পাৎলা, চুলগুলি উস্কখুস্ক, মাথার মাঝখানে টাকের আভাস; চওড়া কপালে কয়েকটি ক্ষতের চিহ্ন; লম্বা ফোলা মুখ শুকনো, যেন রক্তহীন; মাঝে মাঝে গণ্ডে যে দীপ্তি দেখা যায়, সেটা অস্বাভাবিক কারণে; কালো কাচ-ভরা সোনার ফ্রেমের চশমা, দুই ঠোঁটের প্রান্তরেখা কালো হয়ে গেছে, মুখের বাঁ-দিকে একটা সিগারেট সব সময়ই জ্বলছে। স্থূলদেহ, অত্যধিক বিয়ার পানের ফল। গায়ে সিল্কের গলা-খোলা শার্ট অথবা লংক্লথের পাঞ্জাবি; পরনে দেশী জরি-পাড় ময়লা-ধুতি, জরি-পাড় দেশী ধুতি ছাড়া সে পরে না, কিন্তু সব সময় ময়লা; পায়ে মাদ্রাজী স্যাণ্ডেল।

কলিকাতার পথে সে নিজে গাড়ী চালায় না। তা ছাড়া, তার গাড়ী বন্ধুবান্ধবেরা প্রায়ই নিয়ে চলে যায়, তাকে ঘুরতে হয় ট্যাক্সিতে।

সে সন্ধ্যায় গনেশ নিজে গাড়ী চালিয়ে চলেছে, তার কারণ সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী মধুরা শিপ্রা তার সঙ্গিনী। শিপ্রাকে নিয়ে সে বোম্বে চলেছে।

ইতিহাসটি এইরূপ: কোন বন্ধুর প্রমোদ উদ্যানে নিশীথ উৎসবে

শিপ্রাকে নাচ্‌তে দেখে গণেশ মুগ্ধ হয়ে গেছল। শিপ্রা সুন্দরী নয়, রং কালো, মেয়েরা যাকে বলে, উজ্জল শ্যামবর্ণ। কিন্তু মুখচোখের গঠন বড় নিখুঁত, পাথরে খোদাই-করা গ্রীকমূর্তির মত, প্রতি রেখা উজ্জ্বল, স্পষ্ট; দীর্ঘ তনুলতা, কখনও পদ্মনালের মত নুয়ে পড়ে, কখনও অগ্নিশিখার মত কাঁপে।

শিপ্রাকে গণেশ পেলে না। কোন বড় কোম্পানীর ডিরেক্টারের প্রেমাস্পদা সে। গণেশ বুঝলে, এর মধ্যে ব্যবসাদারী আছে। মুগ্ধতা আরও গভীর হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে বোম্বের কোন সিনেমা-কোম্পানী এক নতুন ফিল্মে অভিনয় করবার জন্য শিপ্রার সঙ্গে চুক্তি করেছে। কলিকাতা হতে মস্ত দল যাচ্ছে। ট্রেনে যাবার ব্যবস্থা হয়েছে।

গণেশ শিপ্রাকে বললে, চলো আমার সঙ্গে, মোটরকারে তোমায় বোম্বে পৌঁছে দেব।

শিপ্রা প্রথমে রাজী হয়নি। গণেশ বললে, আচ্ছা, এই নতুন মোটরকার, তুমি যদি এ গাড়ী করে যাও আমার সঙ্গে বোম্বে পর্যন্ত, এ গাড়ী তুমি উপহার পাবে।

শিপ্রা ভাবলে, ফিল্ম কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তি ত হয়ে গেছে; ম্যানেজারের ব্যবস্থা অনুসারে যে ট্রেনেতেই যেতে হবে, তার কোন কারণ নেই। কাউকে না জানিয়ে সে গণেশের সঙ্গে চলে গেল ব্যারাকপুরের বাগান বাড়ীতে। বোম্বেতে ঠিক সময়ে পৌঁছে সবাইকে অবাক্ করে দেবে। ইতিমধ্যে চারিদিকে খোঁজাখুঁজি চলুক। কাগজে বাহির হোক, চুক্তিপত্র সই করে অভিনেত্রী অন্তর্হিতা।

গাড়ীর গতি কমিয়ে গণেশ বললে, সিগারেটটা আবার নিভে গেল, ধরিয়ে দাও ত।

শিপ্রা বললে, ওটা ফেলে দাও, একটা নতুন ধরিয়ে দিচ্ছি।

—দেখ ত, পকেটে সিগারেট আছে কি-না।

গণেশের পকেটে সব সময় একটা বড় গোল সিগারেটের টিন ও দেশলাই থাকে।

সিগারেটের টিন বের করে শিপ্রা বললে, দুটো আছে।

—আচ্ছা, ওইতেই চলবে। বর্ধমান আর বেশি দূর হবে না।

গণেশ গাড়ীর গতি আরও বাড়িয়ে দিলে। শিপ্রা দেখলে, গতি-জ্ঞাপক যন্ত্রের কাঁটা ষাট হতে সত্তর সংখ্যার মধ্যে দুলছে। তার বুক কাঁপছে।

—আস্তে চালাও বাপু!

—কেন?

—দেশলাই জ্বালতে পারছি না।

—ভয় করছে তোমার?

শিপ্রা কোন উত্তর দিলে না।

গণেশ গাড়ীর গতি কমিয়ে দিলে, কাঁটা ত্রিশের দাগে নেমে এল।

অর্ধদগ্ধ সিগারেটটা ফেলে দিয়ে গণেশ হেসে উঠল।

—Live dangerously, বুঝলে শিপ্রা, তবে জীবনে থ্রিল পাবে—

—ইচ্ছে করে বিপদ ডেকে আনার ত কোন মানে বুঝি না।

—তা হলে ট্রেনে আরামে ঘুমোতে ঘুমোতে গেলেই ত হত। সারারাত জেগে যেতে হবে আমার সঙ্গে, দেখ না, আসানসোলটা পার হই, তারপর কি রকম স্পীড দেব—

—কত?

—এ গাড়ী ঘণ্টায় আশি নব্বই মাইল সহজে যেতে পারে।

—অর্থাৎ মেলট্রেনের চেয়ে জোরে, মিনিটে দেড় মাইল!

—ভয় করছে শুনে? আচ্ছা, চলো আজ সারারাত, তারপর গতির নেশা তোমায় পেয়ে বসবে, তখন আস্তে যেতেই পারবে না—

—না বাপু, আমার কেমন্ দম আটকে যায়। এই নাও সিগারেট।

—বর্ধমানে গলাটা ভিজিয়ে নিতে হবে, বড় তেষ্টা পেয়েছে।

সোনার কঙ্কণ ঘুরিয়ে শিপ্রা গণেশের মুখের দিকে চাইলে।

এই অদ্ভুত লক্ষপতি যুবক অর্থকে তুচ্ছজ্ঞান করে, প্রাণেরও মায়া করে না; সে সুখের সন্ধানে ঘোরে অথচ সুখ চায় না, জীবনটা হৈরৈ করে কাটাতে চায়।

সে কেন বিবাহ করে না? বিবাহ করে সংসারী হলে সে সুখী হবে। গণেশের জন্য শিপ্রার কেমন মমতা জন্মে গেছে। একথা বললে লোকে হাসবে, বলবে, এ শিপ্রার বড় রকম ব্যবসাদারি চাল।

মোটর গাড়ীর তীব্র দীর্ঘ আলোকে সম্মুখের পথ সমুজ্জ্বল; দূরে এক গরুর গাড়ীর সোনালী খড়ের গাদায় সে আলো ঝল্মল্ করছে।

শিপ্রা ভয়ে চেঁচিয়ে উঠল, দেখ দেখ সামনে ওটা কি? কি একটা হলদে—বোধ হয় গাছ—হর্ন দাও—

—খড়ের বোঝা, গাড়ীটা দেখা যাচ্ছে না—হর্ন দিলে গরুগুলো ভড়কে যেতে পারে।

গণেশ গাড়ীর গতি কমালে না। গরুর গাড়ীর পাশ দিয়ে সে জোরে বেরিয়ে চলে যাবে।

গদাইয়ের খড় বোঝাই গরুর গাড়ী এঁকে বেঁকে চলেছে। সোনালী খড়ের স্তূপ মোটরগাড়ীর আলোয় অপরূপ দেখাচ্ছে।

মোটরকার গরুর গাড়ীর কাছাকাছি এসেছে। গণেশ ঠিক করলে বাঁ দিক দিয়ে বেরিয়ে যাবে। গরুগুলো চমকে উঠে জোরে ছুটেছে। গণেশ বাঁ দিকে গাড়ী ঘোরাল; গরুর গাড়ীও তার সামনে এসে পড়ল,

পথের বাঁ দিকে; পাশে হয়ত যাবার রাস্তা আছে, অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না। প্রাণপণে ব্রেক-টেনে গণেশ আরও বাঁ দিকে গাড়ী ঘোরাল।

পথপার্শ্বে বৃহৎ মহীরুহ। তার কালো শক্ত গুঁড়িতে বনেট জোরে ধাক্কা মারলে; প্রাচীন বনস্পতি অটল দাঁড়িয়ে রইল। মোটরগাড়ী ঝন্‌ঝন্ শব্দে কেঁপে উঠে থেমে গেল। সামনের চাকা কাদায় ডুবে গেছে। গাড়ী কাৎ হয়ে পড়েছে, আলো নিভে গেছে, ইঞ্জিন স্তব্ধ। ঝিল্লীরবে মুখরিত অন্ধকার, রাত্রির ছায়া চারিদিকে ঘিরে এল।

ড্যাম্—বলে গণেশ ব্রেক ছেড়ে হাত ঝাড়তে লাগল। কবজি দুটো ঝন্‌ঝন্ করছে। এবার বাহির হবার চেষ্টা করতে হবে। উঠতে গিয়ে সে অনুভব করলে তার কাঁধের ওপর একটা নরম বোঝা। একটু ঘুরে বসতেই, শিপ্রার সুন্দর দেহ তার বুকের ওপর লুটিয়ে পড়ল বাণবিদ্ধা পক্ষিণীর মত।

—শিপ্রা!

কোন উত্তর নেই।

গণেশ ভাবলে, শিপ্রা মূর্চ্ছিতা হয়নি ত? শিপ্রার দেহ ধরে নাড়া দিলে। তপ্তপ্রশ্বাস তার হাতের ওপর পড়ল।

—শিপ্রা!

কোন উত্তর নেই, শুধু একটা চাপা হাসির শব্দ।

গণেশ শিপ্রাকে বুকে জড়িয়ে ধরলে। চারিদিকে কি গভীর স্তব্ধতা, কি নিবিড় রহস্যময় অন্ধকার! ঝোপে জোনাকির দল, আকাশে তারা-গুলি রিমঝিম করছে।

ইতিমধ্যে ড্রাইভার শোভনলাল গাড়ীর দরজা খুলে কোন রকমে বার হয়েছে। সে পেছনে বসেছিল।

—হুজুর, কোন চোট লাগেনি ত ?

শোভনলালের কণ্ঠস্বরে গণেশ চমকে উঠল।

—না, শোভন, আমরা অল্ রাইট্।

—তা হলে ওই গাড়োয়ান বেটাকে ধরে নিয়ে আসি।

গণেশ স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। শিপ্রার বুক ধক্-ধক্ করছে। জীবনে এসব মুহূর্ত ক'টাই বা আসে!

চাঁদের মৃদু আলোকে খড়-বোঝাই গরুর গাড়ীর মন্থর গতি বড় সুন্দর।

রেস্তোরাঁ-গাড়ীর খাবার টেবিল হতে একটা অর্ধদগ্ধ সিগার তুলে নিয়ে গ্রেগরি বললে, আচ্ছা ভারতবর্ষে কত গরুর গাড়ী আছে, বলিতে পারেন রায় ?

সিগারে অগ্নি-সংযোগ করে কনক বললে, এ সম্বন্ধে ভারত গভর্ণমেণ্টের নিশ্চয় রিপোর্ট লেখা আছে, তবে আমার জানা নেই।

—আমি এক বইতে পড়িয়াছি ভারতবর্ষে পঁচিশ লক্ষ গরুর গাড়ী আছে।

কল্যাণ হেসে বললে, কনকের মত হচ্ছে, এই পঁচিশ লক্ষ গরুর গাড়ী লুপ্ত হয়ে যেদিন পঁচিশ লক্ষ মোটর গাড়ী ভারতের পথপ্রান্তর জুড়ে মত্তবেগে ঘুরে বেড়াবে, সেদিন ভারতবর্ষ সভ্য স্বাধীন হতে পারবে।

—অর্থাৎ ভারতবর্ষকে আমেরিকা করে তোলা।

—ভারতের অনাদিকালের সনাতন আত্মার কি হবে ?

—ঠাট্টা করবেন না। ভারতের আত্মা নব কলেবর ধারণ করবে। বর্তমান যুগে ভারতবর্ষের বিশেষ কাজ আছে। গত দু'মাস এক গ্রামে গিয়ে বাস করছিলাম, সেখান থেকে নিকটবর্তী রেলওয়ে স্টেশন তিন দিনের পথ। নদীর ধারে অবারিত মাঠের মধ্যে ছোট গ্রাম। সেখানে খোলা আকাশের নীচে দীপ্ত সূর্যালোকে স্নিগ্ধ তারার আলোয় আমি যে গভীর শান্তি পাইয়াছি, ইয়োরোপের কোন গ্রামে আমি তা পাইনি। সেখানে এক বাউলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। এ গ্রামের এক রিপোর্ট লিখেছি ; তোমাদের শোনাতে চাই।

—দেখ আর্থার, প্রাচীন ভগ্ন প্রাসাদের বা ভগ্ন মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের একটা সৌন্দর্য আছে, যে শিল্পী তা আঁকতে আসে, যে পথিক দেখতে আসে, তার কাছে এসব সুন্দর, এমন কি, জ্যোৎস্নালোকে অপরূপ মনে হতে পারে, কিন্তু যাদের সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে বাস করতে হয়, ভাঙা ছাদ দিয়ে দুঃখ দৈন্যের জলধারা যাদের মাথায় অবিরাম ঝরে পড়ে, তাদের কাছে সব ভেঙে নতুন ইমারত বানানই যুক্তিযুক্ত মনে হয়, পশ্চিমের ঝোড়ো বাতাসে যে অট্টালিকা অটল থাকবে।

—তোমরা সব সময় ইয়োরোপের সঙ্গে তুলনা করে ভাব, এই হয়েছে মুশকিল।

—ঠিক বলেছ, ইংরেজ মাস্টারদের কাছে আমরা যেমন শেক্সপীয়র ব্রাউনিং পড়েছি, অথবা শর্টহ্যাণ্ড টাইপরাইটিং শিখিছি অথবা কি করে সাততলা বাড়ী বানাতে হয়, পোল করতে হয়, কলকারখানা চালাতে হয় জেনেছি, তেমনি ইয়োরোপের ইতিহাসের শিক্ষাও লাভ করেছি,—আইডিয়া, আইডিয়া হচ্ছে সব—ডেমক্রেসি, কম্যুনিজম্—যে জাহাজ ভরে তোমরা আমাদের মাল বেচতে এসেছ, সে জাহাজের পালের বাতাসে ইয়োরোপের আইডিয়ালও ভাসিয়ে এনেছ—

—কিন্তু ইয়োরোপের ইতিহাস এখনও শেষ হয় নি—কি লণ্ডভণ্ড শুরু হয়েছে ইয়োরোপে দেখতে পাচ্ছ কি?

—ও কথা বলে আমাদের ভোলাতে বা ঠকাতে পারবে না।

—সেজন্যই আমি ভারতবর্ষে এসেছি, এখানকার পণ্যের হাটে, আমদানি-রপ্তানির বাজারে নয়, আমি এসেছি তার ধর্মের মন্দিরে, জ্ঞানের প্রদীপ যেখানে জ্বলিতেছে, ভারতবর্ষ যেখানে নিত্যকালের অমৃতভাণ্ড নিয়ে বসিয়া আছে।

—তুমি বেশ সুন্দর বলতে পার, আর্থার। সিগারটা ধরাও।

—ভারতবর্ষে জন্মালে এমনভাবে বলতে না। আলোচনাটা এখন মুলতবী থাক, বর্ধমান স্টেশন বোধ হয় এল।

—আর এক পেগ্ হবে?

—তার চেয়ে সঙ্গে একটা বোতল নিয়ে যাওয়া যাক, এত শীগ্গির ঘুম আসবে না।

—তেষ্টাও পাবে। ট্রেনে আমার ঘুম হয় না।

ট্রেন বর্ধমান স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে প্রবেশ করল।

রেস্তোরাঁ-গাড়ীর বয়কে ডেকে কনক অর্ডার দিলে, এক বোতল হুইস্কি, তিনটে গেলাস ও ছ বোতল সোডার জল তাদের গাড়ীতে দিয়ে আসতে।

সিগার টানতে টানতে ত্রয়ী চললো তাদের গাড়ীর দিকে।

প্রেমদাসের সঙ্গে তখন দেবপ্রিয়ের তর্ক জমে উঠেছে।

বস্তুত দেবপ্রিয় তর্ক না করে বেশিক্ষণ থাকতে পারে না।

কারণ সে কোন জিনিস মানতে রাজী নয়। তার মনে সত্যানুসন্ধিৎসা যেমন প্রবল, যুক্তির শানিত বাণগুলি তেমনি উদ্যত—ভাবের রঙীন কুহেলিকা সে সহ্য করতে পারে না। বুদ্ধির কষ্টিপাথরে সকল ভাব যাচাই করে নিতে চায়।

"প্রেমদাসের কথা" কিছুক্ষণ লেখার পরই আলোচনা শুরু হয়েছে। বিরিঞ্চি প্রথমে আলোচনায় যোগ দিতে চেষ্টা করেছিল, কিন্তু দেবপ্রিয়ের বড় বড় ইংরেজী কথার মানে না বুঝতে পেরে, ওপরের এক বাঙ্কে আশ্রয় নিয়েছে। রাধাকান্ত মাঝে মাঝে এই দুই তার্কিকের দিকে বিস্মিত নেত্রে চাইছে। ওদের আলোচনা তার কাছে শুধু অবোধ্য নয়, নিরর্থক। অন্য সময় হলে সে বাধা দিয়ে বলত, দর্শন ও শাস্ত্রের কূট আলোচনাই ভারতবর্ষের অবনতির কারণ, ভারতের প্রতিভাসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিগণ বিজ্ঞানচর্চা না করে, দর্শন ও ধর্মের আলোচনা করে কাটিয়েছে, এখন তার ফল ভোগ করতে হচ্ছে।

তত্ত্বালোচনায় যোগ বা বাধা দেবার মত মন রাধাকান্তর ছিল না। সে ভাবছিল, ইয়োরোপে যদি সত্যই বাধে, তার সুবিধে হবে কি-না। লোহার কলটা তাড়াতাড়ি সারান দরকার। বোম্বেতে খোঁজ করলে ভাল ইঞ্জিনিয়ারের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। না, এখন ইয়োরোপ যাওয়া হবে না। ঝোঁকের মাথায় সে পাসপোর্টটা নিয়ে বার হয়েছে। কলটা ভাল করে চালিয়ে তারপর সে আমেরিকা যাবে। দু'লাখ টাকার জন্যে আটকে যাচ্ছে। এ কি কম আফসোস! শেষে কি বাটলিওয়ালার কাছে গিয়ে ধার করতে হবে। কলের শেয়ার তাকে কিছুতেই দিতে চায়নি।

ইয়োরোপে যদি যুদ্ধ বাধে, গভর্নমেণ্ট তার কল সারাবার ব্যবস্থা করে দিতে পারে। আর এই ধর্মঘট আইন করে বন্ধ করতে হবে,

গভর্নমেণ্ট তার লোহার কল নিয়েও নিতে পারে, তেমনি পাটের কলে লাভ প্রচুর হবে।

সন্ন্যাসী বলছেন, দেখ দেবপ্রিয়, তুমি যে সমস্যা বলছ, তার একমাত্র সমাধান হচ্ছে—প্রেম।

প্রেম, প্রেম, বার বার একথা শুনে দেবপ্রিয়ের বিরক্ত ধরে গেছে। কবিরাজী সর্বজ্বর বিনাশক বটিকার মত, সকল ক্ষতের মহৌষধি প্রলেপের মত, সকল প্রশ্নের উত্তরে প্রেমদাস বলেন, প্রেম জাগাও অন্তরে, প্রেম বিলাও জগৎজনে।

দেবপ্রিয় বললে, 'প্রেম' কথাটা আপনি বার বার ব্যবহার করছেন, প্রেমের অর্থ কি? প্রেম কি? define করুন।

—এই ইংরেজী-পড়া বিদ্যে আরম্ভ করলে। এ যে অনুভূতির ব্যাপার দেবপ্রিয়, অন্ধকার রাতে বসে তুমি যদি বলো, প্রভাতসূর্যের সোনার আলো কিরূপ বলুন,—সাধনা ভিন্ন এ জানতে পারবে না, এ যে বোধের ব্যাপার, বুদ্ধির অগম্য, বৈষ্ণবশাস্ত্রে বলে—

—বৈষ্ণব শাস্ত্রে কি বলে আমি জানি, আপনি কি বলেন, শুনতে চাই।

—তুমি জান না, তা হলে এ প্রশ্ন করতে না। মানুষের মধ্যে নানা কামনা, বাসনা রয়েছে—

—তাদের মধ্যে দুটি কামনা সবচেয়ে প্রবল, ইংরেজীতে বললে কথাটা স্পষ্ট হয়—sex and property.

—অর্থাৎ সৃষ্টিরক্ষার জন্য নারীরূপিণী প্রকৃতির সুন্দরী মায়া, আর স্থিতির জন্য শক্তি ও সম্পদসঞ্চয়। কি বল?

—শেষটা বললেন না, নারীর জন্য, সম্পদের জন্য শক্তির সংঘাত—প্রলয়! সংগ্রামটা আপনি বাদ দিতে চান।

—তুমি যাকে সংগ্রাম বলছ, আমি বলব লীলা—শিব ও শক্তির লীলা—

রাধাকান্ত ক্ষুব্ধ চক্ষে সন্ন্যাসীর দিকে একবার চাইল। লীলা! করতে হত টাকা রোজগার, চালাতে হত লোহার কল, ধর্মঘট ভাঙতে হত—তা হলে বুঝতে লীলা কাকে বলে! দু' লাখ টাকা আনতে পার!

কথাগুলি যে সে আপন মনে উচ্চ স্বরে বলে উঠল, সে জ্ঞান তার ছিল না। দেবপ্রিয় বললে, প্রেমের লীলা নয়, এটা ঠিক। রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাসংঘের, ভূম্যধিকারীর সঙ্গে কৃষকের, ক্যাপিটালিস্টের সঙ্গে শ্রমিকের, জাতির সঙ্গে জাতির সংগ্রাম চলেছে—

বিরিঞ্চি বাঙ্কে উঠে বসল। ধর্মের গভীর কথা হচ্ছে। এ সব সে বোঝে না। ছোকরাটি অত্যধিক বাচাল, নিজে খুব জানে ও বোঝে এ কথাই প্রমাণ করতে চায়। আরে বাপু, পণ্ডিত হতে পার, গাদা গাদা বই পড়তে পার, কিন্তু ভক্তি না হলে কোন জ্ঞানই হবে না। বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর।

বিরিঞ্চি আবার শুয়ে পড়ল। পেটে কেমন ব্যথা বোধ করছে। কয়েকমাস আগে তার ভয়ানক অসুখ করেছিল, পেটে অসহ্য যন্ত্রণা, নাড়ীগুলি যেন নীচে নেমে যেতে চায়! এ্যালোপাথিক ডাক্তারেরা কেউ বললে টিউমার, কেউ বললে ক্যানসার। কাটতে হবে। বিরিঞ্চি রাজী হল না। কারণ খরচ যা হবে, হিসেব করে দেখা গেল, সে টাকায় বিরিঞ্চির ছোট মেয়ের বিবাহ হয়ে যায়। মরতে ত হবেই একদিন। অনূঢ়া কন্যা নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে ঘটা করে চিকিৎসা না করে মরাই যুক্তিযুক্ত। ডাক্তারেরা কেউ বলতে পারছে না রোগটা কি, ঠিক সারবে কি-না। সস্তার কবিরাজী চিকিৎসা করে সে সেরে গেল। খুব সস্তার চিকিৎসা নয়, দুধ, ঘি, পোলাও হ'ল

পথ্য। বৃদ্ধ কবিরাজের ঔষধের গুণে পেটের ব্যথা ত গেলই, দেহে কোনরূপ ব্যথা বোঝবার শক্তিই প্রায় লোপ পেল। দাঁত ফোলে, কিন্তু কোনরূপ ব্যথার অনুভূতি নেই। জিহ্বায় রসাস্বাদের অনুভূতি নেই। ফজলি আম খাও বা রাবড়ি খাও বা দুধ সাবু খাও, সব একই আস্বাদ। হয়ত পেটে তার ব্যথা হয় কিন্তু ব্যথানুভূতির স্নায়ুগুলি অসাড় হয়ে গেছে বলে ব্যথা বোধ করে না। তাই মাঝে মাঝে মনে হয় ব্যথা হচ্ছে। কল্পনাও হতে পারে।

এ বিষয়ে প্রেমদাস ঠাকুরের কাছে নিবেদন করে একটা ঔষধ নেবার তার বিশেষ ইচ্ছা। প্রেমদাস আশ্চর্যকর দৈব ঔষধ জানেন। কিন্তু কথাটা বলবার সুযোগ পাচ্ছে না। এ রাতে ঔষধ প্রার্থনা করবার কোন আশা নেই দেখে বিরিঞ্চি শুয়ে পড়ল।

শুয়ে সে ভাবতে লাগল কবিরাজের এ ঔষধ সেবনে কটু কষা তিক্ত সব স্বাদ এক হয়ে যায়; তেমনি সন্ন্যাসী এমন মনের ঔষধ জানেন, যা পেলে জীবনের সকল দুঃখবোধ চলে যায়, সুখ-দুঃখ এক হয়ে যায়—কিন্তু সে যে সাধনার দরকার, ট্রেনে এক কথায় সে জিনিস লাভ করা যাবে না—ঠাকুরের সঙ্গে সে যাবে দ্বারকায়—সেই অমৃত যদি লাভ করতে পারে। ছোকরাটা কি তর্কই করতে পারে!

দেবপ্রিয় তখন বলছে, দেখুন এ বিষয়ে আমার একটা থিওরি আছে। আমার মত হচ্ছে, বাস্তবকে মেনে নিয়ে সত্যরূপ জানতে আমরা চেষ্টা করি না—সেজন্য আমরা মুক্তির ঠিক উপায় খুঁজে পাচ্ছি না,—সত্য হতে আমরা পালাতে চাইছি সারাক্ষণ, আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতির সত্য, মনের নানা বাসনা কামনার সত্য—আমরা সত্যকে মানতে চাই না, কল্পনার রঙে রঙীন, ভাবের মধুর রসে স্নিগ্ধ করতে চাই—ইংরেজীতে যাকে বলে escapist.

—যেমন সংসার থেকে পালিয়ে লোকে সন্ন্যাসী হয়, পথটা সহজ কিন্তু সত্য নয়, এই তুমি বলতে চাও।

—আমি বলতে চাই, তাতে সংসারের দুঃখ-সমস্যার সমাধান হল না। এটা পালিয়ে জেতা।

—সুন্দর কথা বলেছ। এ বিষয়ে ভেবে তোমার সঙ্গে কাল কথা হবে। বর্ধমান স্টেশন এল বোধ হয়।

ট্রেনের গতি মন্দ হয়ে এল।

দেবপ্রিয় দাঁড়িয়ে উঠে বললে, আমি চাই, অম্লান বুদ্ধি দিয়ে বাস্তবের সমীক্ষণ, সত্য কি জানা, তারপর উপায়ের সন্ধান। মানুষ আঘাত সইতে রাজী নয়, সুখের সন্ধানে সে মায়ার সৃষ্টি করে কাল্পনিক সুখ-লোকে আশ্রয় নেবার চেষ্টা করছে; দুঃখ ভুলতে মানুষ নেশা করে—মদের নেশা, নারীর নেশা, টাকা জমাবার নেশা—কাব্য রচনা করে, ছবি আঁকে, নতুন নতুন আইডিয়ায় মেতে অদ্ভুত সমাজব্যবস্থা রাষ্ট্র-রূপের কল্পনা করে, সোসিয়ালিজম্, কম্যুনিজম্, ফ্যাসিজম্—পুরাতন ভাঙতে চায়, কিন্তু ভাঙার আগে দেখে না সত্যিকার গলদ কোথায়, সে সত্যি কি চায়—সে জানে না।

ট্রেন থেমে গেছে। রাধাকান্ত দাঁড়িয়ে উঠেছে। দূরে রেস্তোরাঁ-গাড়ীর এক খাদ্য-পরিবেশককে দেখে তার ক্ষুধা ও তৃষ্ণার বোধ প্রবল হয়ে উঠেছে। দেবপ্রিয়ের দিকে কটমট্ করে চেয়ে সে বললে, মাফ করবেন, মানুষ কি চায়, তা সে খুব স্পষ্টই জানে।

দেবপ্রিয় একটু থতমত খেয়ে চুপ করে দাঁড়াল। লক্ষপতি রাধাকান্তের সঙ্গে বাগ্‌বিতণ্ডা করতে সে রাজী নয়।

সন্ন্যাসী হেসে বললেন, আপনি কি চান বলতে পারেন?

মাথায় টুপি জোরে চেপে রাধাকান্ত বললে, সে বলে কোন লাভ নেই আপনাকে, সন্ন্যাসীর ওষুধ বা ধর্মকথা নয়।

প্রেমদাস পলকহীন নয়নে রাধাকান্তের দিকে চাইলেন, তারপর ধীর কণ্ঠে বললেন, আপনি চান দু'লাখ টাকা, আপনি চান মিল চালাতে, ধর্মঘট ভাঙতে, কিন্তু তাতে আপনার শান্তি অথবা পৃথিবীর শান্তি হবে কি?

গদি-ওয়ালা বেঞ্চে রাধাকান্ত আবার বসে পড়ল। সন্ন্যাসীর দিকে চাইতে তার সাহস হল না। লোকটা তার মনের কথা জানল কি করে? অলৌকিক শক্তি আছে নাকি? যদি অলৌকিক শক্তি থাকে, তাকে দু'লাখ টাকা যোগাড়ও করে দিতে পারে। সন্ন্যাসীকে ঠাট্টা করা উচিত হয়নি।

রাধাকান্ত আবার চুপ করে বসল। ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে গেল। তার চোখের সামনে ভেসে উঠল লৌহের কলের বৃহৎ বাড়ী শূন্য অন্ধকার; ফারনেসে আগুন জলছে না, চিম্‌নীতে ধূমের চিহ্ন নেই। দুইচোখ জলে ভরে এল।

প্রেমদাস মৃদুকণ্ঠে দেবপ্রিয়কে বললেন, তোমায় বলেছিলুম এ লোকটি বড় অসুখী।

সে কথা রাধাকান্তের কানে গেল না।

তিন বন্ধু যখন রেস্তোরাঁ-গাড়ী হতে এ গাড়ীতে এসে উঠল, তাদের পেছনে বয় মদ ও সোডার বোতল, গেলাস দিয়ে গেল, বেঞ্চির এক কোণে রাধাকান্ত গুম্ হয়ে বসে রইল।

তারপর ট্রেন যখন একটু চলতে শুরু হয়েছে, হঠাৎ সে দাঁড়িয়ে উঠল, গাড়ীর দরজাটা তাড়াতাড়ি খুলে দিলে।

দেবপ্রিয় ভীতভাবে রাধাকান্তের দিকে চাইলে, লোকটা লাফিয়ে পড়বে নাকি!

এক যুবক লাফিয়ে গাড়ীতে উঠল, তারপর এক তরুণী।

হাঁপাতে হাঁপাতে গণেশ বললে, বাবা এ যে ভরা গাড়ী!

শিপ্রা মাথা ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, ভাগ্যিস চলন্ত ট্রেনে ওঠার রিহার্স্যেলটা ভাল করে দিয়েছিলুম।

গাড়ীর পেছনের লম্বা বেঞ্চে তিন বন্ধু পাশাপাশি বসেছিল, তাদের দিকে অভিবাদনের ভঙ্গীতে মাথা একটু নত করে গণেশ বললে, বোধ হয় আপনাদের disturb করলুম,—মশাই, পথে যা accident হ'ল—তারপর পরশু সকাল থেকে ওঁর স্যুটিং শুরু হবে—

পার্শ্বের বেঞ্চে সন্ন্যাসীর স্থিরস্নিগ্ধ মূর্তি দেখে শিপ্রা লজ্জিত হয়ে উঠল। জর্জেট-শাড়ীর লাল জরির স্বরাটী পাড় মাথায় টেনে দিলে। গণেশের দিকে চেয়ে মিনতির স্বরে বললে, চুপ করে বোসো, কি বক্‌ছো!

রাত বারটা বেজে গেছে।

বাংলার শস্যশ্যামল স্নিগ্ধ অবারিত মাঠ ছাড়িয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে ছোটনাগপুরের রক্তবর্ণ রুক্ষ তরঙ্গায়িত প্রান্তর দিয়ে। কোথাও গিরিসঙ্কুল সর্পিল পথ, কোথাও শালবনের ঘন অন্ধকার, কোথাও গভীর খাদের তলে গিরিনির্ঝরিণীর রজত ধারা তমিস্রপুঞ্জে বিদ্যুল্লতার মত।

তারা ভরা আকাশ ঝলমল করছে, যেন ঘননীল শাড়ী ভরে হীরার চুমকি। চারিদিকে অপূর্ব স্তব্ধতা, তন্দ্রাহারা নিশীথিনী বাক্যহারা বসে; এ গভীর নৈঃশব্দ্যে ট্রেনের একটানা শব্দ একঘেয়ে কর্কশ সুরের মত লাগছে।

সবিস্ময়ে শিপ্রা উঠে বসল। মুগ্ধ হয়ে চেয়ে রইল আলোছায়া খচিত রাত্রির দিকে।

আসানসোল পার হতে শ্রান্তিতে শিপ্রা একটু ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন হঠাৎ ঘুম ভাঙল, দেখে, শূন্য প্রান্তরের মধ্যে ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে, অদূরে বনের গভীর অন্ধকার, অতিকায় দানবদলের মত কালো ছোট পাহাড়গুলি গুম্ হয়ে বসে, যেন রূপকথার দৈত্যপুরী, স্তব্ধ রাত্রির জ্যোৎস্না থম্থম্ করছে।

তার ভয় করতে লাগল। এ কোন্ অজানা জায়গায় সে একা!

গাড়ী অন্ধকার। চাঁদের ম্লান আলোয় সব অস্ফুট রহস্যময়।

লম্বা কেবিনট্রাঙ্কের ওপর ঘুমন্ত গণেশের মুখে চাঁদের আলোর আভা। গণেশের মদ্যপানরক্তিম শ্রান্ত মুখ তার বড় ভাল লাগল।

আশ্বস্ত হয়ে সে উঠে বসল। পথে মোটরকারে দুর্ঘটনা, চলন্ত ট্রেনে লাফিয়ে ওঠা, তার সব মনে পড়ল।

গাড়ীটি সে ভাল করে দেখলে।

আসানসোলে গ্রেগরি অন্য গাড়ীতে চলে যাওয়াতে সে গ্রেগরির রিজার্ভ করা বার্থটি দখল করেছে। তার ওপরের বার্থে বিরিঞ্চির নাসিকাধ্বনি শোনা যাচ্ছে। সামনের বেঞ্চে সন্ন্যাসী এককোণে অচঞ্চল বসে, তিনি ঘুমোচ্ছেন না ধ্যান করছেন, বোঝা যাচ্ছে না। তাঁর ওপরের বার্থে রাধাকান্ত কোটপ্যান্ট পরেই শুয়ে পড়েছে। পাশের লম্বা বেঞ্চের এক কোণে কল্যাণ বসে ঝিমোচ্ছে; আর এক কোণে দেবপ্রিয় অর্ধশায়িত ভাবে ঘুমোচ্ছে কি ভাবছে, বোঝা যাচ্ছে না, মনে হচ্ছে, ঘুমের মধ্যে মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাইছে; তাদের ওপরে কনক মদ্যপানঘন নিদ্রায় স্থির।

ধীরে গাড়ী চলতে লাগল। শিপ্রার চোখে আর ঘুম এল না। আর ঘুমোতে ইচ্ছা করল না। এ স্তব্ধ রাত্রি, এ রহস্যময় গিরিভূমি, এ গতিবেগ, এ অন্ধকার গাড়ীতে ঘুমন্ত অজানা যাত্রীদলের আবহাওয়া, তার বড় ভাল লাগল। মুগ্ধনেত্রে সে বাইরে চেয়ে রইল; অন্তরে সে এক অপূর্ব শান্তি অনুভব করল। তার চঞ্চল আশ্রয়হীন কামনাতপ্ত অনিশ্চিত জীবনে সে কখনও ওরূপ শান্তি অনুভব করেনি।

গণেশের ঘুম-ভরা শান্ত মুখের দিকে সে একবার চাইল, চাঁদের আলো সে মুখ থেকে সরে গেছে। কিন্তু সে আলো তার চোখে এ কি মায়ার অঞ্জন লাগিয়ে দিল। ধীরে উঠে সে গণেশের মাথার বালিশটা ঠিক করে দিল। ইচ্ছা করল, গণেশকে চুম্বন করে।

মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে শিপ্রা আবার বসল। বড় স্নিগ্ধ চাঁদের আলো, যেন অশ্রুজলসিক্ত।

শিপ্রার মন ভারী হয়ে এল।

অন্ধকার গিরিবর্ত্ম দিয়ে ট্রেন সশব্দে উঠে চলেছে। গাড়ী অন্ধকার হয়ে এল। জানালা ফেলে সে শুয়ে পড়ল। তার আবার কেমন ভয় করছে!

সিঁদুরের মত রাঙা লালমাটি, ছোট কালো পাহাড়ের সারি, শালবন, এ সব দেখলে তার মায়ের কথা মনে পড়ে যায়। ছোটনাগপুরের একটি ছোট জায়গায় তার মায়ের জীবনের শেষের দিনগুলিতে সে প্রাণপণে মায়ের সেবা করেছিল। কিন্তু বাঁচাতে পারে নি।

মা যে বাঁচেনি তাতে সে দুঃখিত হয় নি। তাঁর দুঃখের জীবন যে শীঘ্র শেষ হয়েছে, সে তাঁর ভাগ্য। যে সুন্দরী তরুণী প্রেমের মোহে খঞ্জ স্বামীর গৃহ ত্যাগ করে বার হয়েছিল, জীবনে সে শুধু প্রতারণা, লাঞ্ছনা পেল, সুখ-মরীচিকার সন্ধানে ঘুরে সংসার মরুভূমির তাপে ক্লিষ্ট দগ্ধ হয়ে গেল, মৃত্যু ত তাহার বন্ধু।

মায়ের কথা ভাবলে, মায়ের উপর তার যেমন রাগ হয়, ঘৃণাও হয়, তেমনি করুণাও হয়।

তার জীবন যেন মায়ের জীবনের পুনরাবৃত্তি না হয়। সে অনেক জিনিস ঠেকে শিখেছে। এ জীবন-যুদ্ধে সে একা। পুরুষ তাকে করুণা করবে না, ভালও বাসবে না, তার যোগ্যতা দেখে পুরস্কার দেবে। এ নারী বনাম পুরুষ যুদ্ধে প্রেমের কথা ভাবলে চলবে না, জীবনে প্রেমের স্থান নেই।

তবু ভালবাসতে ইচ্ছে করে, ভালবাসা পেতে ইচ্ছা করে। ভালবাসার অভিনয় অনেক দেখেছে, অনেক করেছে। সত্যি ভালবাসা কি জানতে ইচ্ছে করে।

শিপ্রা আবার উঠে বসল। জানলার কাচ ফেলে দিলে।

বাহিরে রাত্রি বড় নির্জন, বড় শূন্য।

বহুদিন পরে দুঃখিনী মায়ের কথা মনে হল কেন ?

মায়ের কথা ভাবতে ইচ্ছে করে না। স্বপ্নজাল বুনতে ইচ্ছে করে।

গণেশ যদি তাকে বিবাহের প্রস্তাব করে, তার আপত্তি নেই। অভিনেত্রী-জীবন সে সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করবে না। গণেশ হয়ত রাজী হবে।

কিন্তু গণেশ তাকে বিবাহ করবে কেন ? গণেশের নিকট সে ক্ষণিকের শখ, হয়ত ক্ষণিকের মোহ।

এসব চিন্তা তার মনে কখনও হয়নি। সে কি গণেশকে ভাল বেসেছে ? বোধ হয় এই প্রেমের আরম্ভ। এ দুর্বলতা জয় করতে হবে।

—তুমি, কাঁদছো কেন মা ?

সন্ন্যাসীর কণ্ঠস্বরে শিপ্রা চমকে উঠল।

—আমি কাঁদছি ? না!

—তবে, চোখে জল কেন ?

চোখে আঙুল দিয়ে শিপ্রা দেখলে, চোখ দিয়ে জল ঝরেছে। কি একটা ব্যথা বুক ঠেলে উঠে বার হতে চায়।

ক্রুদ্ধ হয়ে সে সন্ন্যাসীর দিকে চাইল। লোকটা কি এতক্ষণ জেগে তার দিকে চেয়ে বসেছিল নাকি! গণেশকে যে সে আদর করেছে, তা বোধ হয় দেখেছে।

—আমি ভেবেছিলুম, আপনি ঘুমোচ্ছেন।

—সবাই যখন ঘুমোয়, তুমি কি তখন কাঁদো?

—দেখুন, আপনি সন্ন্যাসী, আমাদের কান্নার কি বুঝবেন, কি জানবেন?

—কান্নার সাগর পার না হলে, অমৃতের সন্ধান পাওয়া যায় না—আমাদেরও কি কম কাঁদতে হয়?

—দেখুন, ওসব বড় বড় কথা বুঝি না।

—তুমি ত একজন প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী, অনেক বড় বড় বই অভিনয় করেছ।

—সে মুখস্থ করে।

—না বুঝে?

—লোকে কি বই দেখতে আসে, না বই বুঝতে আসে? দেখতে আসে আমাদের ছলাকলা।

শিপ্রা রেগে উঠেছে। শিপ্রার ক্ষুব্ধ দীপ্ত স্বর শুনে প্রেমদাস দাঁড়িয়ে উঠলেন। অবাক হয়ে চাইলেন! যেন পূর্বজন্ম হতে এক কিশোরীর কণ্ঠস্বর তাঁর কানে ভেসে এল।

—দেখুন, কাঁদলেই যদি অমৃতের স্বাদ পাওয়া যেত, তা হলে মায়ের জীবনে অমৃত উথলে পড়ত।

—তোমার মা, কে তিনি?

—আপনার জানবার কিছু দরকার নেই; তিনি বেঁচেও নেই।

শিপ্রা চুপ করে বসল। মায়ের কথা না তুললেই হত।

প্রেমদাস তার নিকটে এগিয়ে এসেছেন; তাঁর মুখ কঠিন রুক্ষ হয়ে উঠেছে, চোখে অস্বাভাবিক তীব্র দীপ্তি।

ভয়ে শিপ্রা সরে বসল। বুঝি সে চীৎকার করে ওঠে।

এ ত প্রেমদাস সন্ন্যাসীর কল্যাণময় স্নিগ্ধ দৃষ্টি নয়, এ কোন্

কাপালিকের প্রলয়ঙ্কর অগ্নিগর্ভ দৃষ্টি, চক্ষুতারকা হতে সম্মোহনী তীব্র জ্যোতি বিচ্ছুরিত।

ভীতা হরিণীর মত শিপ্রা চাইলে। হাতের সোনার চুড়িগুলি কঙ্কণের সঙ্গে আঘাত করে ঝন্‌ঝন্‌ শব্দে বেজে উঠল।

আত্মসম্বরণ করে সন্ন্যাসী নিজের বেঞ্চে এসে বসলেন। তাঁর মুখ কালো হয়ে এল শ্রাবণের মেঘভরা আকাশের মত; চোখে জ্বালাময়ী দৃষ্টি।

তারপর, বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ কৃষ্ণ মেঘপুঞ্জ হতে জলধারার মত দুই চোখ দিয়ে অশ্রু নিঃশব্দে ঝরে পড়তে লাগল।

ভীত বিস্মিত হয়ে শিপ্রা সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে রইল।

বাইরের স্তব্ধ তারাভরা রাত্রির চেয়ে এ সন্ন্যাসী আশ্চর্যকর।

মন্ত্রচালিতের মত শিপ্রা উঠে প্রেমদাসের পাশে বসল।

—আপনি কাঁদছেন কেন?

—সন্ন্যাসী কেন কাঁদে বুঝতে পারবে কি?

—কখনও কোন সন্ন্যাসীকে কাঁদতে দেখিনি। সংসারের দুঃখ কান্না এড়াবার জন্যই ত লোকে সন্ন্যাসী হয়।

—ভগবান তাঁর নিজের ভার যাকে দিতে চান তাকে তিনি করেন সন্ন্যাসী। তার মত দুঃখী কে?

—আপনি দুঃখী?

—তোমার মায়ের কথা ভেবে তোমারও যেমন দুঃখ হচ্ছে, আমারও তার চেয়ে কম দুঃখ হচ্ছে না।

—আমার মাকে আপনি জানতেন?

—জানতুম বৈ কি। তখন তোমার মায়ের নাম মৃণালিনী ছিল না, তখন ছিল 'ঊষারাণী'। সে আমাদের গ্রামের মেয়ে। পাশের গ্রামেই

বিয়ে হয়েছিল। মনে পড়ে, বিয়ে হবার কয়েক দিন পরেই সে একা চলে এসেছিল। বলেছিলুম, স্বামী খোঁড়া তা কি হয়েছে। বলেছিল, নিজে এক খোঁড়া কালা মেয়েকে বিয়ে করুন তারপর বলবেন। তোমার মায়ের সে জীবনের কথা তুমি কিছু জানো না।

—জানবার ইচ্ছেও নেই। আচ্ছা আপনি কি বরাহনগরে কখনও এসেছেন ?

—দু-তিনবার গেছি বোধ হয়।

—অস্পষ্ট মনে পড়ে, একজন সন্ন্যাসী আসতেন, তাঁকে দেখে বড় ভয় করত, আগুন জ্বালিয়ে তিনি কি সব করতেন।

—তখন আমি তান্ত্রিক ছিলুম।

—আপনিই কি তা হলে আমার বাবাকে—

প্রেমদাস উত্তেজিত ভাবে বাধা দিয়ে বললেন, তোমার বাবাকে লোকে যত খারাপ বলে, তিনি তত খারাপ ছিলেন না।

শোবার জায়গা থাকলেও কল্যাণ শোয়নি। বেঞ্চের কোণে বালিশে ঠেসান দিয়ে অর্ধশায়িতভাবে সে ঝিমোচ্ছিল। ট্রেনে তার ভাল ঘুম হয় না। তা ছাড়া, প্রতি স্টেশনে সরোজিনীর একবার খোঁজ করা দরকার।

বহুদিন পরে অত্যধিক মদ খেয়ে তার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছিল। ট্রেনের গতির সঙ্গে দুলতে দুলতে তন্দ্রার ঘোরে বিচিত্র স্বপ্ন দেখতে দেখতে যেতে তার বড় ভাল লাগছিল। অনুপমা তার স্বপ্নলতায় অপরূপ পুষ্প ফুটিয়ে তুলছে।

কস্তা-পেড়ে ডুরে শাড়ীর আঁচল কোমরে জড়ান, অর্ধেক বিনানো চুল পিঠে দুলছে, দুষ্টুমি-ভরা চোখ নাচছে ভ্রমরের মত, আমবাগানে ছুটোছুটি, ঢিল ছোঁড়া, লুকোচুরি চলেছে, চঞ্চলা বালিকার মুখ কামরাঙ্গার মত রাঙা।

ভাদ্রের নদী কানায় কানায় ভরা, আকাশে মেঘ ও রৌদ্রের খেলা। ভাঙা ঘাটের পাথরে কিশোরী বসেছে নদীর জলে পা ডুবিয়ে, অনুভব করতে চায় খরস্রোতের টান। সবুজ রঙের শাড়ীর প্রান্ত গৈরিক জলে পড়েছে, যেন একটি কচি কলাপাতা জলে ভাসছে। নয়নে বিদ্যুদ্দাম-লীলা নেই, স্থির তারকায় স্বপ্ন-কজ্জল মাখান; সাদা পাল তোলা নৌকার মত মন ভেসে চলেছে কোন্ অজানা দেশে।

ঘরের সামনে ছোট ছাদ। কয়েকটি ছোট ফুলের টবে বাগান করবার শখ মিটান। পথের প্রান্তে কৃষ্ণচূড়া গাছে আগুন লেগেছে, সপ্তমীর স্নিগ্ধ চাঁদ উঠেছে মিত্তিরদের বাড়ীর ছাদের আড়ালে। তলায় অন্ধকারময় আঁকা বাঁকা সরু গলি নির্জন, দুর্গ-প্রকারের খাদের মত। ছোট ছাদে তরুণী একা পায়চারি করছে, আপন মনে গুন্ গুন্ করে গান করছে, এলোচুল মেলে দিয়েছে চাঁদের আলোয়। মায়াময় কৃষ্ণতারকায় কিসের প্রতীক্ষা! অন্ধকার গলি আলো করে কোন্ রাজপুত্র আসবে?

এ কে এল? এ ত সোনার ঘোড়ায় চড়ে স্বপ্নের রাজপুত্র নয়। মাথায় মণি-জ্বালা সর্পের মত সূচালো বনেটওয়ালা মোটরকারে এল যন্ত্ররাজের দানব অনুচর; সে তার বৃহৎ পুরীতে নিয়ে গিয়ে বন্দিনী করে রাখল।

দূরে নদীজলে সূর্যের আলো ঝক্ মক্ করে, চাঁদের আলো মায়াজাল রচনা করে। বৃহৎ বাগানের মধ্যে প্রাচীন প্রাসাদ, জনবিরল,

নিস্তব্ধ। রঙীন শাড়ী পরে একাকিনী নারী ঘুরে বেড়ায়, বিছানা হতে বারান্দায়, বারান্দা হতে ছাদে, ছাদ হতে সিঁড়িতে; সিঁড়ির ধাপে শ্রান্ত হয়ে বসে পড়ে। বাইরে পূর্ণিমা রাত্রি থম্ থম্ করে, বায়ু-কম্পিত আম্রবনের ছায়া কালো চক্ষের সম্মুখে দোলে, গজদন্ত-শুভ্র আনন শুষ্ক চামেলি পুষ্পের মত। জ্যোৎস্না-বিহ্বলা নিস্তব্ধা নিশীথিনীর কানে কানে কোন্ অন্ধকার কোণে বসে সে নারী চুপে চুপে বলে, আমি যে বন্দিনী তুমি কি জান না!

অন্ধকার রাতে তারার আলোয় সে নারী এলোচুলে একা ছাদে দাঁড়ায় সপ্তর্ষিমণ্ডলের দিকে চেয়ে; হীরার দুল্ জল্ জল্ করে জমাট অশ্রুবিন্দুর মত। সে অনুভব করে, সে বন্দিনী নয়, সে যাত্রিণী; অসীম অন্তরীক্ষ ভরে আলোর পথিকেরা ছুটে চলেছে, জগৎ-জোড়া প্রাণধারার সঙ্গে সে-ও চলতে চায়, হৃদয়ের পেয়ালা ভরে পান করতে চায় প্রাণের সুধা, দেহ মন দিয়ে অনুভব করতে চায় অসীম প্রাণের ছন্দ, উল্লাস। এমন সুন্দর দেহ কেন রোগ-জীবাণু ক্লিষ্ট হয়?

কেন এমন হয়?

দুঃস্বপ্নপীড়িত নিদ্রিতের মত আর্তনাদ করে কল্যাণ জেগে উঠল। বুকে যেন কে চেপে বসেছে, চোখ চাইতে পারছে না। চিন্তার অসংলগ্ন সূত্রগুলি জোট বেঁধে যাচ্ছে।

ঝক্—ঝক্—ঝক্—ঝক্—কেন এমন হয়—কি বন্দিনী তুমি জান না—ঝক্—ঝক্—ঝক্—ঝক্—

জোর করে কল্যাণ উঠে দাঁড়াল। বেশিক্ষণ দাঁড়াতে পারল না, ট্রেন যেন বড় জোরে দুলে চলেছে। জানালা দিয়ে দেখা যাচ্ছে, দূরে পর্বতশ্রেণীর মসীরেখা ধূসর অম্বরে। ক্ষুধিত চক্ষে সে চেয়ে রইল।

বহুদিন পরে অনুপমাকে দেখে কল্যাণের হৃদয়ে যে চঞ্চলতা

জেগেছিল, সে তৃষিত তপ্ত চাঞ্চল্য সে শান্ত করতে চেয়েছিল, অবিশ্রাম কথা কয়ে, অত্যধিক পান করে, আপনাকে ভুলিয়ে।

কিন্তু মধ্যরাত্রে যখন সুপ্তির বাঁধ ভেঙে চিন্তার বেড়া ভাসিয়ে বন্যাধারার মত সে বেদনাময় চাঞ্চল্য দেহমনে উদ্বেল হয়ে উঠল, কোনরূপ বাধা দিতে কল্যাণের ইচ্ছা বা শক্তি রইল না।

তবু সে ভাবতে লাগল; অনুপমাকে বুঝিয়ে বলতে হবে, জীবনে আপোষ করে চলা দরকার; যতই অনুযোগ করবে ততই অশান্তি। এখন যদি সে কিছুক্ষণ অনুপমাব সঙ্গে কথা কইতে পারত; শুধু কথা কওয়া; কিছুক্ষণ নয়, সারারাত ধরে কথা কওয়া, মাঝে মাঝে চুপ করে পাশাপাশি বসে থাকা, আবার কথা কওয়া—তা হলে তার মন শান্ত হত।

অনুপমাকে সে সত্যি কোন দিন ভালবাসে নি। একথা অনুপমা জানে।

অনুপমার রূপলাবণ্য তাকে মুগ্ধ করেছে। তার সুঠাম তনুর ভঙ্গী, বর্ণের অপূর্ব শুভ্রতা, কৃষ্ণ নয়নের অদ্ভুত জ্যোতি, এ যেন কোন্ অপূর্ব প্রাণের রহস্য-নিকেতন। গভীর অন্ধকার রাতে হঠাৎ চাঁদ উঠলে যেমন চারিদিক আলোকময় অপরূপ হয়, তেমনি অনুপমা যেখানে আসে চারিদিক আলো হয়ে ওঠে। জগদীশও এই রূপে মুগ্ধ, নারী-সৌন্দর্যের আভায় অন্ধ হয়েছে। এ রূপের মায়া-অবগুণ্ঠন খুলে সত্যিকার অনুপমাকে কল্যাণ জানতে চায়। তার অন্তরের কামনা, প্রাণের রহস্যকে বুঝতে চায়।

কল্যাণ দাঁড়িয়ে উঠল। চলন্ত গাড়ীতে সে পায়চারি করলে। আবার চুপ করে বসলে।

একটি তরুণীর মুখচ্ছবির অস্পষ্ট রেখা তার চোখের সামনে ভেসে

উঠল। রেখাগুলি অস্পষ্ট, রঙ হাল্কা বলেই কল্পনায় নানা রঙে ছবিটি ভরে দিতে পারা যায়! তরুণী যাত্রিণী কি একা বসে চেয়ে আছে দিগন্তের দিকে। সাহসিকার অন্তরে যে শঙ্কা, চক্ষে প্রতীক্ষা!

সে তরুণী মূর্তি সৌন্দর্যে মুগ্ধ করে না, অজানা পথে আহ্বান করে। বলে, এসো, চলো আমার সাথে। তার কালো চোখের দীপ্ত দৃষ্টি প্রদীপশিখার মত আলো করে নিয়ে যাবে পথ।

মুগ্ধতার মধ্যে শান্তি, তৃপ্তি আছে, কিন্তু এ বাসনা বেদনাময়, বুকের রক্ত দুলে ওঠে।

আর ঘুম হবে না। রাত্রির আলো-অন্ধকারের দিকে কল্যাণ চেয়ে ভাবতে লাগল।

মালতীর গাড়ীতে আসানসোলেও কেউ উঠলে না।

সমর বললে, এবার শোবার ব্যবস্থা করা যাক্। সারাদিন বড় ঘুরেছি। আর গাড়ীতে কোন পুলিশ নেই দেখলুম।

মালতী বললে, তুমি ওই বেঞ্চিতে শুয়ে পড়, এই চাদর আর বালিশ নাও।

—তুমিও ঘুমিয়ে নাও। অকারণে রাত জাগা অন্যায়। আর যদি কবিত্ব করতে চাও, আলো নিভিয়ে দাও, চাঁদের আলোর দিকে চেয়ে বসে থাক।

—অকারণে রাত জাগছি না। ঘুম আসছে না বলেই জাগছি।

গাড়ীর আলো নিভিয়ে দিতেই চাঁদের মৃদু আলো গাড়ীর বেঞ্চে এসে পড়ল।

সময় শুয়ে পড়ল না। জানালার কাছে এসে বসল।

—দেখ, কি সুন্দর রাত!

—আচ্ছা, তোমার প্ল্যান কি? সত্যিই ইয়োরোপে যাবে?

—নিশ্চয়ই যাব। যদিও পাসপোর্ট নেই, টাকাও নেই।

—আচ্ছা কত টাকা লাগে যেতে? চার পাঁচ-শ টাকায় হবে?

—খুব।

—তা হলে আমি ঠিক করে ফেললুম—

—কি? কি ঠিক করলে?

—কথাটা শুনে তুমি হাসবে।

—না, কমরেড বলো, আমি হাসব না। তবে চাঁদের আলোর দিকে চেয়ে যা ঠিক করা যায়, দিনের আলোয় তা সব সময়ে ঠিক থাকে না—চাঁদের আলোর একটা মোহিনী শক্তি আছে।

—না, চাঁদের আলোর সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই। আমি ঠিক করেছিলুম, যদি আসানসোলে কেউ আমাদের গাড়ীতে ওঠে, তা হলে হবে না, তোমায় বলব না; আর যদি আসানসোলে কেউ না ওঠে, তা হলে তোমায় বলব।

—তা হলে দেরি না করে বলে ফেল।

—আমার প্রস্তাবটা হচ্ছে—

মালতী হঠাৎ চুপ করলে। দূরে কোন্ কয়লার খনিতে আগুন জ্বলছে, সেই দিকে চেয়ে রইল।

—দ্বিধা না করে প্রস্তাবটা করে ফেলো। বিবাহের প্রস্তাব ছাড়া যে কোন প্রস্তাব শুনতে রাজী আছি।

—দেখ, তুমি সব বিষয়ে পরিহাস কোরো না। আর, আমি বিবাহ করব না, তুমি জান।

—কি করে জানব ? আজ ত তোমার কাছে শুনলুম।

—তুমি সিরিয়াসলি শুনবে কি না ?

—নিশ্চয় শুনব, আমি উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।

—আমি তোমার সঙ্গে ইয়োরোপে যেতে চাই। আমার সঙ্গে যা গয়না আছে, তা বেচলে পাঁচ শ' টাকা হবে ; আর ইয়োরোপে গিয়ে পড়লে দাদা নিশ্চয় টাকা পাঠাবেন--

—প্রস্তাবটা খুবই ভাল।

—ভাল মানে ? তুমি আমায় সাহায্য করবে কি না ?

—অর্থাৎ আমার সঙ্গে যেতে চাও। কিন্তু যদি পাসপোর্ট যোগাড় করতে না পারি, আমাকে হয়ত কোন বিদেশী জাহাজে খালাসী সেজে বা লুকিয়ে যেতে হবে।

—পাসপোর্ট যোগাড় করা কি শক্ত ?

—পুলিশ ত আমায় দেবে না ; আর চাইতে গেলে ধরা পড়তে পারি। সুতরাং অন্য কোন লোকের পাসপোর্ট চুরি করতে হবে।

—চুরি !

—শুধু চুরি নয়, তার ফটোর মত সাজও করতে হবে। সুতরাং আমার সঙ্গে যেতে হলে, দরকার হলে, তোমাকে অন্য সাজ পরতে হবে।

—অর্থাৎ পুরুষ সাজতে হবে। তুমি আমায় ভয় দেখাচ্ছ।

—আমি সত্যি কথা বলছি।

—আচ্ছা, সমর, তুমি কি সত্যিই কম্যুনিস্ট।

এ প্রশ্ন কেন কমরেড ? এসব আলোচনা থাক। তার চেয়ে, চেয়ে দেখ কি সুন্দর রাত ! একটা গান গাও শুনি।

—সত্যি বলছি ইয়োরোপ দেখতে আমার বড় ইচ্ছে। স্বাধীন দেশ দেখতে, স্বাধীন জাতের নরনারীরা কি ভাবে থাকে, সেখানে

রাষ্ট্র, সমাজ-ব্যবস্থা নিয়ে কত পরীক্ষা পরিকল্পনা চলেছে—দেখতে ইচ্ছে করে।

—কিন্তু তাদের দেখা ত চোখের দেখা নয়; প্রাণ দিয়ে তাদের দেখতে হয়, রক্তপাত করে তাদের শিখতে হয়—সত্যি তুমি যাবে?

—দেখ, সাহস করে ত বেরিয়ে পড়েছি।

—তোমার সাহসের প্রশংসা করি। বোম্বেতে গিয়ে ঠিক করা যাবে।

—কেন?

—বোম্বেতে যদি কোন সৎপাত্র না মেলে বিলেতে গিয়ে তার সন্ধান হবে।

—তোমায় বার বার বললুম না—

—তুমি শতবার বলতে পার, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তুমি বিয়ে করবে—প্রকৃতি তোমাকে গড়েছেন সৃষ্টিপালিনী মাতা রূপে—

—প্রকৃতি তোমার কানে কানে এসে বলে গেছেন—সবই খুব বোঝ, নয়, "ক্যাপিটেলে" এসব কথা লেখা আছে!

—চটো কেন। রাগ কোরো না। এপথে যে যায় সে সঙ্গী খোঁজে না, এ প্রলয়ের পথ একা-চলার পথ। নব সৃষ্টির অরুণোদয় দেখা তাদের ভাগ্যে নেই জানে, তারি স্বপ্নে মাতোয়ারা হয়ে মৃত্যু তুচ্ছ করে ছুটে চলে।

মালতী কোন উত্তর করলে না।

দুজনে নিস্তব্ধভাবে বসে রইল।

জানালা দিয়ে পাণ্ডুর দিগন্তদৃশ্য ঝাপ্সা ছবির স্রোতের মত চোখের সামনে প্রবাহিত হয়ে গেল।

৫

প্রথম শ্রেণীর কূপের এক কোণে একটি আলো মৃদু জ্বলছে।

রাত্রি গভীর হল। অনুপমার চোখে ঘুম নেই। আজ রাতে তার ঘুম হবে না। ঘুমের ঔষধ খেয়ে ঘুমোবার ইচ্ছে হয় না। অজানা পর্বত নদী বন প্রান্তর অতিক্রমী ট্রেনে বসে এ রাত জেগে কাটাতে চায়।

বায়স্কোপের স্বল্পালোকিত অস্পষ্ট ছবির স্রোতের মত বাইরের দৃশ্যাবলী তার চোখের সামনে ভেসে যাচ্ছিল। এদৃশ্য তার ভাল লাগে না। বন্যাধারার মত মত্তবেগে ছুটে চলেছে কত অদ্ভুত আবছায়া; ওই কিম্ভূতকিমাকার ছায়া-স্রোতের সঙ্গে কত অশরীরী প্রাণীও ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে; অনুপমাকে আহ্বান করছে, চলে এসো, চলে এসো।

রাত জাগা অনুপমার অভ্যাস হয়ে গেছে। কিন্তু এ চলন্ত ট্রেনে নিঃসঙ্গ রাত্রিতে তার কেমন ভয় করতে লাগল। এই মত্তগতি, বিরামহীন যন্ত্রচক্রের ধ্বনি, পাণ্ডুর আলোক, নিস্তব্ধা নিশীথিনী, তার চিত্তকে চঞ্চল, ভয়ার্ত করে তুলেছে। অন্ধকারময় বনভূমি ওই রূপকথার দৈত্যপুরীর মত ভয়ানক।

জানলার কাচ ফেলে অনুপমা অর্ধশয়ানভাবে চোখ বুজলে।

একবার সে ডাকলে, ওগো, শুনছ, ওগো!

ওপরের বাঙ্কে জগদীশ গভীর নিদ্রিত। মৃদু নাসিকা ধ্বনি পাখা-ঘোরার শব্দের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে।

অনুপমা একবার দাঁড়িয়ে উঠল। ইচ্ছে হল, জগদীশকে ঠেলা দিয়ে বাঙ্ক থেকে ফেলে দেয়। সাবধানী স্বামীর সুনিদ্রা ভেঙে দেয় এক

ধাকায়। বিরক্তির সঙ্গে সে জগদীশের দিকে চাইল। শুধু বিরক্তি নয়, একটা ঘৃণা, ক্ষোভ।

নিঃসুপ্ত জগদীশের দেহ স্পর্শ করতে তার ইচ্ছা হল না। সে এক গেলাস জল বোতল থেকে ঢাললে; অর্ধেক গেলাস জল খেয়ে বাকি ফেলে দিলে, জলের কোন স্বাদ নেই।

বেঞ্চের তলা থেকে অনুপমা একটা ছোট সুটকেশ সশব্দে টেনে বার করলে। তারপর সুটকেসের ওপর সে বসে পড়ল, গাড়ীর ঝাঁকুনীতে সে দাঁড়াতে পারছি না।

আর একবার সে ডাকলে, ওগো, শুনছ!

কোন সাড়া নেই।

সুটকেস খুলে অনুপমা হাতের সোনার চুড়িগুলি এক কোণে ফেলে দিলে। একটা ফুল-ছাপা ছিটের জামা ও কালো-পাড় শান্তিপুরে শাড়ী বার করলে। মহীশূরের রঙীন জর্জেট-শাড়ী পরে তার বড় গরম বোধ হচ্ছে।

সুটকেশের ওপর অনুপমা আবার বসে পড়ল, বেঞ্চিতে ঠেসান দিয়ে। শাড়ী বদলাবার উৎসাহ তার নেই। সে চায় সুপ্তি, সে চায় শান্তি। ধীরে সে চোখ বুজলে। চোখে ঘুম আসে না। মাথা দপ্-দপ্ করছে। আবার বোধ হয় জ্বর আসবে।

চমকে অনুপমা লাফিয়ে উঠল। কে যেন তার পাশে এসে বসেছে। ছায়া! জগদীশের কালো কোটের ছায়া সুটকেসের ওপর এসে পড়েছে।

সুটকেস ঠেলে দিয়ে জানলার কাচ খুলে অনুপমা রঙীন কুসানগুলির ওপর এলিয়ে শুয়ে পড়ল।

পাখাটা ঘুরছে জেলখানার গোল বন্ধ ঘরে পাগল কয়েদীর মত! তার ছায়া চারিদিকে নড়ছে। অনুপমা জোরে চোখ বুজলে।

কর্মক্লান্ত জনের চক্ষে রাত্রি সুপ্তি আনে; নিদ্রার শান্তছন্দে দেহের ক্ষয় ভরে তোলে, মনের শ্রান্তি বেদনা দূর করে, রাত্রিশেষে নব জাগরণ, নব চেতনার আনন্দ!

কিন্তু নিঃসঙ্গা যে নারীর চক্ষে রাত্রি সুপ্তি দিল না, তার কাছে রাত্রি শুধু রহস্যময়ী নয়, বড় জ্বালা-ভরা। অন্তরের সকল সুপ্ত বাসনা, নিরুদ্ধ কামনা জেগে ওঠে, অব্যক্ত ব্যথায় দেহমন ক্লিষ্ট হয়।

যেমন, দিনের আলোর অবগুণ্ঠন উন্মোচন করে রাত্রি উদ্‌ঘাটিত করে অনন্ত তারালোক, আকাশের সুনীল যবনিকা প্রান্তে জ্যোতির্ময়ী অসীম সরণী উদ্ভাসিত হয়, তেমনি দিনের কর্মস্রোত শেষ হলে, নিদ্রাহারা নিশীথে মনের গোপন দ্বার খুলে যায়, অবচেতনার অতলতা হতে ছায়া-মূর্তির মত যারা বার হয়ে আসে, তাদের স্পষ্ট দেখা যায় না, বোঝা যায় না, কোন্ অজানা পথে তারা আহ্বান করে। চিন্তা আসে, ভয় হয়, বিস্ময় জাগে। স্বপ্নকামনাক্ষুব্ধ মনের অসীম রহস্য-জগৎ প্রকাশিত হয়।

খোলা জানালার দিকে চেয়ে রাত কাটান অনুপমার শুধু অভ্যাস নয়, অনুপমা ভালওবাসে। খুব অন্ধকার রাত বা দীপ্ত জ্যোৎস্নাভরা রাত ভাল লাগে না। ম্লান চন্দ্রালোকিত আলোছায়াময় স্তব্ধ রাত্রি তার ভাল লাগে। মৃদু বাতাস বইবে, মাঝে মাঝে বাতাসে গাছগুলি দুলে উঠবে, গাছের পাতার শব্দে আকাশ ভরে যাবে, আবার স্নিগ্ধ স্তব্ধতা।

অসুখের পর এমনি রাতজাগা তার স্বভাব হয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে সে ঘুমিয়ে পড়ে; হঠাৎ জেগে ওঠে, একটু ভয় করে; তারপর রাত্রিকে বড় ভাল লাগে। আলোছায়াখচিত উদ্যানের দিকে চেয়ে সে অতি সূক্ষ্ম স্বপ্নজাল বোনে। রহস্যময়ী নিশীথিনী তার একমাত্র সঙ্গিনী। সে সঙ্গিনীকে প্রাণের সব কথা বলা যায়, যত দুরন্ত বাসনা, অসম্ভব কল্পনা, অপরূপ আশা।

জগদীশ যেমন কর্তব্যপরায়ণ তেমনি সাবধানী। অসুখের পর হতে সে অনুপমার পাশের ঘরে শোয়, মাঝের দরজা রাতে খোলা থাকে। রাতে অনুপমার ঘরে কোন পরিচারিকার শোবার ব্যবস্থা করতে চেয়েছিল, অনুপমা রাজী হয়নি। ঘরে সে একাই শুতে চায়।

একা শোয়া ছোটবেলা থেকে তার অভ্যাস। তার ভয় করে না। ছোটবেলায় তার মায়ের মৃত্যুর পর হতে বরাবর একাই শুয়ে এসেছে।

অনুপমার পিতা ছিলেন দর্শনের অধ্যাপক। গভীর জ্ঞান-পিপাসু অগোছালো মানুষ। যুবা বয়সেই, প্রথমে স্ত্রী, তারপর পুত্র, হারিয়ে তিনি সংসার সম্বন্ধে আরও উদাসীন হয়ে গেলেন। অর্থোপার্জন সম্বন্ধে তাঁর কোন চেষ্টা রইল না। তাঁর একমাত্র সান্ত্বনা হল বই-পড়া। শুধু দর্শনের বই নয়, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস। ইয়োরোপের প্রাচীন ও আধুনিক সব দার্শনিক, ঔপন্যাসিকদের বই তিনি বেহিসাবী ভাবে কিনতেন।

একমাত্র কন্যা অনুপমার প্রতি তাঁর যেমন গভীর স্নেহ ছিল তেমনি কোনরূপ শাসন ছিল না। অনুপমা আপন খেয়াল-খুশিমত চিরদিন চলে এসেছে। তবে অর্থের অভাবের জন্য সব সময় সে মনের সকল ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারত না। তার ধনী খুড়তুতো জাঠতুতো বোনেদের মত বাহারে শাড়ী কিনতে, নূতন প্যাটার্নের গয়না পরতে, মাঝে মাঝে মোটরকার করে ঘুরে বেড়াতে, তার ইচ্ছা হত; তার বাপ বলতেন, আসছে মাসে মাইনে পেলেই শাড়ী কিনে দেব, গয়না গড়িয়ে দেব। তারপর ভুলে যেতেন, কিনে আনতেন এক গাদা নূতন বই। মায়ের পুরাতন চুড়িগুলি পরেই তাকে স্কুল-কলেজ করতে হয়েছে।

এখন বাবার কথা ভাবলে মাঝে মাঝে অনুপমার রাগ হয় কিন্তু তখন বাবার ওপর তার রাগ হত না, কেমন মমতা হত। তা ছাড়া,

সে-ও পিতার মত কল্পলোকে আইডিয়ার-রাজ্যে বাস করত। পিতা বাস করতেন মানবজ্ঞানের বিরাট প্রাসাদে,—সেখানে শঙ্করের সঙ্গে ব্রাডলির মতবাদের তুলনা চলছে, আইনস্টাইনের রিলেটিভিটির ব্যাখ্যা হচ্ছে, ফ্রয়েডের সঙ্গে ইউং-এর তর্ক বেধেছে। আর অনুপমা ছিল নানা যুগের নানা দেশের কবি ঔপন্যাসিকগণের প্রেমকামনাক্ষুব্ধ বিচিত্র কল্প-জগতের অধিবাসিনী। পিতার লাইব্রেরীতে তার অবাধ গতি ছিল, যে কোন বই পড়তে, বইয়ের ছবি দেখতে তার বাধা ছিল না। চোদ্দ বছর বয়সে সে বার্টনের আরব্যোপন্যাস পড়েছে; আঠার বছর বয়সে মোপাঁসা, ফ্লবেয়ার, এমিল জোলা শেষ করেছে; কলেজ-জীবনে টুর্গনিভ, সুডারমান্, ডি. এইচ. লরেন্স ছিল তার প্রিয় লেখক। গভীর রাত পর্যন্ত জেগে সে উপন্যাস পড়ত, অধিকাংশ বই সে বুঝতে পারত না, তবু নেশার মত পড়ে যেত। অজানা অস্পষ্ট-বোঝা মানব অন্তরের নানা সুখ-কামনা-আশা-আশঙ্কা-ভরা নভেলের রাজ্য হতে কত বিচিত্র অনুভূতি অপূর্ব কামনা রঙীন মেঘের মত তরুণীর চিত্তাকাশে পুঞ্জীভূত হয়ে আবার ভেসে চলে যেত। অর্ধেক-পড়া নভেল বন্ধ করে আলো নিভিয়ে সে বিছানায় বসে চেয়ে থাকত আলোছায়াখচিত রাত্রির দিকে। মৃদু মর্মরধ্বনিমুখর ম্লানজ্যোৎস্নাময় রাত্রির অস্পষ্ট আবছায়াময় জগৎ তাহারি চিত্তলোকের মত। রাত্রির সঙ্গে সে নিবিড় যোগ অনুভব করত; তার তারালোক নয়, তার ছায়ালোক সে ভরে দিত আপন মনের স্বপ্ন-কামনার অশরীরী কল্পনা-কৌতুকে।

অনুপমার সামাজিক জীবন ছিল স্বল্প। তার বাবার মতই, তার বন্ধুবান্ধব বিশেষ কেউ ছিল না। তার মন কল্পনা-কৌতুকী ছিল বলে সে কখনও নিঃসঙ্গতা অনুভব করত না। যখন কোন বই

পেত না, আকাশের মেঘের খেলা দেখে তার বেলা কেটে যেত, গাছের পাতাগুলির দিকে চেয়ে সন্ধ্যা হয়ে আসত, অন্ধকারের দিকে চেয়ে সে কি ভাবত তা নিজেও বুঝত না।

শুধু মাঝে মাঝে কল্যাণ এসে তার মনকে নাড়া দিত। যেন ঘুমঘোর হতে সে চমকে জেগে উঠত।

কল্যাণ ছিল তার পিতার প্রিয় ছাত্র। তার পিতা শুধু দার্শনিক নয়, গণিতজ্ঞও ছিলেন। অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করতে কল্যাণ তার পিতার কাছে আসত। তা ছাড়া, লাইব্রেরী হতে বই নিতে, গল্প করতে কল্যাণ প্রায়ই আসত। আসার কোন বাঁধা সময় ছিল না। অনুপমার সঙ্গে যে কোন সময় এসে তর্ক গল্প করবার কোন আপত্তি বা বাধা ছিল না।

তরুণ কল্যাণকে তরুণী অনুপমার ভাল লাগত। ফরসা রং, ছিপ্ছিপে চেহারা, ধুতি পাঞ্জাবি সব সময়ে পরিষ্কার ধব্ধবে; তীক্ষ্ণ নাসিকা, জ্বল্জ্বলে চোখ, তরুণ মুখ বুদ্ধিতে দীপ্ত; সে সব সময়ে তর্ক করছে, গল্প বলছে, পরিহাস করছে, চুপ করে বসে ভাবে না, যৌবন-চাঞ্চল্যে ভরা। তার নিঃসঙ্গ তরুণী-জীবনে এই একমাত্র তরুণ যুবক। উপন্যাসের নায়কদের মত সে কল্পলোকে নিয়ে যায় না, পৃথিবীর সহজ সরল জীবনের সঙ্গে গ্রন্থিবন্ধন করে। ছোটখাট জিনিস কিনে আনতে, ফরমাজ খাটতে কল্যাণ, মাঝে মাঝে বেড়াতে বা বায়স্কোপ যেতে কল্যাণই সহায়, পিতার অসুখে ডাক্তার ডাকতে, ঔষধ আনতে কল্যাণই ভরসা। এ রোমান্স নয়, তরুণীর প্রেমলীলা নয়, এ সহজ বন্ধুত্ব।

কলিকাতার ছোট এক গলিতে ছোট পুরানো বাড়ীতে অল্প ভাড়ায় তারা থাকত। পিতার প্রায়ই অসুখ হত, টাকার অনটন ছিল, তবু সে দিনগুলি বড় সুখের, স্বপ্ন মায়াভরা ছিল।

পিতার মৃত্যুর পর অনুপমাকে কখনও থাকতে হত বোর্ডিঙে, কখনও মামার বাড়ীতে। কল্যাণের সঙ্গে দেখাশোনা কমই হত। বাইরে যখন সে দূরে চলে গেল, অন্তরে সে আরও নিকটে এল। কল্যাণ মাঝে মাঝে আসত দেখা করতে; কল্যাণের মাও মাঝে মাছে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতেন। মামার বাড়ীর লোকেরা পছন্দ করত না, কানাঘুষো হোত, কিন্তু কেউ আপত্তি করতে সাহস করত না।

তখন কল্যাণ এম্-এস্-সি পাশ করেছে। হঠাৎ অসময়ে সে হাজির হত। কোন সদ্যপ্রকাশিত ইংরেজী উপন্যাস বা কবিতার বই আনত বা আমেরিকান ম্যাগাজিন। বেশভূষায় পারিপাট্য নেই, মুখ একটু রুক্ষ, কালো চোখে কিসের আলো জ্বলে উঠত, অনুপমার চমক লাগত। মনে হত, কল্যাণ তাকে ভালবাসে। হঠাৎ কল্যাণ উঠে দাঁড়াত, কথা শেষ না করেই চলে যেত। অনুপমা চমকে ভাবত, সে বুঝি কল্যাণকে ভালবাসে।

আজ এ সব প্রশ্ন নিরর্থক, প্রয়োজনহীন। তবু জানতে ইচ্ছে করে, কল্যাণ কি তখন তাকে ভালবেসেছিল?

আর সেই তরুণী অনুপমা?

সে অনুপমা মরে গেছে, যেমন করে রজতবর্ণা গিরি-ঝরনার মৃত্যু হয় বিশাল নদীর পঙ্কিল খরস্রোতে। বাসনাবিহ্বলা ব্যাধিক্লিষ্টা এ নারীর মধ্যে তার সন্ধান কে পাবে?

আলো নিভিয়ে অনুপমা জানলা সব খুলে দিলে।

জর্জেট শাড়ী ছেড়ে শান্তিপুরে শাড়ী পরলে। মাথার চুল খুলে দিলে। এ ছোট কমপার্টমেণ্টে তার যেন দম আটকে আসছে।

জানলার কাঠে মাথা রেখে সে চোখ বুজে শুয়ে পড়ল। রাত্রির

অন্ধকার দিয়ে ট্রেন হু হু করে ছুটে চলেছে। এই গতির ছন্দে সে ভেসে যেতে চায়। বড় কর্কশ ট্রেনের শব্দ।

ধীরে ট্রেনের গতি মন্দ হয়ে এল। এক অজানা অন্ধকার স্টেশনে ট্রেন থামল। বাইরের অন্ধকার বড় স্নিগ্ধ।

অনুপমা ধীরে উঠল। ট্রেনের দরজা খুলে প্ল্যাটফর্মে নামল। ওই লোকটির নাসিকা গর্জন অসহ্য। শুধু বিরক্তি নয়, ব্যর্থতাবোধ, হতাশ্বাস, অন্ধ ক্রোধ।

—মেম সা'ব!

অনুপমা চমকে চাইলে। হীরা সিং-এর দীর্ঘ দেহ তাহার পাশে। কি সজাগ সতর্ক প্রহরী!

—হীরা সিং!

—হুজুর!

—মাল্‌তি-বাবার গাড়ীটা কোথায়?

—একঠো গাড়ী পরে আছে।

—আচ্ছা, তুমি এ গাড়ীতে থাকো, আমি মাল্‌তির সঙ্গে দেখা করে আসি।

—এখনি গাড়ী ছেড়ে দেবে, মেম সা'ব।

—ছেড়ে দেয়, আমি সে গাড়ীতে থাকব।

—যো হুকুম হুজুর।

হীরা সিং এগিয়ে গেল মালতীর গাড়ী দেখাতে। গাড়ীর দরজা খুলে সে দাঁড়াল।

সবিস্ময়ে মালতী দেখলে শ্বেতবসনা এক নারী তার গাড়ীতে উঠল। সঙ্গে কোন জিনিস নেই।

—কি রে মালতি, চিনতে পারছিস না!

—ও, তুমি অনুপমাদি, এত রাতে হঠাৎ এলে? তোমার অসুখ করেছে নাকি।

—অসুখ করতে যাবে কেন?

—ও, তোমার মুখ কি ফ্যাকাসে। বোসো। গাড়ী কিন্তু এখুনি ছেড়ে দেবে।

—দিক্ না; তোর গাড়ীতে নয় কিছুক্ষণ রইলুম। তুই একা যে?

—গাড়ীতে আর কেউ ওঠেনি, তাই একা।

—বা, সহযাত্রীটি কোথায়? তাকে দেখতেই ত এলুম।

গাড়ী ধীরে চলতে লাগল।

—সহযাত্রী? কি বলছ? দেখ না, কি মুশকিল, কোন স্টেশনে কেউই উঠল না। একা রাত জেগে চলেছি।

—সে বুঝি কোথাও লুকিয়ে আছে গাড়ীতে?

মৃদু হেসে অনুপমা সামনের বেঞ্চির তলা দেখলে।

মালতী উদ্বিগ্নভাবে গাড়ীর কোণে চাইল। স্টেশনে গাড়ী থামতেই প্ল্যাটফর্মের উল্টোদিকের দরজা খুলে সমর নেমে গেছে, তারপর তাকে গাড়ীতে প্রবেশ করতে দেখেনি। তবু সে ভীতভাবে চাইলে।

—বুঝেছি, আমায় দেখে অন্য গাড়ীতে গেছে।

—কি হেঁয়ালি বলছ।

—হীরা সিং অত কাঁচা ছেলে নয়।

—হীরা সিং!

—হীরা সিং স্বচক্ষে দেখেছে তোর গাড়ীতে এক যুবক হাওড়া স্টেশনে উঠেছিল, আর বোধ হয় এতক্ষণ ছিল।

মালতীর মুখ শুকিয়ে গেল।

—অনুদি, এদিকে এস, শোন লক্ষ্মী ভাই—

—ভয় নেই, আমি কাউকে বলব না, কি সাহায্য করতে হবে বল্। এত লুকোবারই বা কি আছে।

—সে ভয়ানক ব্যাপার, শোন।

অনুপমা হেসে উঠল! মনোমুগ্ধকর সে হাসি।

—ভয়ানক! সে তোর মুখ দেখেই বুঝছি।

—শোন, সে ছেলেটি সোসিয়ালিস্ট, পুলিশ ধরবে বলে পালাচ্ছে, লুকিয়ে মেয়েদের গাড়ীতে উঠেছিল।

—এ্যাঁ! এ শুধু লভ্ নয় তার সঙ্গে সোসিয়ালিজম্! টুর্গনিভের নভেলের বাংলা সংস্করণ!

—ঠাট্টা নয়, অনুপমাদি! সত্যি বলছি—

মালতী হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল, মুখ দিয়ে কথা বার হল না, যেন সে বোবা।

অদূরে বন্ধ দরজার খোলা জানলার বাইরের দিকে সমরের কালো মুখ সে চকিতের জন্য দেখতে পেলে, যেন ফ্রেমে-বাঁধান একখানি ছবি। চাপা ঠোঁটের ওপর খাড়া তর্জনী দিয়ে সমর ইসারা করছে, চুপ রহো!

নিমেষের মধ্যে সে মুখ অন্তর্হিত হয়ে গেল। মালতীর বুক দুর দুর করতে লাগল। উত্তেজনায় সে দাঁড়িয়ে উঠল।

—কি, চুপ করে গেলি কেন?

মালতী তখন ভাবছে, দরজার বাইরের দিকে পা-দানির ওপর সমর বসে আছে দরজার হাতল ধরে। বড় জোরে ট্রেন ছুটে চলেছে। যদি সমরের পা ফসকে যায়, হঠাৎ ঝাঁকুনিতে হাত আলগা হয়ে আসে, হঠাৎ যদি সে চলন্ত ট্রেন থেকে পড়ে যায়—

মালতীর মাথা গুলিয়ে গেল। অনুপমাদিদিকে সব না বলে উপায় কি!

—শোন অনুদি, তুমি যদি বলো, তুমি কাউকে বলবে না, জগদীশ-বাবুকেও নয় তুমি যদি প্রতিজ্ঞা কর, তুমি ছেলেটিকে পালাতে সাহায্য করবে, সে কিন্তু সোসিয়ালিস্ট—.

—আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব, হোল ত।

—ওই ত্যাখো, ওই!

আরক্ত আননে মালতী বসে পড়ল, দরজা খুলে সমর প্রবেশ করেছে, মাথায় খদ্দরের টুপি তির্যকভাবে টানা, কালো গোঁফের ফাঁকে ব্যঙ্গ হাসি।

নির্নিমেষ নয়নে অনুপমা সমরের দিকে চাইলে। সাহসিক তরুণ যুবক কুলির সাজ পরে বার হয়েছে প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে। কিসের আগুন এর প্রাণে জ্বলছে!

মালতী ধীরে বললে, ইনি আমার অনুপমাদিদি, এঁর কথা তোমায় বলছিলুম, আর ইনি কমরেড সমর—

গোঁফ-জোড়া খুলে সমর মাথা নত করার ভঙ্গী করে বললে, নমস্কার দিদি, দেখলেন বাঙ্গালী মেয়ের সাহস!

অনুপমা দাঁড়িয়ে উঠেছে, ঘনকালো এলোচুলের মধ্যে শাড়ীর কালো পাড় মিশে গেছে; গজদন্তশুভ্র মুখে মাঝে মাঝে রক্তের ছোপ, কৃষ্ণ-তারকা হতে অদ্ভুত জ্যোতি বার হচ্ছে; নারীর এ রূপ সমর কখনও দেখেনি। এ যেন জাদু জানে। এর পাশে মালতীর রূপ, বৈশাখী ঝড়ের কালো মেঘে সূর্যাস্তের বর্ণোৎসবের প্রান্তে সন্ধ্যার শুকতারার মত।

অনুপমা হেসে উঠল, বেশ সাজ করেছ ত তুমি! বোসো।

তার চোখ তখনও জ্বল্ জ্বল্ করছে। তার মনে পড়েছে, তরুণ কল্যাণকে অনেকটা এই রকমই দেখতে ছিল; তবে কল্যাণ ছিল

আরও ফরসা। বাংলার তারুণ্যের রূপ কুলির সাজ পরে তার সম্মুখে।

স্নিগ্ধ হেসে অনুপমা বললে, এই কচি ছেলে, একে ধরবার জন্যে পুলিসের ঘুম নেই!

—দেখুন দিদি, আপনার স্বামী কিন্তু আমায় দেখতে পেলে এখুনি হ্যাণ্ডকাপের আদেশ দেবেন। বুঝলেন দিদি!

দিদি! কোন অজানা তরুণ যুবক অনুপমাকে এমনভাবে এমন স্বরে দিদি বলেনি। সে যেন কতদিনের জানাশোনা। অনুপমার বড় ভাল লাগল।

অনুপমা এগিয়ে গিয়ে সমরের সামনে বসল। ধীরে বললে, দেখ সমর, তোমার এ দিদি থাকতে তোমার কোন ভয় নেই, এই তোমায় বলে দিলুম।

—হাঁ, তুমি প্রতিজ্ঞা করলে, সেই সাহসেই ত দরজা খুলে এলুম। আমি ট্রেনে ঝুলে সারারাত যেতে পারি, দরকার হলে, চলন্ত ট্রেন হতে লাফিয়েও পড়তে পারি। কিন্তু কমরেড মালতীর সাহস দেখলে—

মালতী এতক্ষণ চুপ করে বসেছিল। যেন সে সেখানে নেই। এবার ঝাঁজাল স্বরে সে বলে উঠল, তুমি হাতল ধরে একবার বসছ, একবার দাঁড়াচ্ছ, কার না ভয় করে বল?

অনুপমা মৃদু হেসে বললে, ঠিকই ত, জানো সমর, যাকে ভালবাসা যায় তার জন্যে সব সময়ই ভয় হয়, অকারণেও ভয় হয়--

মালতী একটু তিক্ত স্বরে বললে, কি যা-তা বলছ অনুপমাদি, ওসব ভালবাসার অভিজ্ঞতা আমার নেই।

—আহা চটিস কেন, ভালবাসা পাওয়া ত ভাগ্যের কথা।

সমর এবার হেসে উঠে বললে, দেখ দিদি, আমি ভালবাসায় বিশ্বাস

করি না, ওটা যত বুর্জোয়া কবি-সাহিত্যিকদের কল্পনার সৃষ্টি, উপন্যাস লেখবার জন্যে।

মালতীর দিকে ফিরে অনুপমা বললে, তোমারও তাই মত নাকি?

—মোটেই না, প্রেমের অস্তিত্বকে আমি বিশ্বাস করি। তবে সত্যিকার প্রেম ক'জনই বা পায়, ক'জনই বা জানতে পারে?

—তা হ'লে কমরেড মালতী স্বীকার করছ, ও জিনিস সর্বজনলভ্য নয়—যা সবাই পেতে পারবে না, সোসিয়ালিস্ট সে জিনিস চায় না।

—ও আলোচনা থাক। তার চেয়ে তোমার কথা বল সমর।

—কি জানতে চাও, দিদি। একটা মিলের ধর্মঘটে গরম বক্তৃতা দিয়েছিলুম।

—তোমার মা আছেন?

—ওই, মেয়েদের মামুলি প্রশ্ন। আছেন বৈকি, তবে দিদি নেই, দিদি পেলুম।

তারপর মালতীর দিকে ফিরে সমর বললে, শোন কমরেড, কাল মাকে কিন্তু চিঠি লিখতে ভুলো না।

—আচ্ছা তোমার ধর্মঘটের গল্পই বলো।

—শোন দিদি, গত বছর ডিভিডেণ্ড ডিক্লেয়ার করেছিল চব্বিশ পারসেণ্ট, তার আগের বছর বিশ, এদিকে কুলীদের থাকবার বস্তি যদি দেখতে—

উত্তেজনায় সমর দাঁড়িয়ে উঠল। প্রভাত সূর্যালোকদীপ্ত তরুণ শালবৃক্ষের মত তার মুখ ঝলমল করছে।

মুষ্টিবদ্ধ হস্তের তরঙ্গায়িত ভঙ্গী করে সমর বলে যেতে লাগল, আমি বললুম, কমরেড্‌স্—

বিমুগ্ধভাবে অনুপমা সমরের দিকে চেয়ে রইল। কৃষ্ণচক্ষুতারকা

মাঝে মাঝে জল্ জল্ করে উঠছে। সমরের সব কথা সে শুনছিল না, সে দেখছিল সমরের তারুণ্যমণ্ডিত দীপ্ত শ্রী। সে ভাবছিল, সে যদি আজ মালতীর মত কলেজের মেয়ে হত, যদি ফিরে পেত মালতীর বয়স। সমরের মত কোন দুরন্ত প্রাণভরা স্বপ্নভরা তরুণের প্রেম যদি নাও পেত, সে ত হতে পারত মালতীর মত তার সহযাত্রিণী। রুডিনকে কি এমনি দেখতে ছিল? বাজারফের মতন কি সমরকে মরতে হবে? কিসের অগ্নি এদের প্রাণ-প্রদীপে জ্বলছে!

বাইরে অন্ধকার রাত্রি। ট্রেন ছুটে চলেছে দুর্নিবার বেগে।

পরের স্টেশনে ট্রেন থামতেই হীরা সিং মালতীর গাড়ীর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। গাড়ীর দরজা খুলে বললে, মেম সা'ব!

অনুপমা চমকে চাইলে। টোপরের মত সুচালো সাদা বড় পাগড়ি, আয়তবক্ষে জরির কাজ করা লম্বা আচকান, শালবৃক্ষের মত দীর্ঘ ঋজু দেহ নিশীথ গগনের পটে চিরজাগ্রত প্রহরীর মত আঁকা।

—কি হীরা সিং, সাহেব জেগেছেন।

—না, মেম সা'ব।

—আমি পরের স্টেশনে—

—আপনার তবিয়ৎ আচ্ছা নেই মেম সা'ব।

—মালতী, এই হীরা সিং, সমর—

অনুপমা চারিদিকে চেয়ে দেখলে, কোথাও সমর নেই। চকিতের মধ্যে অজানিতভাবে সে কখন অদৃশ্য হয়েছে। আর এ গাড়ীতে থাকতে অনুপমার উৎসাহ রইল না।

—চললুম মালতী, খুব খুশি হলুম দেখে, কন্‌গ্রাচুলেসন্ করতে পারি?

—মোটেই না। তোমরা ওছাড়া কিছু কি ভাবতে পার না?

—আচ্ছা, কাল সকালে আমার গাড়িতে এসে চা খাবি, কেমন? এখন ঘুমিয়ে নে! আর রাত জাগিস্ না।

—মেম সা'ব।

—চলো হীরা সিং।

মালতী চুপ করে বসে রইল।

অন্ধকার কুপেতে অনুপমা নিঃশব্দে প্রবেশ করলে। জগদীশ নিঃসুপ্ত। ছোট বৈদ্যুতিক পাখাটার বিরামহীন শব্দ, যেন একটা কালো পোকা বদ্ধঘর হতে বার হবার পথ খুঁজে পাচ্ছে না, একটানা আর্তনাদ করে ঘুরছে।

অনুপমা আলো জ্বাললে না। পা ছড়িয়ে রঙীন বালিশে ঠেসান দিয়ে বসলে। পিঠ ব্যথা করছে। ব্লাউজের বোতাম খুলে দিলে। গাড়ীর মেঝেতে শাড়ীর আঁচল লুটিয়ে পড়ল। জলতেষ্টা পেয়েছে, কিন্তু আবার উঠে জল গড়িয়ে খাবার মত শক্তি যেন তার নেই। হাত-ব্যাগ থেকে একটা প্যাস্টিল্ মুখে পুরে দাঁত দিয়ে কামড়ালে।

নিরন্ধ্র অন্ধকারের মধ্য দিয়ে ট্রেন ছুটে চলেছে দিশাহারা ঝড়ের বাতাসের মত। দেহ বারবার দুলে উঠছে।

অতীত জীবনের স্মৃতি নয়, বর্তমান জীবনের বেদনা-তৃষ্ণা নয়, মন এগিয়ে চলতে চায়। অসীম গগন ভরে আলোর প্রদীপ হাতে অনন্ত পথযাত্রীরা অহর্নিশি ছুটে চলেছে, পৃথিবীর ধূলি তৃণ পর্বত বন নদী সমুদ্র তারি ছন্দে ছুটে চলেছে, এগিয়ে চলো।

চোখ বুজে অনুপমা অনুভব করতে চেষ্টা করলো, বিশ্বের অসীম প্রাণস্রোতের সঙ্গে সে-ও ভেসে চলেছে। আফিসের ফাইল ভরা ঔষধের শিশি-ছড়ানো জগদীশের প্রাসাদ-কারার বন্দিনী সে নয়।

হঠাৎ ট্রেন থেমে গেছে। অনড় প্রস্তরের মত স্থির।

অনুপমা চেয়ে দেখলে, ছোট স্টেশন, আলোগুলি মিট্‌মিট্ জ্বলছে, নির্বাত নিষ্কম্প বনভূমি। তারাগুলি স্থির পথ-চাওয়া নয়নের ক্লান্ত দৃষ্টির মত; নিখিল প্রাণস্রোত সহসা গতিহীন, অচঞ্চল হয়ে গেছে।

মুখ বাড়িয়ে অনুপমা প্ল্যাটফর্ম দেখলে। নেমে চলে যেতে ইচ্ছে করে এই স্তব্ধ অরণ্যে।

ট্রেনের গার্ড লাল লণ্ঠন হাতে নিয়ে ছোটাছুটি করছে। ইঞ্জিনের কুলি একটা নেমেছে। কি একটা গোলমাল হয়েছে। কয়েকজন যাত্রীও নেমে পড়েছে।

ও কে? ও কে? যেন ঘুমের ঘোরে চলেছে।

অতি মৃদুস্বরে অনুপমা ডাকলে, কল্যাণ!

যেন সে আপন মনে কথা কইছে। যে সুরে নিস্তব্ধা নিশীথিনীর কানে কানে সে বলে, আমি বন্দিনী, সেই সুরে সে ডাকলে, কল্যাণ! কল্যাণ!

চকিতে কল্যাণ এগিয়ে এল, গাড়ীর খোলা জানলার কাছে দাঁড়ালে।

অনুপমার চোখের ওপর সে চোখ রাখলে। আর কিছু বলতে পারলে না। রাত্রি-জাগা রক্তহীন মুখ বড় করুণ, কৃষ্ণচক্ষে বিদ্যুদ্দাম নেই, উষার শুকতারার মত নিমেষহারা চাউনি।

—কি হয়েছে?

—হট্ এ্যাক্সল্।

অনুপমা গাড়ীর দরজা খুলে দিলে। কল্যাণ দরজার সামনে এসে দাঁড়াল।

—এস ভেতরে।

—হঠাৎ ট্রেন ছেড়ে দিতে পারে।

—ছাড়ুক না।

মন্ত্রচালিতের মত কল্যাণ কুপেতে উঠল, অনুপমার পাশে বসল। দূর বন হতে একটা দম্‌কা বাতাস খোলা দরজা দিয়ে প্রবেশ করে জানলা দিয়ে বার হয়ে গেল, দীর্ঘনিশ্বাসের মত। আবার সব স্তব্ধ। রাত্রি রিমঝিম্ করছে।

—এখনও কি তোমার রাতে ভাল ঘুম হয় না। রাত জেগে পড় ?

—চুপ, কথা কোয়ো না।

কল্যাণ নিজের হাতে অনুপমার হাত টেনে নিলে। কি নরম ঠাণ্ডা হাত। কোন ইংরেজ মেয়ের এত নরম হাত সে দেখেনি।

—চারদিক কি চুপচাপ ! তারাগুলো যেন খুব কাছে মনে হচ্ছে, কি দপ্‌দপ্ করছে—আচ্ছা ওই বনে বাঘ আছে ?

—খুব আছে, এখন সব শিকারের সন্ধানে বার হয়েছে।

—রাতের গভীর বন দেখতে বড় ইচ্ছে করে; ওর মধ্যে যদি বাড়ী করে থাকা যেত।

—গ্রীন ম্যানশান !

—চুপ !

ইঞ্জিনের দীর্ঘ তীক্ষ্ণ হুইস্‌ল্ ধ্বনিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠল। এবার ট্রেন ছাড়বে, তারই সঙ্কেত।

কল্যাণ একটু নড়ে বসল কিন্তু উঠল না। দৃঢ় চাপে অনুপমা তার হাত ধরে। সে হাত এখন আতপ্ত।

ট্রেন নড়ে উঠল। দুজনে বসল ঘেঁষাঘেঁষি।

ট্রেন ছুটে চলেছে।

—চুপে চুপে কথা বল, অমন চুপ করে থেকো না।

—বড় সুন্দর তোমায় দেখাচ্ছে, আগেকার চেয়ে অনেক সুন্দর হয়েছ।

—সে কথা বলতে তোমায় ডাকিনি। মেমদের ওসব কথা বলে বলে বুঝি মুখস্থ হয়ে গেছে।

—সত্যি, তোমার মত অমন সুন্দর চোখ আমি সমস্ত বিলেতে কোথাও দেখিনি।

—চুপ করে বোসো, কথা কোয়ো না।

অনুপমা অনুভব করছিল কল্যাণের রক্তধারার ছন্দ, আতপ্ত স্পর্শ নিজের ব্যাধিবিহ্বল তনুতে।

—একটু ভাবতে আমার কথা?

—প্রায়ই ভাবতুম।

—চিঠি দিতে না কেন?

—পিক্‌চার কার্ডস্‌গুলো পেতে না?

—সে বুঝি চিঠি!

—শোন, অনু—

—কথা বোলো না। বড় ভাল লাগছে তোমায় দেখে, বহুদিন পরে দেখলুম। বিলেতে বিয়ে করেছ?

—না।

—সত্যি বলছ?

—সত্যি, না।

—তবে যে শুনেছিলুম—

—সে মিথ্যে, সম্পূর্ণ মিথ্যে। মাকে জিজ্ঞেস করনি কেন?

—কথা বোলো না। ভাল লাগে না কথা।

—স্থির হয়ে বোসো। একটু শুয়ে পড়।

—ট্রেনটা বড় দোলে। মাথা দপ্‌দপ্‌ করে। ডাক্তারেরা বারণ করেছিল ট্রেনে চড়ে একসঙ্গে এত পথ যেতে!

—জ্বর আসে নাকি?

—বহুদিন আসেনি। আর ভুগতে ভাল লাগে না—জীবনটা বৃথা মনে হয়—কারও একটু কাজে লাগে না—

—ঘুম হয়নি সারারাত?

—না, ঘুম আসে না, যত বাজে কথা মাথায় ঘোরে। তুমি জান বরাবরই ঘুম আমার কম হয়, তবে এখন আর উপন্যাস পড়তে ভাল লাগে না; তাই হিজিবিজি কত কি ভাবি। ভাবি বললেও ঠিক হয় না, তারা নিজেরাই আসে নিজেরাই চলে যায়। বাবার কথা মনে পড়ে তোমার?

—খুব পড়ে।

—তোমায় দেখে সেই সব পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে গেল। সে যেন অন্য কোন জন্মের, অন্য কোন যুগের জীবন।

—স্বপ্নের মত মনে হয় সে দিনগুলো। শোন, অনু—

—চুপ, কথা কোয়ো না। রাত্রির স্তব্ধতায় সমুদ্রের ঢেউগুলো বালুতীরে আছড়ে আছড়ে কেমন ভেঙে পড়ে, শুনেছ—শুয়ে থাকলে ট্রেনের শব্দ আমার সেই রকম লাগে—হ্যাঁ, ওইখানটা টিপে দাও, মাথার মাঝখানটা, চুলগুলো বেশ জোরে টেনে—

—একটু ঘুমোতে চেষ্টা করো।

আতপ্ত কপোল রক্ত স্থলপদ্মের মত; হৃৎ-পিণ্ডের রক্তের তাপে দ্রুত নিশ্বসন অত্যুষ্ণ, ধারা-বর্ষণে আন্দোলিত পুষ্পিত কদম্ব তরুর মত দেহ থরথর কাঁপছে।

—অত কাছে এসো না—আমি যক্ষ্মারোগী, ভুলে যাও কেন—ভয় করে না?

—না। কিছুমাত্র না।

—আমার যে ভয় করে। কথা বোলো না। কথা—খ্যক্—খ্যক্—ক—

লাল নীল হলদে নানা রঙের সিল্কের গোল কুশনে মুখ গুঁজে অনুপমা কাশির বেগ চাপতে চেষ্টা করলে। অদমনীয় কাশির বেগ। জোরে বালিশ চেপে সমস্ত মাথা গুঁজে সে কাশতে লাগল।

ভয়ে ও অসহায়ভাবে কল্যাণ দাঁড়িয়ে উঠল।

মুখ দেখা যাচ্ছে না। কোন আহত জন্তুর গোঁঙানির মত চাপা কাশি।

অস্ফুটস্বরে কল্যাণ বলে উঠল, হাউ আনক্যানি! ও!

সে ভাবতে লাগল, যদি রক্ত ওঠে, জগদীশকে বোধ হয় ডাকতে হবে। কোনরূপ উত্তেজ না ওর সয়না।

কুসানগুলিতে অমন করে মুখ গুঁজে ও কাশছে কেন!

ধীরে কাশির বেগ থামল। বালিশ থেকে মুখ তুলে ম্লান মধুর হেসে অনুপমা চাইল। বালিশের রক্তিমবর্ণ যেন তার মুখে ছড়িয়ে গেছে।

—কি ভয় পেয়ে গেছ! ও কিছু নয়, বোসো! কি দেখছ? ও গলার কাশি—রক্ত ওঠে না—এ রকম প্রায়ই হয়—গলার কাশি—রুমালটা দাও দেখি খুজে—একটা প্যাস্টিল দাও, ওই ব্যাগটায় আছে—জল—না, জল একটু পরে খাব—বোসো—

—এ রকম কাশি আমি কখনও শুনিনি।

অনুপমা কাত্ হয়ে উঠে বসল। কল্যাণ বসল জানালার কাছে।

—কি, ভয় করছে? আর কাশব না—এবার বোধ হয় ঘুম আসবে—তুমি কিন্তু চুপ করে বসে থাক।

কল্যাণের কাঁধে ছোট বালিশ রেখে তার ওপর অনুপমা মাথা রাখলে। চোখ বুজে সে বললে, এমনি মাথা উঁচু করে শুয়ে থাকি, তা হলে কাশি আসবে না—তুমি চুপ করে বসে থাক, যেও না। এবার একটু ঘুম আসছে।

কল্যাণ বাক্য-হারা বসে রইল। অনুপমার মুখ সে দেখতে পাচ্ছে না। শুধু সে অনুভব করছে, সদ্য-ফোটা শিশির-ভেজা শ্বেতপদ্মের মত সে মুখ শান্ত স্নিগ্ধ নির্মল।

ধীরে রাত্রি ক্ষয় হয়ে আসছে। নিম্নে প্রান্তর বনস্থলীতে অন্ধকার, ঊর্ধ্ব গগনে আলোর আভাস, তারাগুলি একে একে মিলিয়ে যাচ্ছে। শুধু দূর দিক্‌-চক্রবালে শুকতারার শুভ্র দীপ্তি।

পরম বিস্ময়ে বিমুগ্ধভাবে কল্যাণ চেয়ে রইল রাত্রিশেষের পৃথিবীর দিকে। এমন শান্তি, এমন স্নিগ্ধতা সে কখনও অনুভব করেনি।

নিদ্রাভরা অনুপমাকে ধীরে শুইয়ে দিয়ে কল্যাণ যখন পরের স্টেশনে নিঃশব্দে কূপে থেকে নেমে গেল, তখন সুবর্ণবর্ণা কল্যাণী ঊষা পূর্ব দিগন্তে আবির্ভূতা; শোন নদীর জল তাহারি আভায় রাঙা হয়ে উঠেছে।

নিজের গাড়ীতে গিয়ে উঠতেই, ঘুমে তার দুই চোখ ভারী হয়ে উঠল। পাইপটা ধরিয়ে খাবারও উৎসাহ রইল না।

প্রেমদাস বললেন, আপনার ভয়ানক ঘুম পেয়েছে দেখছি। আপনি এইখানে শুয়ে পড়ুন, আমি ওই কোণে বসছি।

দ্বিধা না করে কল্যাণ প্রেমদাসের বার্থে শুয়ে পড়ল।

৬

ভোরের আলো যখন আকাশের দিগ্বলয়ে ছড়িয়ে পড়ে, নীড়ে নীড়ে পাখীরা উস্‌খুস্‌ করে ওঠে, তখন রোজ খোকার ঘুম ভেঙে যায়। সদ্যফোটা কাঁটালি চাঁপার মত কোমল আলোয় কচি চোখ মেলে সে হেসে ওঠে, হাত্‌-পা ছোঁড়ে, মায়ের বুক-পিঠ খামচায়, কখনও বা কান্নার সুরে ডাকে, তারপর হেসে ওঠে। সরোজিনীকে তার সঙ্গে খানিকক্ষণ খেলা করতে হয়, দুধ খাওয়াতে হয়। তারপর খোকা আবার ঘুমিয়ে পড়ে।

বেঞ্চির মাঝখানে ট্রাঙ্ক সুটকেশ এ্যাটাচিকেশ দিয়ে বেঞ্চিগুলির সমান উঁচু করে দুই বেঞ্চি জুড়ে ঢালাও বিছানা হয়েছে। কাঠের দেওয়ালের দিকে শুয়েছে শিবাজী, তার পাশে দীপিকা, তারপরে বালিশের ব্যবধান দিয়ে ছোট কাঁথায় খোকা, তারপর সরোজিনী, সবাই আড়াআড়ি শুয়েছে।

রাত্রে সরোজিনী নিশ্চিন্ত মনে ঘুমোতে পারেনি। বার বার ঘুম ভেঙেছে। শিবাজীকে সোজা করে শুইতে দিতে হয়েছে, সে রাতে চরকির মত ঘোরে; দীপিকার গায়ে চাদর ঢাকা দিতে হয়। দত্তগিন্নি বলেছিলেন, ট্রেনে তাঁর ঘুম হয় না, তিনি সজাগ থাকবেন। কিন্তু সরোজিনী যখনই জেগেছে, দেখেছে তিনি গভীর নিদ্রিতা, নাসিকা-ধ্বনিতে গাড়ী মুখরিত।

খোকার কচি মুঠোর ঠেলায় সরোজিনীর ঘুম ভেঙে গেল। চোখ রগড়াতে রগড়াতে সে বিরক্তভাবে চাইলে, ইচ্ছে হল খোকার পিঠে এক কিল বসিয়ে দেয়, কিন্তু খোকার হাসিমুখের দিকে চেয়ে তাকে বুকে

টেনে নিলে। দেখলে, ওদিকের বেঞ্চে দত্তগিন্নি বসে মালা জপছেন ও তাদের দিকে কটমট করে চেয়ে আছেন।

খোকাকে দুধ খাওয়াতে হবে। সরোজিনী উঠে বসল।

—আপনি কতক্ষণ উঠেছেন, মাসীমা ?

—আমার ব্রাহ্মমুহূর্তে ওঠা অভ্যেস, বুঝলে সরযূ।

—আমার নাম সরোজিনী !

—আমার কি অত মনে থাকে। বলছিলুম কি, এই যে আজকালকার বৌ-ঝিরা, এদিকে চড়চড়ে রোদ উঠে গেছে, আর দরজা বন্ধ করে ঘুমোচ্ছেন, এ বাপু আমরা কোন দিন পারি নি, পারি না।

—আমারও মাসীমা ভোরে ওঠা অভ্যেস, আর এই যে এলার্ম ক্লক্ রয়েছে, ঘুমোবার কি জো আছে, গুঁতিয়ে কেঁদে জাগিয়ে দেবে।

—এ ত কর্তব্য সরযূ !

—সরোজিনী !

—আমার অত ছাই মনে থাকে না। তা তুমি বড় ভাল মেয়ে দেখছি। আজকালকার ছেলেমেয়েরা ত মায়ের কোলই পায় না, ঝি-চাকরের কোলে কোলেই ঘোরে,—মা'রা সাজছেন গুজছেন, বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করছেন, মাঝে মাঝে আবার আদরও উথলে উঠে, তখন ঝি-চাকরদের কসে বকুনি।

—আমি ঝি-চাকরদের কাছে ছেলেমেয়ে মানুষ-করা পছন্দ করি না।

—সেই কথাই ত বলছিলুম। এই আমাদের বড়বৌ—তোর টানাটানির সংসার, একটা ঝি আছে, বেশ, তার ওপর আবার একটা চাকর, বামুন কেন—যখনই দেখি, চাকরটা ছেলেটাকে কোলে নিয়ে সদর দরজার গোড়ায় বিড়ি ফুঁকছে—ছি ছি !

—আপনার কোন্ ছেলে সঙ্গে যাচ্ছেন ?

—ওই ত বড়ছেলে গো। খুব পণ্ডিত, বিদ্বান মানুষ, সব পরীক্ষায় জলপানি পেয়ে এসেছে—কিন্তু হলে কি হয়, টাকার দিকে ঢু—ঢু—তবে আমার মেজছেলে খুব রোজগেরে, তার কাছেই ত বোম্বে যাচ্ছি। রোজগার করলে কি হয় মা, ছেলেমেয়ে ত হল না একটা এতদিনে—আর মেজবৌমার ত নিত্যি অসুখ—এদিকে পটের বিবির মত ফিটফাট সেজে আছে সারাক্ষণ—

—ছেলেমেয়ে হওয়া ভাগ্য মাসীমা, ইচ্ছে করলে কি সবার হয়।

—সেই ত বলি সরযূ! তেলিগ্রাম এল, মেজবৌমার অসুখ, তেলিগ্রামে ভাড়ার টাকা শুদ্ধ পাঠিয়ে দিয়েছে, তাই হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটেছি। এদিকে মেজছেলের কাছে বেশি দিন থাকবার জো নেই, বড়বৌমা বলবে, বড়লোক ছেলের বাড়ি বেশি দিন থাকবেই ত মা। তা তোদের বাড়ি আসব কি, ওই ঝি-চাকরদের হাতে সংসার তুলে দেওয়া আমার ভাল লাগে-না—আমি নিজের হাতে রেঁধে খাই—

—আপনার মেজছেলের বাড়ি কতগুলি ঝি-চাকর মাসীমা?

—ও বাবা, সেখানে আবার বাবুর্চি-বেয়ারা গিস্‌গিস্ করছে—কানের কাছে সারাক্ষণ 'মেম সাহেব' 'মেম সাহেব' করছে—

—শুনতে ভাল লাগে?

—তা বড় কাজ করে, ও সব না করলে নাকি উন্নতি হয় না। আমি বকে দি—সারাক্ষণ মেমসাহেব মেমসাহেব করিস্‌নি।

দুধ খেয়ে খোকা ঘুমিয়ে পড়ল।

শিবাজী জেগে উঠল। দীপিকার পিঠে এক ঠেলা দিতে সে উঠে বসল।

—মা, কোন্ স্টেশন?

—স্টেশন কোথায় বোকা ছেলে, গাড়ী ত চলছে।

—ও! চকোলেট দেবে বলেছিলে, সকালে।

—আমি কখন বললুম?

—রাঙামামা বলেছিল। রাঙামামা কোথায়?

—যাও, আগে দাঁত মাজো, হাত মুখ ধোওগে।

শিবাজী লাফিয়ে উঠল। এ্যাটাচিকেশ থেকে দাঁতের বুরুশ, মাজন, তোয়ালে, সাবান বের করে বাথরুমে গেল।

মালাজপ শেষ করে দত্তগিন্নি বললেন, এ বেশ ভাল শিক্ষা। নিজে নিজের সব করে।

সরোজিনী আলোভরা মাঠের দিকে চেয়ে বললে, কিন্তু দাদার কাণ্ড দেখলেন!

—তোমার দাদা বেশ ছেলেটি।

—সারারাত একবার উঁকিও মারলে না।

—আমি যেন কোন্ স্টেশনে দেখলুম, হন্ হন্ করে চলে গেল ওদিকে।

—আপনি ত দিব্যি ঘুমোচ্ছিলেন, আপনি দেখলেন কখন?

—সে কি সরযূ!

—আমার নাম সরোজিনী, মাসীমা।

—আমি না হয় তোমার আর একটা নাম দিলুম। রাগ কোরো না।

—রাতে একবার এসে খোঁজ নেওয়া ত উচিত ছিল, দাদার।

—বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছে, ক্লান্ত ছিল। তোমার দাদার বিয়ে হয়েছে?

—ওই দেখুন না আর এক কাণ্ড! এই সাত বছর পরে বিলেত থেকে এলেন। বিয়ে হবে কখন?

—সেখানে বিয়ে-থা করেনি ত?

—লোকে কত কথা বলে, গুজব রটাচ্ছে। দাদা ত বলে, করিনি। সুতরাং আমরাও বিশ্বাস করি, করেনি।

—আবার বিয়ে করবে কথা দিয়ে না এসে থাকে। সে আর এক মুশকিল, সরোজিনী!

—দাদা বলেছে, ভাল চাকরি না পেলে বিয়ে করবে না।

—সাত বছর বিলেতে ছিল। তাই ত মা! শোন, একটা পরামর্শ দি। তোমার মাসীমা দেখছ সেকেলে, কিন্তু দত্তবাড়ীতে বসে অনেক কিছু দেখেছি—শোন বলি, চিঠি-পত্তর খুলে দেখছ?

—চিঠি-পত্তর কি খুলব মাসীমা?

—নাও, নেকী মেয়ে! বলি বিলেত থেকে যে সব চিঠি-পত্তর আসে, মেম-বন্ধুদের গো—খুলে পড়ছ?

—সে পড়ব কি করে? দাদা দেবে কেন পড়তে?

—শোন, একটা মতলব দি। আমার দেওরের শালার ছেলে, সেও ওই রকম আট বছর ছিল বিলেতে। এসে বলে বিয়ে করব না। আমি বললুম, খোঁজ নাও বাপু, গোলমাল আছে; চিঠি দেখ, চিঠি। আমার পরামর্শ মতই ত পিয়নের সঙ্গে সড় করে সব বিলিতী চিঠি নিয়ে নেওয়া হল; খুলে দেখা গেল কোন্ মেমকে বিয়ে করবে বলে প্রতিজ্ঞা করে এসেছে। হপ্তায় হপ্তায় মেমের মোটা মোটা চিঠি আসে—বাছাধন একখানিও পান না—নিজেই লিখে মরেন মোটা মোটা চিঠি, তাও বাড়ীর কাউকে দিলে ডাকে ফেলা হত না। বাছা আমার কিছুদিন গুম্ হয়ে বসে রইলেন বাড়ীতে, চিঠির জবাব পান না হপ্তায় হপ্তায়। ভাবলে, মেম ভেগেছে আর কারুর সঙ্গে, আর কেন, বিয়ে করতে রাজী হয়ে গেল। আমার বোনের মামাশ্বশুরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। এখন তিন ছেলে, চার মেয়ে, দিব্যি সুখে ঘরসংসার করছে। তাই বলছিলুম,

সরোজিনী—দেখ, এবার তোমার নাম ঠিক বলেছি—বলছিলুম, লুকিয়ে চিঠি দেখ, ওসব কলকৌশল করতে হয়।

—দাদা সে রকম প্রকৃতির নয়, মাসীমা। যদি বিয়ে করতেন নিজেই বলতেন।

—করেন নি ত ভাল। এখন তোমরা দেখেশুনে দিয়ে দাও শীগ্‌গীর। এ ত কর্তব্য মা।

—এ আপনি ন্যায্য কথা বলেছেন, মাসীমা।

—শোন সরোজিনী, একটি খুব ভাল মেয়ে আছে—দেখ, এবার তোমার নাম ঠিক বলেছি—আমাদের পাড়ায় মল্লিকদের বাড়ীর চারটে পাশ-করা মেয়ে, বরাবর জলপানি পেয়ে গেছে—

—দেখতে কেমন মাসীমা? আমাদের খুব সুন্দরী বৌ হওয়া চাই, আমার ত তাই ইচ্ছা। মা বলেন, তুই সারাক্ষণ সুন্দরী সুন্দরী করিস্ না, ও নিজের পছন্দ মত যা হয় একটা করুক।

—সেই কথাই ত বলছি মা সরোজিনী। মেয়ে খুব সুন্দরী নয়, কিন্তু ওই মেয়েই তোমার দাদার পছন্দ হবে, বলে দিলুম আমি। আর মানাবে, তোমার দাদাকে ত দেখলুম—নেহাৎ কচি মেয়ে ত বিয়ে করতে পারবে না—হাঁ, "মালতী" নাম মেয়েটির—রং ফরসা—আমি কালো মেয়ের কথা বলব না মা—আমার ভাসুরের শালার নাতনী, বাপ নেই কিন্তু বাপু।

—তা হ'লে?

—তা তোমাদের ত টাকা চাই না, বাপ নাই রইলো। মা'টি বড় ভালমানুষ গো। মেয়ের বিয়ের জন্যে আমার কাছে কত হাঁটাহাঁটি করছে; আমার হাতে কি ছেলে আছে বাপু। আবার মেয়ে বলে বিয়ে করব না, স্বদেশী করে বেড়াব।

—তবে মাসীমা, এই স্বদেশী মেয়ে আমাদের ঘাড়ে চাপাতে চান, ওখানে হবে না মাসীমা, আপনি অন্য কোন সম্বন্ধ জানেন ত বলুন।

—ও স্বদেশী, মা, দু'দিনের খেয়াল,—এ মেয়ে তোমার দাদার পছন্দ হবে, এ আমি বলে দিলুম।

সরোজিনী আর কোন উত্তর দিলে না। সুটকেশ খুলে শিবাজীর কাপড় জামা বার করে দীপিকাকে ঠেলে জাগাল।

কে যেন ঠেলা দিয়ে রাধাকান্তকে জাগিয়ে দিলে। ঠেলা নয়, গাড়ীর ঝাঁকুনি। তবু রাধাকান্তের মনে হল, যেন তার ছোট মেয়ে মিনু তাকে ঠেলা দিয়ে বলছে, বাবা, ওঠ, দাঁড়াবে চল।

রাধাকান্তের খাটের পাশে ছোট খাটে মিনু শোয়। রাধাকান্তের স্ত্রী শোয় মেজেতে মাদুর পেতে; এমন অকাতরে ঘুমোয় যে, মিনু বার বার ডেকেও কোন সাড়া পায় না। তখন সে বাবার খাটের কাছে এসে ধীরে ডাকে, হাত ধরে টানে, বাবা এসো। অন্ধকারে বারান্দা দিয়ে বাথরুমে যেতে মিনুর ভয় করে। রাধাকান্তকে উঠতে হয়, মিনুর হাত ধরে যেতে হয় বারন্দায়। ঘুমের ঘোরে মিনু কি যা-তা বলে ওঠে, রাধাকান্তের বড় মজা লাগে। তার প্রিয় কুকুর "খাঞ্জা খাঁ" একবার ডেকে ওঠে, তারপর লেজ নাড়তে নাড়তে পা চাটে। নামটি মিনুর দেওয়া।

রাধাকান্ত চমকে জেগে উঠল। ভাবলে, রাতে মিনু তাকে ডেকে পায়নি। তারপর মনে পড়ে গেল, কারখানায় ধর্মঘট, ব্যাঙ্কেতে টাকা নেই, মোগলসরাই থেকে টেলিগ্রাম করতে হবে!

রাধাকান্ত বাঙ্কেতে সোজা হয়ে বসল। গাড়ী প্রভাতের আলোয় ভরে গেছে। গাড়ীর আলো সে নিভিয়ে দিলে।

দেবপ্রিয় ধীরে বললে, নেমে আসুন, নীচেতে যথেষ্ট জায়গা রয়েছে।

রাধাকান্ত, জিজ্ঞেস করলে, মোগলসরাই আর কত দূর মশাই ?

দেবপ্রিয় বললে, বেশি দূর নয়।

হুঁ, বলে রাধাকান্ত বসে রইল, বাঙ্ক থেকে নামল না। ভাবতে লাগল, মোগলসরাইতে ভাল করে খেতে হবে, কতকগুলি চিঠি লিখতে হবে, হিসাবও করতে হবে।

কল্যাণ ছাড়া এ গাড়ীর সবাই জেগে উঠে বসেছে।

কনকের পায়ের কাছের বোতলগুলির দিকে চেয়ে গণেশ বললে, বোতলে কিছু আছে মশাই ?

অর্ধশূন্য এক হুইস্কির বোতল তুলে কনক বললে, এইটায় কিছু আছে দেখছি, তবে সোডার বোতল সব শূন্য।

আমি নির্জলাই খাই, বলে গণেশ কনকের পাশে গিয়ে বসল।

শিপ্রা ক্ষুব্ধস্বরে বলে উঠল, এই সকাল থেকেই শুরু হবে নাকি !

বোতলটা ধরে গণেশ বললে, গা-টা কেমন ম্যাজ্‌ম্যাজ্‌ করছে, একটু চাঙ্গা হয়ে নি : কারুর আপত্তি আছে ?

বিরিঞ্চি কট্‌মট্‌ করে বোতলটার দিকে তাকালে। কেউ কোন কথা বললে না।

গণেশ উঠে আসতে দেবপ্রিয় শিপ্রার পাশে গিয়ে বসল।

বিরিঞ্চি এতক্ষণ শিপ্রাকে দেখছিল। এই কালো রোগা মেয়ে, এই অভিনেত্রী শিপ্রা! মুখে খানিকটা রং লেপেছে, ঠোঁট দুটো করেছে রাঙা, কালো চুলের কুণ্ডলী সাপের ফণার মত উদ্যত, তবে শাড়ীটা বেশ বাহারের আর কঙ্কণের প্যাটার্ন ভাল। ওরি নাচ দেখবার,

গান শোনবার জন্য, চোখ ঘুরানো, চলার বলার ঢং দেখবার জন্য মাসের পর মাস সিনেমাতে লোকের ভিড়। বিরিঞ্চি একদিন গেছল দেখতে, দলে পড়ে। সেই অভিনেত্রী শিপ্রার সঙ্গে এ কালো মেয়ের মিল দেখতে পাচ্ছে না। তবু বিরিঞ্চির ইচ্ছে হচ্ছিল, একবার শিপ্রার পাশে বসে, ধীরে হেসে বলে, তোমার ফিল্ম আমি দেখেছি, বেশ করেছ, বেশ গলা তোমার।

দেবপ্রিয় শিপ্রার পাশে বসাতে বিরিঞ্চি সেদিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিলে।

দেবপ্রিয় শিপ্রাকে ধীরে বললে, আমাকে বোধ হয় চিনতে পাচ্ছেন না, স্টুডিওতে আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল।

এটা নিছক মিথ্যা কথা। শিপ্রা কিন্তু দমলে না, সে হেসে বললে, হাঁ, খুব মনে আছে—আপনি কবিতা লেখেন, না ?

দেবপ্রিয় চুপ করে আছে দেখে শিপ্রা বলে যেতে লাগল, গল্পও লেখেন, অর্থাৎ আপনি লেখক।

দেবপ্রিয় টাক-ভরা মাথাটা নেড়ে বললে, আপনার ঠিক মনে আছে আমি লিখি, তবে বেশির ভাগ খবরের কাগজে।

হাত-ব্যাগ থেকে লিপস্টিক্ নিয়ে ঠোঁটে রঙ দিতে দিতে শিপ্রা বললে, ঠিক, এই লেখার কথা নিয়েই আলোচনা হয়েছিল। জীবনে যে রং নেই সে রং দিতে হয় লেখায়, আপনি বলেছিলেন। রঙ্গপূর্ণ দৃষ্টিতে শিপ্রা দেবপ্রিয়ের দিকে চাইলে। তার কালো চোখের কাজল চাউনিতে ক্ষণপ্রভার দীপ্তি ক্ষণিকের জন্য ঝলসে উঠল।

দেবপ্রিয় চমকে গেল। বুঝতে পারলে, জীবনে অভিনয় এত সহজে করতে পারে বলেই এ তরুণী বড় অভিনেত্রী হতে পেরেছে। কিন্তু প করে থাকলে চলবে না। শিপ্রা সম্বন্ধে খবরটা মোগলসরাই

থেকেই টেলিগ্রাম করে পাঠাতে হবে। খবরটার জন্য কিছু পয়সা পাওয়া যাবে।

ধীরে দেবপ্রিয় বললে, আপনি ত বোম্বে যাচ্ছেন?

হেসে শিপ্রা বললে, খবরটা আপনার জন্যে দরকার, না, আপনার খবরের কাগজের জন্যে?

—আমার কাগজই খবরটা অবশ্য প্রথম ছাপবে, আমারও কিছু লাভ আছে।

—বেশ, তা হলে শুনুন। বোম্বে যাব বলেই মোটরকারে বার হয়েছিলুম বারাকপুর থেকে। বর্ধমানে এক গরুর গাড়ী বাঁচাতে গিয়ে গাছের সঙ্গে মোটরকারের লাগলো ধাক্কা। তারপর বর্ধমান স্টেশনে চলন্ত ট্রেনে ওঠা। আর এখনও সেই চলন্ত ট্রেনে চলেছি। বোম্বের টিকিটও কেনা রয়েছে সঙ্গে। এই খবর পাঠালেই হবে।

—হাঁ। অনেক ধন্যবাদ।

কাঁকন-পরা হাত তুলিয়ে শিপ্রা গণেশের দিকে দেখিয়ে বললে, ওই ভদ্রলোকের ছেলেটিকে চেনেন না মনে হচ্ছে! ওঁর নামটা এই সঙ্গে যুক্ত করে দিতে পারলে, আরও, যাকে বলে সেন্‌সেস্থানাল, নিউজ হত— কলকাতার যত চায়ের দোকানে, ছেলেদের আড্ডায় আজ সন্ধ্যায় গল্প জমে উঠত—

বিস্মিতভাবে দেবপ্রিয় বললে, ওঁকে দেখিছি যেন কোথাও, যদি অনুগ্রহ করে—

শিপ্রা হেসে বললে, ওঁর অনুমতি না পেলে কি করে বলি ওঁর নাম, উনি ত অজ্ঞাতবাস করছেন।

দেবপ্রিয় একটু করুণভাবে গণেশের দিকে চাইলে।

হুইস্কির বোতল গণেশ প্রায় শেষ করে এনেছে, একটুকু বাকি।

বোতলটা নেড়ে গণেশ বললে, দেখুন যদি আমার হেল্‌থ ড্রিঙ্ক করেন তা হলে এই অজানা পথিকের পরিচয় পাবেন।

টাকের ওপর হাত রেখে দেবপ্রিয় বললে, এখন সকাল বেলায় আমাকে মাতাল করতে চান?

শিপ্রা ভ্রূকুটি করে গণেশকে বললে, কি যা-তা বলছো, চুপ করো! ইসারায় সে সন্ন্যাসী প্রেমদাসের দিকে দেখালে।

গণেশ হো হো করে হেসে উঠল।

—আমার নাম জানবার জন্যে এত কাণ্ড। শুনুন, আপনার সামনে এই যে মূর্তি দেখছেন, ইনি হালদার বংশের কুলাঙ্গার গণেশচন্দ্র—শুনলেন, রাতে কিন্তু খেতে হবে।

—আপনি গণেশ হালদার!

—লোকসমাজে উক্ত নামেই পরিচিত।

—আপনার সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে অনেকদিন থেকেই ইচ্ছে।

—কেন বলুন ত?

—শুনেছি, আপনাদের বাড়ীতে খুব ভাল পুরানো লাইব্রেরী আছে।

—ও, আপনি এই পুরানো বই-এর সঙ্গে আলাপ করতে চেয়েছিলেন, মানুষের সঙ্গে নয়। মানুষটি বুঝলেন—

—না, না, বড় ভাল লাগছে আপনাকে! আপনার অগাধ টাকা, অনেক কাজ করতে পারেন।

—ভাল ভাল কথা বলতে আরম্ভ করলেন যে। এখন টেলিগ্রামটা লিখে ফেলুন।

রাধাকান্ত বাঙ্ক থেকে নেমে এল তাড়াতাড়ি। এই গণেশ হালদার!

দু'-তিন লাখ টাকা ত সে ইচ্ছা করলে এখনই দিতে পারে। হুইস্কির বাকি অংশের ভাগ চেয়ে আলাপ করবার জন্মে রাধাকান্ত গণেশের পাশে বসল।

হুইস্কির বোতল নিঃশেষে শেষ করে গণেশ রাধাকান্তের দিকে চাইলে। হেসে বললে, আপনাকেও কি কোথাও দেখেছি?

হাঁ, গতরাত্রে, এই গাড়ীতে, ব'লে রাধাকান্ত চুপ করে বসে রইল।

সকাল ঠিক ছ'টার সময় বিছানা থেকে ওঠা জগদীশের অভ্যাস ও নিয়ম। সেজন্য মাথার কাছে একটি ছোট এলার্ম ঘড়ি সব সময় থাকে। ঘুম ভেঙ্গে গেলেও জগদীশ চুপ করে শুয়ে থাকে, ঘড়ির এলার্ম বেজে উঠলে তবে ওঠে।

গত রাত্রে ঘড়ি মাথার কাছে রেখেছিল কিন্তু এলার্ম দিতে ভুলে গেছল। এমন ভুল তার কখনও হয় না।

ঘুম ভাঙতেই জগদীশ ঘড়ি দেখলে। ছ'টা বেজে পাঁচ মিনিট, তাড়াতাড়ি সে বাঙ্ক থেকে নেমে এল।

বিছানার ওপর অনুপমা এলিয়ে পড়ে ঘুমোচ্ছে, রঙীন গোল বালিশে কালো চুলের বন্যা, সাদা শাড়ীর আঁচল বুক থেকে খসে শুভ্র সমুদ্র-ফেনায় জমাট তরঙ্গের মত ছড়িয়ে পড়েছে, অলঙ্কার-রিক্ত নিটোল হস্তের ওপর মাথা রাখা, শাড়ীর কালোপাড়ের নীচে কনক বর্ণের পা দুখানি, ক্লান্তদেহের করুণ মাধুরী-ভরা ঘুমের এ রূপখানি প্রভাতের আলোয় জগদীশের অনির্বচনীয় মনে হল, অনুপমাকে যেন সে নতুন করে দেখলে। স্নিগ্ধ মধুর বাতাস বইছে, শিশিরসিক্ত প্রান্তর ঝিকিমিকি

করছে, নীলাকাশের পেয়ালা হতে শুভ্র নির্মল আলোর ধারা উপ্‌ছে পড়ছে—এই জাগরণপূর্ণ প্রভাতালোকের মধ্যে রূপের আলোয় ভরা শ্রান্ত নারীর নিদ্রাটুকু বড় সুন্দর। জগদীশের ইচ্ছা হল, অনুপমার মাথার কাছে বসে চেয়ে থাকে তার নিদ্রিত মুখের দিকে, চেয়ে থাকে এই আলোক-ভরা আকাশের দিকে।

কিন্তু ছ'টা বেজে দশ মিনিট হয়েছে। মোগলসরাই পৌঁছিবার পূর্বেই তাকে প্রাতঃকৃত্য সারতে হবে—দাড়ি কামাতে হবে, ব্যায়াম করতে হবে, ড্রেস করতে হবে।

অনুপমার মাথার দিকে জানলার খড়খড়ি ফেলে দিয়ে জগদীশ দাড়ি কামাতে গেল।

জগদীশ যখন ড্রেস করে এল অনুপমা জেগে উঠেছে। পিঠে বালিশ দিয়ে বন্ধ খড়খড়ির কোণে বসেছে, খড়খড়ির ফাঁক দিয়ে আলোর সমান্তরাল রেখাগুলি তার পিঠে বুকে এসে পড়েছে, বিপর্যস্ত কেশভারে শুভ্র আলোর ডোরা-কাটা। সে আলোর দীপ্তি কৃষ্ণ চক্ষের পল্লবে। রসজৃম্ভিতা কমলিনীর মত তনুলতা রহস্য-মধুর।

বিস্ময়মুগ্ধ নয়নে জগদীশ চাইলে, ধীরে একটু এগিয়ে গেল। তারপর থম্‌কে দাঁড়ালে। অনুপমার চারিদিকে অদৃশ্য জালের মত দুর্ভেদ্য বেড়া তাকে বাধা দেয়, ধাক্কা মারে, দেহের এ বেড়া পেরিয়ে সে অনুপমার অন্তর লোকে প্রবেশ করতে পারে না কেন?

'বো' বাঁধতে বাঁধতে জগদীশ বড় জোরে টান দিলে। চুপ করে বসে-থাকা অনুপমার দিকে চাইলে। অনুপমা বোধ হয় তাকে ভালবাসে না, অথবা অসুখের জন্য, তাকে দূরে রাখতে চায়। অনুপমার অন্তরের বিমুখতা অদৃশ্য হাতে জগদীশকে ঠেলা দেয়, আলিঙ্গন সম্ভব হয় না।

জগদীশ কিন্তু একথা ভাবল না যে, ভয় রয়েছে তার মনে। তার মগ্ন চৈতন্যলোকে যে গভীর আশঙ্কা রয়েছে, এ অদৃশ্য বাধা তারি ছদ্মরূপ, কেবলমাত্র ব্যাধি-সংক্রমণের আশঙ্কা নয়, অনুপমার কাছে পরিপূর্ণ আত্ম-নিবেদনের আশঙ্কা রয়েছে, আপন সত্তাকে লুপ্ত মুক্ত করার আশঙ্কা। অনুপমাকে সে ঘৃণাও করে।

আদরের সুরে জগদীশ বললে, ওগো, জেগেছ? ওঠো অনুপমা, খোলগো আঁখি—

অনুপমা চোখ মেলে নির্নিমেষ নয়নে চাইলে। প্রভাত-সূর্য যেরূপ দীপ্ত রশ্মিবাণে কুয়াশার পর্দা খান্-খান্ করে কেটে ফেলে, তেমনি তীব্র আলোক-শলাকা কৃষ্ণ তারকা হতে বিচ্ছুরিত হয়ে জগদীশের ছাই-রঙের কোটে প্যাণ্টে বিদ্ধ হ'ল, জগদীশ সমস্ত দেহে একটা জ্বালা অনুভব করলে।

অনুপমা হেসে উঠল।

—বা, এর মধ্যে যে ড্রেস করা হয়ে গেছে, দেখছি। এমন করে দাঁড়িয়ে থেকো না, বোসো।

বেঞ্চির অপর কোণে বসে জগদীশ বললে, কেমন ঘুম হল?

—তুমি ত বেশ ঘুমিয়েছিলে, একবার উঠে দেখেছিলে, ঘুমোচ্ছি কি না?

—সত্যি, খুব ঘুমিয়েছি। তুমি ভাল ঘুমোওনি? ওষুধটা খেলে না কেন?

—সারারাত যা হৈ-চৈ তা ঘুমোব কি?

—হৈ-চৈ?

—হাঁ, গো। ঝক্-ঝক্—ঘড়্-ঘড়্—ভ্যক্-ভ্যক্—কু—

ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করে অনুপমা রেল-ইঞ্জিনের শিটি দেওয়ার সুরে লম্বা শিস দিয়ে উঠল।

—তা রেলগাড়ী চলার শব্দ ত হবেই।

—শুধু চলছে! এই থামছে, এই আলো, এই অন্ধকার, যেন ভূতের দাপাদাপি কাণ্ড! ভোরের বেলায় যা হোক একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলুম।

ডাক্তারেরা ঠিকই বলেছিল, সারারাত ট্রেনে যাওয়া ঠিক হবে না, অমন নিস্তব্ধ বাগানে অতদিন থেকে। তোমার মুখটা বড় রাঙা মনে হচ্ছে।

—ফরসা মুখের ওই রকমই রঙ হয়।

—ঠাট্টা নয়, কি রকম ফ্লাস্‌ড্‌। জ্বর হয়নি ত?

—হাঁ, জ্বর ত হয়েছে; সারারাত না ঘুমিয়ে ট্রেনে বাস করে যদি জ্বর না হয় ত লোকে বলবে আমার অসুখ ধাপ্পাবাজি।

—সব সময়ে ঠাট্টা কোরো না অনু, ওষুধটা তা হলে খাও।

—সত্যি আমার একটু জ্বর হয়েছে।

থার্মোমিটার দিয়ে দেখেছ?

—ও, দেখতে হয় না। আমি নিজে বুঝতে পারি। শেষ রাত্তে একবার কাসির বেগ হয়েছিল।

—আমায় ডাকলে না কেন?

—দরকার হয়নি।

—আচ্ছা, টেমপারেচারটা দেখ।

—আমি এখন দেখব না। চুপ করে বস দেখি।

—তা হলে,—মোগলসরাইতে নেমে পড়া যাক্।

—মোগলসরাইতে কি হবে?

—অথবা নৈনী দিয়ে এলাহাবাদ চলো, সেখানে দুদিন বিশ্রাম করে যাওয়া যাবে।

—আচ্ছা, জ্বর কি আমার নতুন হচ্ছে, আমি সটান বোম্বে যাব। পথে কোথাও নামছি না। এক গেলাস জল দাও দেখি। আর এ খড়খড়ি তুলে দাও।

চোখে মুখে জল দিয়ে একটু জল খেয়ে অনুপমা বললে, দাও একটা রুমাল, মুখটা মুছি, আর অমন ঘুরঘুর কোরো না, আমার পাশে চুপ করে বোসো দেখি।

জগদীশ বসল অনুপমার পাশে। অনুপমা তার হাত টেনে নিলে নিজের হাতে।

—তোমার হাত বড্ড ঠাণ্ডা কেন?

—তোমার হাত বড় গরম হয়েছে, তাই অমন মনে হচ্ছে।

—অনেকদিন পরে আবার জ্বর হল, বোম্বে গেলেই সমুদ্রের হাওয়াতে ছেড়ে যাবে।

—আজ চুপচাপ শুয়ে থাক। কি খাবে?

—কথা না বললে আমি হাঁপিয়ে উঠব, চুপচাপ শুতে পারব না, এতদিন পরে তবু একটু মানুষের মুখ দেখছি। সারাক্ষণ ট্রেনের ঝং ঘং যত বিতিকিচ্ছিরি শব্দ—তার মধ্যে চুপ করে থাকা।

—জ্বর আরও বাড়বে।

—বাড়ুক। ওগো মাথায় একটা বালিশ দাও না।

অনাবৃত সুগোল বাহুলতায় অনুপমা জগদীশের হাত জড়িয়ে ধরলে। এ ভুজবন্ধনে যেন সে তাহার দেহের তাপ অন্তরের চঞ্চলতা জগদীশের শীতল দেহমনে সঞ্চারিত করতে চায়।

অনুপমা মৃদু হেসে উঠল। তার হাসির দিকে চাইলে জগদীশের রক্তে দোলা লাগে। মনে হয়, অদৃশ্য আড়াল সরে গেছে।

মৃদুকণ্ঠে অনুপমা বললে, ওগো শোন, চলো, আমরা ইয়োরোপ যাই।

—ইয়োরোপ!

জগদীশ একটু ঘাড় বেঁকালে, অনুপমার মুক্ত কেশ পড়েছে তার পিঠের ওপর। অনিন্দিত বাহু দিয়ে মোহিনী বুঝি বাঁধছে! শিথিল কোমল তনুর স্পর্শ ঘন অরণ্য-বেষ্টিত সরসীর শ্যামল শষ্পতটের মত স্নিগ্ধ, স্বপ্নাবেশ আনে।

—হ্যাঁ, ইয়োরোপ! চমকে ওঠ কেন? সুইজারল্যাণ্ডে গিয়ে থাকবো। সেখানে ভাল ভাল স্যানাটোরিয়াম আছে শুনেছি; আমি স্যানাটোরিয়ামে থাকব, তুমি নানা জায়গা ঘুরতে পার।

—এ সব কথা তোমায় কে বললে?

—কে আবার বলবে, আমি নিজেই ভেবে ঠিক করেছি।

— আচ্ছা, আগে বোম্বেতে যাই চল। এখন অত ভেবো না, তোমার জ্বর হয়েছে।

—সুইজারল্যাণ্ডে কিছুদিন গিয়ে থাকলে আমার অসুখ সেরে যেতে পারে; ওদেশে অনেকের একেবারে সেরে যায় শুনেছি।

—এ সব কথা কে বললে তোমায়? আমাদের বোস ডাক্তার?

—দেখ, তোমার চেয়ে কিছু কম বই পড়িনি জেনো। বললেই পারো, যাবো না।

—না, যাব না আমি ত বলছি না। সব খোঁজ নিতে হবে, ডাক্তারদের সঙ্গে পরামর্শ করতে হবে। সত্যি তোমার অসুখ সারবে কি না—আর ছুটি চাইলেই ত আমি ছুটি পাব না—জান ত, তুমি বোঝ না। বোম্বে গিয়ে ঠিক করা যাবে—না, এখন ইয়োরোপে যাওয়া

অসম্ভব। জান না, ইয়োরোপে কি গোলমাল চলছে, যে কোন সময় যুদ্ধ বাধতে পারে, এ সব ভেতরের খবর, তোমায় সব বলতে পারি না।

ভুজবন্ধন ধীরে শিথিল হয়ে মুক্ত হয়ে গেল। অনুপমা কোন কথা বললে না, ধীরে চোখ বুজলে। মাথাটা দপ্‌দপ্‌ করছে।

জগদীশ ধীরে দাঁড়িয়ে বললে, তোমার মুখে যে রোদ এসে পড়ছে, খড়খড়ি ফেলে দি?

দাও, বলে অনুপমা একবার চোখ চাইলে। একটু হতাশের স্বরে বললে, ভেবো না ইয়োরোপ যাবার জন্যে তোমায় আমি সাধ্‌ছিলুম, আমার মনে হল, এমনি বলছিলুম।

অনুপমা আবার চোখ বুজে এলিয়ে শুয়ে পড়ল।

অনুপমা ভাবতে লাগল, সে যা শুনতে চেয়েছিল, সে কথা শুনতে পেল না। ইয়োরোপে যাবার তার সত্যি এমন কিছু ইচ্ছা নেই। তবু জগদীশ ত বলতে পারত, হঁ্যা, তোমায় নিয়ে যাব ইয়োরোপে, সুইজারল্যাণ্ডে সবচেয়ে ভাল স্যানাটোরিয়মে তোমায় রেখে দেব। তার একটা ইচ্ছা, একটা খুশি হয়েছে, শুনে বলতে ত পারত, পূর্ণ করব তোমার খুশি। যদি যুদ্ধ বাধে, যদি ডাক্তারেরা অনুমতি না দেয়, যদি ছুটি না পাওয়া যায়, তা হলে ত পরে যাওয়া হত না, কিন্তু এখন ত জগদীশ তার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করতে বলতে পারত, হঁ্যা, চলো, আমরা যাব ইয়োরোপে, তুমি সেরে যাবে, তারপর নানা দেশ ঘুরব, ছুটি আমি যে করে পারি যোগাড় করব; ইণ্ডিয়া আফিস গিয়ে দেখা করলে, তোমার ব্যাধির কথা বললে, নিশ্চয় দেবে। এ সব কথা ত জগদীশ বললে না, কেন বললে না? বললে ত কোন ক্ষতি হত না, কিন্তু কতবড় লাভ হত, অনুপমা বুঝত যে, জগদীশ সত্যি তাকে ভালবাসে। না, জগদীশকে পরীক্ষা করতে সে বলেনি। মনের খুশিতে

সে বলেছিল, একথা। শুধু শুনতে সাধ ছিল, জগদীশ বলছে, তোমার ইচ্ছা হচ্ছে, নিশ্চয় যাবো আমরা। সে সাধ পূর্ণ হল না।

রঙীন কুশানে অনুপমা মুখ গুঁজলে। ট্রেন বড় দুলছে। স্থির লৌহবর্ত্মে অবিশ্রান্ত ঘূর্ণ্যমান লৌহচক্রের ঘর্ষণধ্বনি কঠিন কর্কশ।

অন্য কোণে জগদীশ চুপ করে বসে টাইম-টেবিলের পাতা ওলটাতে ওলটাতে ভাবতে লাগল, নিশ্চয় ওই কল্যাণ ছোকরাটা এ সব মতলব দিয়েছে।

৭

মোগলসরাই স্টেশনে ট্রেন থামতেই দেবপ্রিয় স্টেশনের টেলিগ্রাফ-আফিসে টেলিগ্রাফ করতে ছুটল। শিপ্রা-সংবাদ কলিকাতায় সন্ধ্যার কাগজেই প্রকাশিত হয়ে যাওয়া চাই।

টেলিগ্রাফ-অফিসে ভয়ানক ভিড়। সাহেবী পোশাকপরা এক কৃষ্ণবর্ণ বাঙ্গালীকে সাহায্য করবার জন্য আফিসের কেরানীটি ভয়ানক ব্যস্ত। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর, দেবপ্রিয় টেলিগ্রাম লেখবার ফর্ম পেলে। ছোট করে গুছিয়ে লিখতেই অনেকক্ষণ কাটল। লিখতে লিখতে মাঝে মাঝে সে মাথা তুলে দেখলে, সেই কৃষ্ণবর্ণ বাঙ্গালীটি তার দিকে কট্‌মট্‌ করে চাইছে।

লেখা তখনও শেষ হয়নি, ছাই রঙের স্যুট-পরা লোকটি এগিয়ে এল। যেন একটু তিক্তস্বরে বললে, আপনি কি দেবপ্রিয়—?

দেবপ্রিয় স্থির দৃষ্টিতে চাইলে। জগদীশের মতন মুখ মনে হচ্ছে! কলেজে জগদীশ এই রকম রঙের স্যুট পরে আসত, তার ভাঁজগুলি এমনি নিখুঁত থাকত। হাঁ, জগদীশই হবে। ওই রকম কালো থ্যাবড়া মুখ, মোটা নাকের পাশে ছোট চোখ, বিরল। ওই কদাকার-দর্শন সহপাঠীর সঙ্গে কলেজে দেবপ্রিয়ের বিশেষ ভাব ছিল। কলেজে দেবপ্রিয় ছিল খ্যাতনামা ছাত্র, বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বর্ণপদক-মার্কা। জগদীশ কোন পরীক্ষায় তার সমকক্ষ হতে পারে নি। সেজন্য জগদীশের ঈর্ষা ও ক্ষোভ বড় কম ছিল না। সেই জগদীশ আজ মোটা মাহিনার গভর্ণমেণ্ট অফিসার। বিলেতে যাবার টাকা ছিল বলেই আজ জগদীশ এমন চাকরি পেয়েছে। কেম্ব্রিজে গিয়ে পড়বার

মত পিতৃসঞ্চিত অর্থ যদি দেবপ্রিয়ের থাকত, আজ সে আই. সি. এস্. না হলেও একটা বড় অধ্যাপকও ত হতে পারত।

চশমার কালো কাচ দিয়ে জগদীশের দিকে চেয়ে দেবপ্রিয় ভাবলে, সে বলে, না সাহেব, আপনি ভুল করছেন, আমি আপনার জানা সে দেবপ্রিয় নই। এ জগদীশকে না চিনলেও ক্ষতি নেই। তবু দেবপ্রিয় জগদীশের দিকে চেয়ে রইল, জানতে ইচ্ছে করল, সহপাঠী জগদীশের কতখানি পরিবর্তন হয়েছে। মৃদু হেসে সে বললে, হাঁ জগদীশ-সাহেব, চিনতে ভুল করনি।

জগদীশের সুটপরা ও সাহেবীয়ানার জন্য সকলে তাকে পরিহাস করে, জগদীশ-সাহেব বলে ডাকত।

—তাইত বলি, দেবুর মতন মনে হচ্ছে, তবে অত বড় টাক দেখে একটু দ্বিধা হচ্ছিল।

দেবপ্রিয়ের হাত ধরে জগদীশ জোরে ঝাঁকুনি দিলে।

—অত জোরে টিপো না। জোরে হ্যাণ্ডসেক করার অভ্যাস যায়নি দেখছি।

—কতদিন পর দেখা বল ত, দেখে বড় আনন্দ হচ্ছে তোমাকে, এই ট্রেনেই যাচ্ছ? এত কি টেলিগ্রাম লিখছ?

লেখা কাগজগুলি দেবপ্রিয় শার্টের পকেটে পুরে ফেললে। সে বললে, একটা খবর পাঠাব ভাবছিলুম, পরে অন্য কোন স্টেশন থেকে পাঠাব, এখানে যা ভিড় দেখছি।

—দরকারী হয় এখান থেকেই পাঠাও, আমি বলে দিচ্ছি ক্লার্ককে।

—না, না, দরকার নেই; তোমার টেলিগ্রাম করা হয়ে গেছে?

জগদীশ সন্দিগ্ধভাবে দেবপ্রিয়ের দিকে চাইলে। তার সম্বন্ধে কোন খবর পাঠাচ্ছিল নাকি?

—কাকে খবর পাঠাচ্ছিলে ?

দেবপ্রিয় ব্যঙ্গের সুরে বললে, আমার খবরের কাগজের আফিসে পাঠাচ্ছিলুম, তোমার সম্বন্ধে নয়, ভয় নেই, একটি অভিনেত্রীর উদ্দেশ্যে লিখছিলুম।

এ ব্যঙ্গময় কণ্ঠস্বর জগদীশের চেনা। সে একটু চমকে উঠল, তারপর হো হো করে হেসে বললে, আজকাল অভিনেত্রীতে ইণ্টারেস্টেড্ নাকি ? সে ভাগ্যবতী কে ? টেলিগ্রাম যদি না করো ত চলো, একটু চা খাওয়া যাক, রেস্তোরাঁ-কারে।

ট্রেনের দিকে দু'জনে এগিয়ে চলল।

দেবপ্রিয়ের পিঠ মৃদু আঘাতে চাপ্ড়ে জগদীশ বললে, তুমি ত আজকাল খ্যাতনামা লেখক। ক'খানা বই হ'ল ?

—এসব খবরও তোমায় রাখতে হয় নাকি ?

—আমার স্ত্রীর হাতে তোমার কি একখানা বই দেখছিলুম একদিন. 'সমীরণ' বলে—

—'সমীরণ', ও নামে কোন বই লিখেছি বলে ত মনে হচ্ছে না, 'সমীক্ষণ' নয় নিশ্চয় !

—তা হতে পারে। আমার স্ত্রী তোমার লেখা খুব পছন্দ করেন। সেদিন আমায় পড়ে শোনাচ্ছিলেন। চলো, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দি।

—এই যে বললে, রেস্তোরাঁ-কারে যাবে চা খেতে।

—ও ইয়েস, চলো, আগে চা খেয়ে নেওয়া যাক।

রেস্তোরাঁ-গাড়ীর সম্মুখে এসে দেবপ্রিয় বললে, আমি ত এখন যেতে পারব না, তুমি চা খাও গে।

—সে কি ! আবার টেলিগ্রাম করতে হবে নাকি ?

—না। মাকে নিয়ে বোম্বে যাচ্ছি, তাঁকে একবার দেখে আসা দরকার।

—আর অভিনেত্রীটিও কি সঙ্গে যাচ্ছেন ?

—সঙ্গে না হলেও এক ট্রেনে।

—শোন, আমি প্রথমশ্রেণীর কুপেতে আছি, ছিওকিতে নিশ্চয় এসো। আমার স্ত্রী তোমার সঙ্গে আলাপ করে বিশেষ খুশি হবেন।

মায়ের গাড়ীর দিকে যেতে যেতে দেবপ্রিয় পথে থমকে দাঁড়াল। প্রথমশ্রেণীর এক গাড়ীর সম্মুখে পাগড়িওয়ালা পাহারা। গাড়ীর মধ্যে এক সুন্দরী যুবতী ও চঞ্চলা তরুণী ; সামনে টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম,—পেয়ালার টুং টাং শব্দ, তরুণীর উচ্ছ্বসিত হাস্যের মধ্যে সুন্দরীর স্থিরমূর্তি, স্বর্ণালঙ্কার-শোভিত হস্তের কম্পিত ভঙ্গী, শুভ্র আননে ক্ষণিকের রক্তিমা বড় সুন্দর।

মায়ের সঙ্গে দেখা করে দেবপ্রিয় আবার প্রথমশ্রেণীর কুপের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। জগদীশ শুধু ভাল চাকরি নয়, পরমাসুন্দরী স্ত্রী লাভ করেছে। আর কলেজে প্রোফেসারগণ বলতেন, দেবপ্রিয়ের ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল। তখন কে জানত, কোন্ অফিসে কেরানীগিরি করে জীবন কাটাতে হবে।

পকেট থেকে টেলিগ্রামের লেখা কাগজগুলি বার করে সে ছিঁড়ে ফেললে। সামান্য অর্থলাভের জন্য, এত ঘটা করে টেলিগ্রাম করতে তার ঘৃণা বোধ হল। বস্তুত, জগদীশকে দেখে তার অন্তর ক্ষোভিত হয়ে উঠেছে, ব্যর্থ হল তার জীবন। ভাগ্য তাকে বার

বার বিদ্রূপ করেছে। প্রভাতের আলো যেন কালিমাভরা। কালো পর্দার ওপর সোনালী তারার মতই জ্বলছে, ওই অপরূপা নারী।

—দেবপ্রিয় বাবু! অ—দেব—প্রিয়—বা—বু!

সৌন্দর্যস্বপ্ন হতে চমকে দেবপ্রিয় চাইলে। কুপের পাশের প্রথম শ্রেণীর গাড়ী হতে শিপ্রা তাকে চেঁচিয়ে ডাকছে। সে কম্পার্টমেণ্টের দিকে দেবপ্রিয় এগিয়ে গেল।

শিপ্রা বললে, বাবা, এত চেঁচাচ্ছি আপনি শুনতেই পান না। কি হাঁ করে দেখছিলেন?

—যা গোলমাল স্টেশনে।

—টেলিগ্রাম করলেন?

—টেলিগ্রাম করিনি।

—করেন নি? কেন? আমাদের ওপর চটে গেলেন নাকি? এই দেখ, গণেশবাবু, তুমি কি সব বলেছিলে ওঁকে—দেখছ পণ্ডিত মানুষ উনি।

—না, না, সে জন্য নয়। আমি সত্যি চটিনি। কেমন ইচ্ছে করল না করতে।

—তা বেশ করেছেন। বোম্বেতে সারপ্রাইজ ভাল করে হবে। আসুন আমাদের গাড়ীতে। আপনাকে আমাদের ভাল লেগেছে। বেশ লোক আপনি।

দেবপ্রিয় অজানিতভাবে টাকের উপর হাত বুলিয়ে নিলে। এটাও কি অদৃষ্টের আর একটা পরিহাস। হোক পরিহাস, এ রঙ্গে সে যোগ দিতে চায়।

দরজা খুলে গণেশ বললে, উঠে আসুন দেবপ্রিয় বাবু, কি ওই সন্ন্যাসীদের দলে পড়ে থাকবেন? চা খেয়েছেন?

দরজার ফাঁক দিয়ে দেখা গেল, বেঞ্চির উপর চায়ের ট্রের পাশে চারটি বোতল সাজান।

—আপনার মুখ দেখে বুঝতে পাচ্ছি, চা আপনি খান নি।

—আচ্ছা, একটু চা খেতে পারি, কিন্তু এখ্‌নি গাড়ী ছেড়ে দেবে।

—তাতে কি!

—এটা যে ফার্স্ট ক্লাশ।

—মশাই, চারখানি টিকিট কিনে কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ করা হয়েছে, কি ভয় পাচ্ছেন আপনি!

—কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ করবার দরকার কি ছিল?

—কেন করব না? পয়সা কিসের জন্যে মশাই? কমফর্ট চাই, বুঝলেন। উঠে আসুন, বেশ গল্প করতে করতে যাওয়া যাবে—আর এসব একা খাওয়া যায় না, বুঝতে পারেন ত।

দেবপ্রিয়ের টাকের উপর গণেশ হাত বুলিয়ে দিলে।

শিপ্রা হেসে বললে, তুমি আবার ওঁকে ভয় দেখাচ্ছ কেন? না, না, দেবপ্রিয় বাবু, ওসব আপনাকে খেতে হবে না। আপনি ফ্রেঞ্চ জানেন?

—ফ্রেঞ্চ? কিছু জানি, কেন?

—আমি দেখেই বুঝেছিলুম, আপনি জানেন। উঠে আসুন, এবার ট্রেন ছেড়ে দেবে। ফ্রেঞ্চ-জানা একজন পণ্ডিত অভিনেতা আমাদের দরকার।

দেবপ্রিয় ভাবলে, সে বলে, নিরিবিলি থাকবার জন্যে আপনারা কম্পার্টমেণ্ট রিজার্ভ করেছেন,—

নটী শিপ্রার দিকে চেয়ে সে কোন কথা বলতে পারলে না। চঞ্চলপদে গাড়ীতে উঠে সে শিপ্রার পাশে বসল। গণেশের দিকে চেয়ে বললে, এখনও একটা বোতলও খোলেন নি?

শিপ্রা কটাক্ষপাত করে বললে, তবে যে ও গাড়ীতে বড় ভালমানুষ সাজছিলেন!

গণেশ হেসে বললে, আহা, যেখানে যে-রকম সাজতে হয়, বোঝ না—কত জায়গায় কত রকম রূপ ধরতে হয়,—কবি বলেছেন না—the world is a stage—কি বলেন—আমি দেখেই বুঝেছি আমাদের দেবপ্রিয়বাবু লোক ভাল—কি বলেন—তা হলে একটা বোতল—

শিপ্রা বাধা দিয়ে বললে, তুমি আগে চা খাও দেখি—বোতল ত পালাচ্ছে না।

—শিপ্রা দেবী যখন বলছ, তাই হোক। কি বলেন! দেবপ্রিয়বাবু, আমি চুপচাপ লোক ভালবাসি না, মশাই। পাঁচ মিনিট কথা না কইতে পারলে আমি হাঁপিয়ে উঠি।

—তুমি বুঝতে পার না, দেবপ্রিয়বাবু একটা পণ্ডিত লোক, দার্শনিক মানুষ, কত বিষয় ভাবেন।

দেবপ্রিয়ের হাতে চায়ের পেয়ালা দিয়ে শিপ্রা হেসে উঠল। ইঞ্জিনের টানে দোলার জন্য অথবা দেবপ্রিয়ের হস্তকম্পনের জন্য খানিকটা চা উছলে গড়িয়ে পড়ল।

মোগলসরাই স্টেশন ছাড়িয়ে ট্রেন ছুটে চলল।

সোনালী চায়ের দিকে চেয়ে দেবপ্রিয় ভাবল, নর্তকী শিপ্রার হাতের তৈরি চা সে কোন দিন খাবে, কে ভেবেছিল!

মালতী বললে, অনুপমাদি, আর এক কাপ চা?

অনুপমা হেসে বললে, তোর যে প্রথম কাপ এখনও শেষ হল না, অত ভেবে কি হবে। থার্মোমিটারটা আমায় দে ত।

—তোমার কি জ্বর এল নাকি?

—জ্বর এসেছিল, এখন বোধ হয় ছেড়ে গেছে, সে-টা দেখছি।

—এদিকে গাড়ী যে ছেড়ে দিল।

—কি অমূল্য জিনিস রয়েছে তোমার গাড়ীতে! শোন্, পরের স্টেশনে তোর জিনিসগুলো এ গাড়ীতে আনিয়ে নিচ্ছি, তুই আমাদের সঙ্গে চল্।

—বা, তোমাদের গাড়ীতে যাব কি করে, তোমরা আলাদা যাবে বলে কুপে রিজার্ভ করেছ।

—আচ্ছা দিনের বেলা চল্ ত। আমি টিকিট বদলে দিচ্ছি।

—না, সে হয় না।

—আমি জানি, তুই কি ভাবছিস্। তুই ভাবছিস, তুই যদি ও গাড়ীতে থাকিস্ ত সমরও ও গাড়ীতে লুকিয়ে থাকতে পারে। আচ্ছা আমরা যদি ওকে এ গাড়ীতে লুকিয়ে রাখি।

—সে অসম্ভব। সমরও রাজী হবে না। তা ছাড়া, ও কোথায় গেল কিছু বুঝতে পারছি না। মোগলসরাইতে বোধ হয় অন্য ট্রেনে চলে গেল।

—সে ভয় করিস্ না। ও ঠিক এ ট্রেনেই যাচ্ছে। আচ্ছা, তোদের কদ্দিনের ভাব?

—তুমি কিছু বুঝছ না। আমাদের মধ্যে বিশেষ কিছুই আলাপ ছিল না!

—কিন্তু ট্রেনে এক রাতেই—লুকোলে কি হবে, তোর মুখ দেখে বুঝতে পারছি না?

—আমি মানছি, সমরের জন্য বিশেষ চিন্তিত, উদ্বিগ্ন বলতে পার, অমন ছেলে, সত্যি যদি ধরা পড়ে—তা ছাড়া, ওর সঙ্গে পরামর্শ করছিলুম, যদি একসঙ্গে ইয়োরোপ যাওয়া যায়—অতদূর একা যেতে সাহস হচ্ছে না।

—বেশ, বুঝেচি।

—সমরের মাকে একখানা চিঠি লিখতে হবে।

—আচ্ছা, সমর যদি ওপথ ছেড়ে দেয়, আমি ওঁকে বলতে পারি, উনি কোন ভাল চাকরি করে দিতে পারেন।

—সমর মোটেই তা রাজী হবে না, তুমি এসব ছেলেদের জান না! কি তুমি যা-তা বলছ।

—আচ্ছা, মালতি, সমরকে একবার জিজ্ঞেস্ কর্, গভর্নমেণ্ট তাকে ভাল চাকরি দিতে রাজী আছে।

—ও সব কথা আমি বলতে পারব না।

—তা হলে আমাকেই বলতে হবে।

—কেন?

—তা ছাড়া, ওকে বাঁচাবার কোন উপায় নেই। সত্যি বলছি, সমরকে আমার ব; ভাল লেগেছে। ওর জীবনটা অমন করে নষ্ট হতে দেব না।

—নষ্ট কাকে বল? হাজার হোক, গভর্নমেণ্ট অফিসারের স্ত্রী ত, তুমি আর অন্য রকম কি করে ভাববে?

অনুপমার কালো চোখের তারা জলে উঠল। করুণ সুরে সে বললে, দেখ্ মালতি, আমি কি ভাবি, না ভাবি, তা বোঝবার বয়স তোর এখনও হয়নি, ভগবান করুন, যেন আমার মত দুঃখ না পাস্।

মালতী অনুপমার তপ্তহস্ত জড়িয়ে বললে, ক্ষমা করো, অনুপমাদি।

আমি কিছু ভেবে বলিনি। মনটা স্থির নেই, তুমি জান। কিন্তু সমর সম্বন্ধে ওরকম কথা তুমি কি ভাবতে পার ?

—আচ্ছা, আমার অনুরোধ, তুই একবার সমরকে জিজ্ঞেস কর্। তার উত্তরটা শুনতে চাই।

—এখন তার দেখা পেলে ত।

রৌদ্রালোকিত প্রান্তরের দিকে দু'জনে স্তব্ধ হয়ে চেয়ে রইল।

আকাশ কি স্নিগ্ধনীল! আলোক কি অপূর্ব উজ্জ্বল! কল্যাণের হৃদয় কোন্ আনন্দ-রসে কানায় কানায় ভরা। প্রভাতালোকপূর্ণ সবুজ পৃথিবীর দিকে চেয়ে সে বসেছিল।

ঘুম তার অনেকক্ষণ ভেঙে গেছে। তবু যেন সে ঘুমঘোর কাটাতে চাইছে না, কোন্ ক্ষণিকের সুখস্বপ্নকে দীর্ঘ করে তুলতে চায়। সঙ্গীত থেমে গেলে সুরের রেশগুলি যেমন নীরবে কানে বাজে, তেমনি দেহমনের তন্ত্রীতে কোন স্পর্শের ঝঙ্কার সে থামতে দিতে চায় না, তারি সুর রজতবর্ণ আলোকধারায় আকাশের নীলপেয়ালা হতে উপছে পড়ে, ধরণীর শ্যামলিমায় উচ্ছ্বসিত।

অনুপমা তাকে ভালবাসে কি-না, সে কি অনুপমাকে ভালবাসে, এ সব কথা সে ভাবতে চায় না। আকাশ-পৃথিবী-জোড়া আলোকের আনন্দ-সঙ্গীতের মধ্যে কোথাও যেন তালভঙ্গ না হয়।

রাত্রিশেষের স্নিগ্ধ আলো-অন্ধকারে দ্রুতগামী গাড়ীর মধ্যে ব্যথিতা পীড়িতা অনুপমা তার পিঠে ঠেসান দিয়ে যখন ঘুমিয়ে পড়েছিল, তখন কল্যাণ যে গভীর শান্তি, যে নিবিড় আনন্দ অনুভব করেছিল,

এরূপ অপূর্ব উপলব্ধি তার কখনও হয়নি। সে শান্তির স্বরকে সে ছিন্ন করতে চায় না। এ ভালবাসা নয়, অতৃপ্ত তৃষ্ণার ক্ষণিক নিবৃত্তি নয়, এ অনুভূতি বাক্যাতীত।

মির্জাপুর স্টেশনে ট্রেন থামতে কল্যাণ গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। অনুপমার স্নিগ্ধ সুন্দর মুখ সে দেখতে চায়, জগদীশের সঙ্গে আলাপ করতে চায়। জগদীশকে হয়ত বলতে চায়, অনুপমা যে অসুখী একথা কি সে জানে, অনুভব করে?

কূপের সামনে এসে কল্যাণ স্থির হয়ে দাঁড়াল। জোরে আসতে সে হাঁপাচ্ছে। জগদীশ নেই, মালতী মল্লিক অনুপমার পাশে বসে। অনুপমার মুখ দেখা যাচ্ছে না, কালো চুলের কুণ্ডলী রেশমের জালে বাঁধা; রূপালী রঙের ব্লাউজ-ঘেরা পিঠ নিস্তরঙ্গ হ্রদের মত।

অনুপমা তখন মালতীকে বলছে, তোর জন্য একটা প্ল্যান করেছিলুম।

—কি অনুপমাদি?

—কল্যাণের সঙ্গে তোর আলাপ করিয়ে দিতে চাই। কল্যাণকে তোর ভাল লাগবে! ইয়োরোপে বেশিদিন থেকে বোধ হয় একটু যাকে বলে বস্তুতান্ত্রিক হয়েছে, সে আইডিয়ালিজম্ আর নেই। কিন্তু সমরের দিকে যা টান দেখছি।

—বার বার এক কথা বোলো না। একটু চুপ কর দেখি, ওই দেখ, বোধ হয় তোমার কল্যাণ—

—হাঁ, ওই ত কল্যাণ! হীরা সিং সাহেবকো সেলাম দেও।

যন্ত্রচালিতের মত কল্যাণ কূপের চেয়ারে এসে বসল। তার বুক ধক্ ধক্ করছে। অনুপমার দিকে সে স্থিরনয়নে তাকাল। গত রাত্রের চঞ্চলা মোহিনী অনুপমা, শান্ত নিদ্রাতুরা অনুপমার সঙ্গে এ

জাগরণফুল্ল অনুপমার যেন কোথাও মিল নেই; সে স্বপ্নের অনুপমা প্রভাতের শুকতারার মত মিলিয়ে গেছে। কল্যাণ বিস্মিত ব্যথিত হল। তার বুকে কে যেন ঘা দিলে। এ রহস্যময়ীর কৃষ্ণনয়নে কোন্ সুদূরের দৃষ্টি।

রহস্যময় হেসে অনুপমা বললে, তোমারি নাম হচ্ছিল কল্যাণ!

—শুনে বিশেষ গর্ব অনুভব করছি।

কল্যাণ মালতীর দিকে চাইলে।

সহসা রক্তোচ্ছ্বাসে সে মুখ রক্তিম।

—মালতীকে বলছিলুম, বেশি দিন ইয়োরোপে থাকলে লোকে বস্তুতান্ত্রিক হয়ে যায়।

—অর্থাৎ Materialist আর ভারতবর্ষে সব আধ্যাত্মিক! এটা তোমার মস্ত ভুল ধারণা। কোন বড় সভ্যতা বস্তুতান্ত্রিক হয়ে বাঁচতে পারে না।

—বেঁচে আছে, কে বললে? তার মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে আসছে।

—তার প্রাণ আছে, এ কথা অস্বীকার করতে পার না। অনেকগুলি বড় আইডিয়ার ওপর, সত্যের ওপর সে সভ্যতা প্রতিষ্ঠিত। সে আইডিয়ার জন্য সে দেশের নরনারী প্রাণ দিতে পারে। তবে যে স্বপ্নবিলাসকে তোমরা আইডিয়ালিজম্ বল, তা সে দেশে নেই।

মালতী এবার কথা কইলে, স্বপ্ন আপনি কাকে বলেন?

—যা নিছক মনগড়া কল্পনা, বাস্তবের কোন ভিত্তি নেই, তাই স্বপ্ন।

প্রভাতালোকের শান্তির সুরভরা সঙ্গীত শেষ হয়ে গেছে। কল্যাণ যেন সবাইকে আঘাত করবার জন্য উদ্যত।

মালতী ক্ষুণ্নস্বরে বললে, মন দিয়েই কি আমরা পৃথিবী গড়ছি না, তার রস তার সৌন্দর্য সবই ত অন্তরের অনুভূতি।

অনুপমা হেসে বললে, দার্শনিক তত্ত্বালোচনা থামা দেখি, দেখ্ ত, কেটলিতে চা আছে কি না ?

মালতী বললে, কিছু আছে, তবে ঠাণ্ডা।

কল্যাণ মৃদু হেসে বললে, ঠাণ্ডাই দিন, হৃদয়ের তাপে গরম করে নেওয়া যাবে।

মালতী চুপ করে কাপে চা ঢালতে লাগল।

মির্জাপুর স্টেশন পার হয়ে ট্রেন ছুটে চলল।

সন্ন্যাসী প্রেমদাসের নিকট বিরিঞ্চি এগিয়ে এল। অন্য যাত্রীরা অন্য সব গাড়ীতে চলে গেছে, শুধু রাধাকান্ত চা খেয়ে নোটবুক খুলে হিসাব করছে। প্রেমদাসের সঙ্গে নিভৃতে কথা কইবার এমন সুযোগ আর পাওয়া যাবে না।

বিরিঞ্চি ধীরে বললে, ঠাকুর, একটা নিবেদন আছে।

নির্নিমেষ নয়নে প্রেমদাস বিরিঞ্চির দিকে চাইলেন। সে দৃষ্টিতে স্নিগ্ধতা নেই, কারুণ্য নেই, তীক্ষ্ণ মর্ম্মভেদী জ্বালাভরা সে দৃষ্টি।

বিরিঞ্চির কেমন ভয় হল। সে আর কোন কথা বলতে পারলে না। তার অসুখের কথা বলে ঔষধ প্রার্থনা করতে পারলে না।

প্রেমদাস উঠে দাঁড়িয়ে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, যেমন তিনি বিরিঞ্চিকে ট্রেনে প্রথম দেখে জড়িয়ে ধরেছিলেন।

কোন্ অজানা ভয়ে বিরিঞ্চির বুক কেঁপে উঠল।

ধীরে সে বললে, ঠাকুর আমার অসুখের কথা আপনায় একবার বলেছিলুম, বার বার বলতে লজ্জা করে—

—কোন ভয় নেই, তোমার অসুখ শীগ্‌গীর সেরে যাবে।

—ঠাকুরের আশীর্বাদে—তবে অনেকদিন পর কাল রাতে হঠাৎ ব্যথা বোধ হয়েছিল।

—কোন বেদনা থাকবে না, বিরিঞ্চি। নির্ভয়ে এগিয়ে চল। যাত্রী তুমি।

—ঠাকুর, আপনার সহযাত্রী হতে চাই।

—কাহারো পথ দীর্ঘ, কাহারো বক্র সঙ্কীর্ণ, সহযাত্রী হতে চাইলে যে সঙ্গীর পথের দুঃখের ভাগ নিতে হবে—একাই যেতে হবে, বিরিঞ্চি। কোন ভয় তোমার নেই। দেখি, রাধাকান্তবাবু আমাকে কি যেন বলতে চান।

রাধাকান্ত হিসাবের বই হতে মুখ তুলে চমকে চাইল।

—আমার নাম রাধাকান্ত কি করে জানলেন?

—ঠাকুর ইচ্ছা করলে সবই জানতে পারেন।

—জানতে পারেন? হ্যাঁ?

—আপনি কলিকাতার এক প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসাদার, আপনার নাম জানা কি আশ্চর্যি।

—ধনী? হুঁ! ইন্‌সলভেন্সি নিতে হবে!

—ঠাকুরের কৃপা হলে—

—কৃপা! দিন্ না যোগাড় করে কিছু টাকা—বেশি নয়, তিন লাখ—আমি ঠাকুরের শিষ্য হতে রাজী আছি, দেখি সন্ন্যাসীর শক্তি।

—সন্ন্যাসীর কাজ কি টাকা যোগাড় করে দেওয়া—আপনি বিচক্ষণ ব্যবসায়ী হয়ে এ কথা বললেন?

—তবে অলৌকিক শক্তি কি ?

—আচ্ছা, টাকা আমি দিতে পারি, আপনি নিয়ে কি করবেন ?

বিরিঞ্চি প্রেমদাসের দিকে সন্দিগ্ধনয়নে চাইলে। সন্ন্যাসী হয়ত কোথাও গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছেন, অথবা কোন ধনী শিষ্যের বিষয়-লাভ করেছেন। তারও যে টাকার বড় দরকার।

রাধাকান্ত দাঁড়িয়ে উঠে বললে, আমি নিজের জন্যে চাইছি না, আমি চাইছি আমার কলকারখানার জন্যে, আমার মিল বাঁচাতে হবে। তার ওপর লাগিয়েছে ধর্মঘট, যত বদমাইস শা—

ক্রোধে সে কাঁপতে লাগল।

—রাধাকান্তবাবু, শান্ত হোন। যদি আপনি আজ তিন লাখ টাকা পান, আমায় কি দেবেন ?

—দেবেন, আমায় দেবেন—আপনি সন্ন্যাসী, আপনার টাকা কি হবে, আমার যে টাকার বড় প্রয়োজন।

আবেগের সঙ্গে রাধাকান্ত আবার উঠে দাঁড়াল, তারপর সন্ন্যাসী প্রেমদাসের পা জড়িয়ে ধরল।

—জীবনে কখনও এমন করে কারো কাছে ভিক্ষে চাইনি, আমার আলিপুরের বাড়ী মর্টগেজ দিতে রাজী আছি।

রাধাকান্তকে ধরে তুলে প্রেমদাস বুকে জড়িয়ে ধরল।

—রাধাকান্তবাবু, আপনার নিষ্ঠা দেখে বড় আনন্দ হল। আপনি যা চান তা সমস্ত প্রাণ দিয়ে চান, আপনি সত্যপরায়ণ লোক—পাবেন, আপনি টাকা পাবেন।

—কে, কে দেবে ? আপনি ? কখন ? এখুনি টেলিগ্রাম করতে হবে যে—

—আমি সন্ন্যাসী, আমি কোথা থেকে দেব? তবে আপনি আজকের মধ্যে টাকা পাবেন।

—সব হেঁয়ালি, ভণ্ডামি!

প্রেমদাসকে ঠেলা দিয়ে ছেড়ে রাধাকান্ত নিজের বেঞ্চের এক কোণে গুম্ হয়ে বসল। এ আবেগ, এ ভিক্ষা চাওয়ার জন্য সে লজ্জিত, ক্ষুব্ধ।

—দেখ বিরিঞ্চি, রাধাকান্তবাবুর একপ্রাণতা আছে, কিন্তু বিশ্বাস নেই।

—বিশ্বাস না থাকলে মুক্তি কি করে হবে ঠাকুর? ভক্তির মূলে যে বিশ্বাস।

—সুন্দর কথা বলেছ। কিন্তু রাধাকান্তবাবু ত মুক্তি চান না।

বিরিঞ্চি ভাবল সে বলে, আমি মুক্তি চাই। শুধু ছোট মেয়েটির বিবাহ হয়ে গেলে ও ছেলেটির একটা চাকরি হলেই—ঠাকুরের অনেক ধনী শিষ্য আছে—

কিন্তু প্রেমদাসের স্তব্ধ গম্ভীর মূর্তি দেখে সে কোন কথা বলতে পারলে না।

দীপ্ত আলোকপূর্ণ আকাশের দিকে চেয়ে প্রেমদাস স্তব্ধ হয়ে বসলেন।

ছিওকী স্টেশন ছাড়িয়ে বোম্বে মেল ছুটে চলেছে, মধ্য-ভারতের গিরি নদী তরঙ্গায়িত প্রান্তর পার হয়ে।

প্রথম বোতল শেষ করে গণেশ বললে, কি দেবপ্রিয়বাবু, অর্ধেক গেলাস এখনও রয়েছে যে।

শিপ্রা হেসে বললে, দেবপ্রিয়বাবুর ভয়, পাছে তিনি মাতাল হয়ে যান। তোমার অনুরোধে খেয়েছেন ত অনেকটা।

গেলাসটা নাড়তে নাড়তে দেবপ্রিয় বললে, দেখুন, আমেজ একটু লেগেছে, এর বেশি মাত্রা বাড়াতে গেলে মত্তাবস্থার সৃষ্টি হতে পারে, নিজের কথাবার্তা ব্যবহারের উপর নিজের কর্তৃত্ব হারিয়ে ফেলতে পারি, মানুষের এর চেয়ে দুরবস্থা কি হতে পারে!

গণেশ উচ্চহাস্যে দাঁড়িয়ে উঠল। শিপ্রা কিন্তু একটু বিষণ্ণভাবে দেবপ্রিয়ের দিকে চাইলে।

দেবপ্রিয় বললে, দেখুন, মানুষের সঙ্গে পশুর তফাৎ হচ্ছে, মানুষের বুদ্ধি আছে, সেই বুদ্ধি লোপ করতে আমি রাজী নই। কথা কইব, হাসব, হয়ত বিজ্ঞের মত কথাও বলব, অথচ আমি কি করছি, কি বলছি, নিজেও জানব না, বুঝব না,—

শিপ্রা বাধা দিয়ে বললে, আপনি বোধ হয় এর আগে কখনও খান নি?

দেবপ্রিয় বললে, না।

দ্বিতীয় বোতল খুলতে খুলতে গণেশ বললে, নেশা একটু লাগতেই ভাল ভাল কথা বলতে আরম্ভ করেছেন দেখছি! কিন্তু পণ্ডিতের মত

ত কথা হচ্ছে না। আমরা কি সত্যিই বুদ্ধি দ্বারা চালিত হই? আমরা যে কাজ করি, তা কি কোন রহস্যময় অজানা শক্তি দ্বারা চালিত হয়ে করি না? এই যে আমি অভিনেত্রী শিপ্রাদেবীকে ফার্স্ট ক্লাস রিজার্ভ করে নিয়ে চলেছি, এই যে আপনি তার পাশে বসে চা খেলেন, হুইস্কি খাচ্ছেন, এসব কি আমরা বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে করছি—কি যে আমরা চাই, কেন যে আমরা চাই, তা আমরা নিজেরাই জানি না। ছুটে চলেছি জীবনের ভোগের নেশায়, তার আশা, আনন্দ, অতৃপ্তি, বাসনা, আর বাসনার ব্যর্থতা—সেই নেশার বেগ, নেশার জ্বালা কমাবার জন্যেই এই নেশা করি, বুঝলেন দেবপ্রিয়বাবু, যাকে বলে বিষে বিষে বিষক্ষয়—

'পপ্' করে বোতলের ছিপি খোলার শব্দ হতেই গণেশ চুপ করল। দেবপ্রিয় বিস্মিত হয়ে গণেশের দিকে চেয়ে ভাবলে, এই লক্ষপতি যুবক একটা বুদ্ধিহীন কামুক নয়। জীবনকে এ নূতন রূপে গভীরভাবে ভোগ করতে চায়, জানতে চায়। লক্ষপতি পূর্বপুরুষদিগের ভোগ-বাসনার অতৃপ্তি অনলের মত জ্বলছে, নিজের জীবনকে উড়িয়ে দিয়ে সে কামনাকে পরিহাস করতে চায়।

দেবপ্রিয় ভাবতে লাগল, গণেশ ঠিক কথাই বলেছে। আমরা বুদ্ধিবৃত্তি দ্বারা পরিচালিত নই। ট্রেনে সিনেমা-অভিনেত্রীর পাশে বসে সে হুইস্কি খাচ্ছে, এ কথা সে কোন দিন কল্পনাও করতে পারে নি! অথচ স্বইচ্ছায় সানন্দে বসেই ত খাচ্ছে।

শিপ্রার গাড়ীতে উঠে সে যে গল্প করতে করতে চলেছে, এ শুধু সাংবাদিকের সংবাদ-সংগ্রহের প্রচেষ্টা বললে ভুল বলা হবে। এর মধ্যে কি মোহ নেই? কোন গুপ্তকামনা পরিতৃপ্তির প্রয়াস নেই? শিপ্রা তাকে মুগ্ধ করেছে। সে মুগ্ধতায় হৃদয় মত্ত, আবেগে আন্দোলিত। ওই

কালো মেয়ের সুঠাম রূপ যেন কালো পাথরে খোদাই-করা ফিডিয়াসের হাতে-গড়া তরুণী, অথবা কালিদাসের উজ্জয়িনী হতে বহুযুগ পার হয়ে কোন নটী চঞ্চলপদে এসে অবাক হয়ে বসেছে। এ মোহন মুগ্ধতাকে ত সে বুদ্ধির বাণ দিয়ে ছিন্ন করতে চায় না।

বস্তুত জগদীশের সঙ্গে দেখা হবার পর হতে দেবপ্রিয়ের অন্তর অশান্ত হয়ে উঠেছে। যেন কোন বুভুক্ষু বিদ্রোহী সংস্কারের শেকল ভেঙে বুদ্ধির কারাগার হতে ছুটে পালিয়ে চলেছে। সে বঞ্চিতের দলে থাকবে না, ধনবানদের মত সে-ও জীবন উপভোগ করতে চায়।

ভাবতে ভাবতে দেবপ্রিয় গেলাসের বাকি হুইস্কিটুকু খেয়ে ফেললে। গলা জ্বলে ওঠাতে সে চমকে উঠল। সূর্যালোকিত পৃথিবী, চঞ্চল বনপ্রান্তর বড় সুন্দর লাগল।

বিস্মিত হয়ে শিপ্রা দেবপ্রিয়ের দিকে চাইলে। মদ খেয়ে দেবপ্রিয় যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। মূর্খ মাতাল শিপ্রা অনেক দেখেছে, একবার পণ্ডিত মাতাল দেখতে ইচ্ছে করছে, অথচ দেবপ্রিয়কে মাতাল করে তুলতে তার ভাল লাগছে না। গণেশ যে দেবপ্রিয়কে মাতাল করে মজা দেখতে চায়, এ কথা বুঝে সে দেবপ্রিয়ের শূন্য গেলাসটা উল্টে রেখে দিলে। দেবপ্রিয় স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

শিপ্রা বললে, অত কি ভাবছেন, দেবপ্রিয় বাবু?

কালো চশমা খুলে দেবপ্রিয় চাইলে। শিপ্রার দীর্ঘ নয়নের ঘনকৃষ্ণ তারকা কি স্নিগ্ধ, কি গভীর!

দেবপ্রিয়ের দৃষ্টিতে শিপ্রা ভীত হয়ে উঠল। অনেক প্রেমমুগ্ধ যুবকের উন্মত্ত দৃষ্টি সে দেখেছে, কিন্তু এমন জ্বালাময় উদাস দৃষ্টি সে দেখেনি।

শিপ্রা বললে, আপনি সব সময় অত কি ভাবেন, কেন এত ভাবেন? কথা বলুন, দেবপ্রিয়বাবু!

—কেন ভাবি? কে ভাবে? আমি কি ভাবি? এই যে ভাবছি এ চিন্তা-ক্রিয়া আমার ইচ্ছার অধীন নয়। উর্ণনাভ যেমন আপনার চারিদিকে জাল তৈরি করে, তেমনি আমার মাথায় বসে কে যেন অবিশ্রাম চিন্তার জাল রচনা করে চলেছে, ঘড়ির কাঁটা যেমন অহর্নিশি ঘুরে চলে, তেমনি আমার মস্তিষ্কে চিন্তার পর চিন্তা দল বেঁধে ঘুরে চলেছে, যেমন ওই সুনীল দিগন্তে মেঘের সারি উড়ে চলেছে—তারা কি জানে, কেন, কোথায় তারা চলেছে—

শিপ্রা এবার ভয় পেয়ে একটু সরে বসল। ভাবলে, পণ্ডিত মাতাল হলে বোধ হয় এই রকম ভাবে কথা বলে।

শিপ্রার সরে বসার ভঙ্গী দেবপ্রিয় দেখলে। কালো চশমা পরে সে বললে, ভাববেন না আমি মাতাল হয়েছি।

কঙ্কণে বলয়ে ঝঙ্কার দিয়ে শিপ্রা বললে, আমি কি তাই বলছি!

কিন্তু তার কথার সুরে বোঝা গেল, মনে মনে সে কি ভাবছে। দেবপ্রিয় ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। ট্রেনটা বড় বেশি দুলছে, মনে হল। বাকি হুইস্কিটুকু না খেলেই হত। হয়ত সে মাতলে হয়ে যাবে।

উত্তেজিতভাবে দেবপ্রিয় বললে, না, না, আমি মাতাল হই নি। এই ত আমি বেশ চিন্তা করছি। দেখুন আমি ফরাসী কবি মুসের কবিতা আবৃত্তি করছি:

Poe´te, prends ton luth ; le vin de la jeunesse
Fermente cette nuit dans les veines de Dieu !

শিপ্রা বললে, কিন্তু আমরা যে ফরাসীভাষা জানি না, আপনি কবিতা ঠিক বলছেন কি না কি করে বলব।

দেবপ্রিয় দাঁড়িয়ে উঠে বললে, ও, ফরাসী ভাষা জান না! আচ্ছা আমি মহাভারত হতে শ্লোক বলছি।

শিপ্রা বললে, আপনি ভুলে যাচ্ছেন, আমরা আপনার মত পণ্ডিত নই, আমরা মুখ্যু মেয়েমানুষ। যা বলতে চান বাংলায় বলুন। ও ফরাসী কবিতার মানে কি ?

দেবপ্রিয় শিপ্রার পাশে বসল। সে চঞ্চল হয়ে উঠেছে। আবেগের সঙ্গে বললে, মানে হচ্ছে, হে কবি, তব বীণা লহ তুলি, আজি রজনীতে যৌবনমদিরাধারা বিশ্ববিধাতার ধমনীতে উচ্ছলিত—

গণেশ বলে উঠল, বা, চমৎকার কবিতা—আমায় একটু লিখে দিন—আমাদের প্যারিস-ফেরতের পার্টে এই কবিতাটি দিতে হবে—দেখুন—বিধাতা মাতাল হয়ে উঠেছেন !

দেবপ্রিয় বিস্মিত হয়ে বললে, প্যারিস-ফেরৎ কে ?

শিপ্রা বুঝিয়ে বললে, আমরা যে ফিল্ম করতে যাচ্ছি, তাতে একজন প্যারিস-ফেরতের পার্ট আছে, আপনায় তাই জিজ্ঞেস করেছিলুম, আপনি ফ্রেঞ্চ জানেন কি না—আপনিই করুন না সে পার্টটা—আপনি বেশ পারবেন।

দেবপ্রিয় হেসে উঠল। বললে, আমি করব ফিল্মে অভিনয় ! তা মন্দ কি ! টাকাও ত পাওয়া যাবে। আর সারাক্ষণ অভিনয়ই ত করছি। বাড়িতে অভিনয়, অফিসে অভিনয়—যা সত্যিকার ভাবি তা গোপন করা, কথা বানিয়ে ভাব রচনা করে প্রকাশ করা—এই ত অভিনয়—

গণেশ হেসে বললে, তবে অভিনয়ের আগে এক গেলাস ক্যামেল, আর দেখতে হবে না, ফরাসী কবিতা সেন-নদীর মত ছুটে চলবে।

দেবপ্রিয় ক্ষুব্ধ হয়ে বললে, দেখুন, আমি সত্যি মাতাল হইনি, বুদ্ধির কি পরীক্ষা করতে চান, করুন।

শিপ্রা হ্যাণ্ডব্যাগ থেকে লিপষ্টিক বার করে বললে, চটছেন কেন, তার চেয়ে আসুন একটু তাস খেলা যাক।

—তাস! তাসখেলা আমি ভাল জানি না।

—জানেন না! আপনি কি সারাজীবন খালি বই পড়েছেন?

—তাসখেলার থিওরী জানি, বেশি খেলিনি।

গণেশ হেসে বললে, সেইজন্যেই আপনার এই অবস্থা।

দেবপ্রিয় বিস্মিত হয়ে বললে, কেন?

গণেশ বললে, আপনি জীবনের খেলারও সব বড় বড় থিওরী বইয়েতে পড়ে মুখস্থ করেছেন, কখনও সাহস করে খেলেন নি, তাই হাতে যখন রঙের বিবি আসে, রাখতে পারেন না, অন্য লোকে নিয়ে চলে যায়।

—আপনি আমার জীবনের কি জানেন?

—দেখছি এই যে, আপনার সাধ আছে কিন্তু সাহস নেই।

শিপ্রা বিরক্তির সঙ্গে বললে, কি যা-তা বলছ, গণেশবাবু! দেবপ্রিয়-বাবু, আপনি ওসব শুনবেন না। তাসখেলা শিখতে চান ত বলুন, শেখাতে পারি।

দেবপ্রিয় তার নোট বুক বার করে বললে, আমাকে দেবার মত সময় যদি আপনার হাতে থাকে, তা হলে তার সদ্ব্যবহার করতে চাই।

শিপ্রা ব্যাগ থেকে তাসের প্যাকেট বার করে বললে, কি, ইণ্টারভিউ দিতে হবে?

অনুনয়ের সঙ্গে দেবপ্রিয় বললে, দেখুন, আমি আপনার একটা জীবনী লিখতে চাই।

শ্লেষের স্বরে শিপ্রা বললে, জীবনী! আমার জীবন লিখবেন! কেন? খুব বিক্রি হবে, নয়?

গণেশ বলে উঠল, পঙ্কের উপর পদ্ম ফুটেছে, তার শোভা দেখে মোহিত হয়েছেন, সেজন্য পঙ্কের ইতিহাসের দরকার কি! পণ্ডিত হলে অনেক মুশকিল দেখছি।

দেবপ্রিয় একটু লজ্জিতভাবে বললে, আপনারা ভুল বুঝছেন, আমি সে জীবনীর কথা বলছি না। ভুল বুঝবেন না।

শিপ্রা গম্ভীরভাবে বললে, দেখুন দেবপ্রিয়বাবু, আমার জীবনের কথা লোকসমাজে প্রচার করবার মত নয়—তাতে গর্বের কি আছে—বরঞ্চ লজ্জা পাবারই—আপনার মত পণ্ডিত লোক ভাল ভাল বই লিখবেন—

বলতে বলতে শিপ্রা থেমে গেল। দেবপ্রিয় তার দিকে বিমুগ্ধভাবে চেয়ে আছে। ওই মুগ্ধ মুখ, খুলি জোড়া টাক দেখে শিপ্রার হাসি পেল। এ মুগ্ধতা হুইস্কির ক্ষণিক মাদকতা নয়, সে বুঝতে পারলে। হাসি চেপে সে চুপ করে বসল। এ নেশার ভঙ্গী সে দেখতে চায়।

দেবপ্রিয় বললে, ইসাডোরা ডাঙ্কানের আত্মজীবনী পড়েছেন ত, আমি সেই রকম বই লিখতে চাই, আপনি বলে যাবেন, আমি লিখে যাব,—বাইরের জীবনের কথা আমি বলছি না, আমি চাই আপনার অন্তরের, আপনার অনুভূতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস।

শিপ্রা আর হাসি চাপতে পারলে না। উচ্চহাস্যে বললে, ইসাডোরা ডানকান না বাঁকান. কে, নাম ত শুনিনি।

বিস্মিত হয়ে দেবপ্রিয় বললে, শোনেন নি ?

গণেশ এবার টিপ্পনী দিলে, সত্যি কথা বলতে কি, বিদ্যে ত থারডো কেলাশ—

শিপ্রা কটাক্ষ করে বললে, তা গণেশবাবু ঠিকই বলেছ, উনি পণ্ডিত মানুষ, সবাইকেই পণ্ডিত ভাবেন।

দেবপ্রিয় দীপ্তকণ্ঠে বললে, ভুল বুঝছেন। আপনি কবে কোথায় জন্মেছেন, কোন্ স্কুলে পড়েছেন, এ সব আমি জানতে চাই না। এ সব লিখতে চাই না। আপনি শুধু প্রতিভাসম্পন্না অভিনেত্রী নন, আপনি

অপূর্ব নৃত্যকুশলা, অপরূপ আপনার নৃত্য। এ নৃত্যের ছন্দ রয়েছে আপনার আত্মায়, আপনার মনের বেদনা-কামনা-আশা-স্বপ্ন নৃত্যে রূপিত হয়। এ রূপ দেবার শক্তি ধীরে ধীরে কি করে প্রথম জাগল, তারপর বিকশিত হয়ে উঠল, ফুলের মত, কোন্ নিবিড় আনন্দের ছন্দে দেহমন দুলে উঠল—আমি চাই সেই ইতিহাস। স্টেজে যখন নৃত্য করেন, শত শত বিমুগ্ধ দর্শকের মুগ্ধ দৃষ্টির দীপ্তি স্টেজের আলোর সঙ্গে ঝল্‌মল্ করে—তখন মনে কি ভাবের সঞ্চার হয়, আমি চাই সেই অনুভূতির ইতিহাস।

শিপ্রা এবার গম্ভীরভাবে বসলে। এমন সশ্রদ্ধভাবে কেউ তার সঙ্গে কখনও কথা কয়নি। জীবনে, যেখানে সে সত্য, যেখানে সে সার্থক, দেবপ্রিয় সেই শিপ্রাকে জানতে চায়।

দেবপ্রিয় বলতে লাগল: মনে পড়ে কি, ছেলেবেলায় কোন্ দিন প্রথম আপনার নৃত্য করবার ইচ্ছে হল। হয়ত, কোন্ বসন্তের প্রভাতে কোন পুষ্পিত উপবনে,—দেখলেন বাতাসে গাছের ডাল নুয়ে নুয়ে পড়ছে, ফুলগুলি দুলছে, পাতাগুলি আলোয় ঝিল্‌মিল্ করছে, সবুজ রঙের কোন পাখী উড়ে বেড়াচ্ছে,—কোন অজানা সুরে পা দু'টি চঞ্চল হয়ে কেঁপে উঠল, হৃদয়ে লাগল শিহরণ—উতলা বাতাসে অঞ্চল দিলেন উড়িয়ে—'বসন্তের আবির্ভাব' নৃত্যে আপনার সে রূপ দেখেছি—ও ভাবময়ী মূর্তির স্রোত—

শিপ্রা বললে, শুনতে বেশ লাগছে, কিন্তু অত কিছু ভেবে নাচি বলে ত মনে হয় না।

দেবপ্রিয় বলে যেতে লাগল, আপনার মনে নিশ্চয় অনেক ভাবের উদয় হয়, তারি প্রেরণায় নৃত্যরূপের ব্যঞ্জনা, আপনি বুঝতে পারেন না। অথবা, মনে পড়ে কি বালিকাবয়সে দীর্ঘ দর্পণের সম্মুখে একা ঘরে নৃত্য-কলার নানা ভঙ্গী অভ্যাস করছেন, হঠাৎ এক ঝলক সূর্যালোক বুকের

ওপর এসে পড়ল, আরশি ঝল্‌মলিয়ে উঠল, অনুভব করলেন, কি সুন্দর আপনার দেহ, কি অজানা বেদনা আপনার বক্ষে—অনুভব করলেন আপনি নারী—আলো-ভরা সুবৃহৎ আয়নার দিকে বিস্মিত মুগ্ধনয়নে রইলেন চেয়ে—আলোকের সঙ্গে এল আগুন, অজানা আনন্দ, অজানা আকাঙ্ক্ষা—'যৌবনের জাগরণ' নৃত্যে আপনার রূপভঙ্গী দেখেছি—কিশোরী বয়সের কোন মধুর গোপন অনুভূতিই নিশ্চয়—

গণেশ বলে উঠল, বা চমৎকার! আর এক গেলাস হোক তা হলে।

শিপ্রা মৃদুহেসে বললে, কিন্তু আমার ত এ রকম কিছু মনে পড়ছে না। আচ্ছা, দেবপ্রিয়বাবু, আপনার স্ত্রী আছেন?

দেবপ্রিয় একটু চুপ করে বললে, স্ত্রী! হাঁ, আছেন বৈ কি।

চশমাটা খুলে সে কাচগুলি রুমাল দিয়ে মুছতে লাগল।

শিপ্রা হেসে বললে, তাঁর সঙ্গে কি আপনি এই রকম ভাবে বড় বড় কথা বলেন?

দেবপ্রিয়ের গণ্ডের রক্তিম আভা মলিন হয়ে এল। এক অভিনেত্রীর সঙ্গে সে এমনভাবে কথা কইছে, এই দৃশ্যটি যদি তার স্ত্রী নলিনীর নয়নগোচর হত, তা হলে তার মুখের অবস্থা কিরূপ হত, সে কল্পনা করতে চেষ্টা করলে।

শিপ্রা বললে, কৈ কথার উত্তর দিচ্ছেন না যে। মুখ্যু মেয়ে মানুষ পেয়ে খুব বড় বড় বক্তৃতা দিচ্ছিলেন।

গণেশ হেসে বললে, দেখ ত, স্ত্রীর নাম করে সকালের নেশাটা একেবারে ছুটিয়ে দিলে।

শিপ্রা বললে, কি সিনিক্ তুমি। তা ছাড়া দেবপ্রিয়বাবুর কোন নেশা হয় নি। শুনুন, তার চেয়ে আপনার সংসারের গল্প করুন।

দেবপ্রিয় অনুভব করলে, যে মানসিক উত্তেজনায় সে এতক্ষণ কথা কইছিল, সে আবেগ আর নেই। বোধ হয় একটু নেশা হয়েছিল, কেটে গেছে। ধীরে সে বললে, আমার সংসারের কথা কি শুনবেন—একঘেয়ে সাধারণ জীবন, অর্থাভাব, রোগ, খুঁটিনাটি নিয়ে ঝগড়া—তারই মাঝে একটা শান্তির ভাব--

শিপ্রা বললে, কি জানি, পরের সংসারের কথা শুনতে আমার বেশ ভাল লাগে, বোধ হয় নিজের সংসার নেই বলে।

দেবপ্রিয় বললে, আপনার জীবনের খুব বড় কাজ রয়েছে, আপনি সাধারণ সংসার করবার জন্যে নন।

গণেশ হেসে হাততালি দিয়ে উঠল, হাঁ, একথা ঠিক বলেছেন। বোঝান ত। শুনলে ত, অত বড় পণ্ডিতের মত।

শিপ্রা ধীরে বললে, শুনুন দেবপ্রিয়বাবু, আমার জীবনী লিখতে চান, আপনাকে আমি সাহায্য করব; অথবা আপনার লেখা কোন বই আমি ফিল্ম কোম্পানীকে বলে কিনিয়ে দেব, কিন্তু আমাকে একটা বিষয় সাহায্য করতে হবে।

দেবপ্রিয় বললে, কি সাহায্য করতে হবে বলুন, আমি রাজী।

কটাক্ষে শিপ্রা গণেশের দিকে চাইলে। মৃদুস্বরে বললে, এখন বলতে পারছি না, পরে বোলবো। আসুন, আপনাকে তাসখেলা শেখাই। তাসের ম্যাজিক জানেন?

মুগ্ধ নয়নে দেবপ্রিয় শিপ্রার দিকে চাইলে, এ যেন কোন যাদুময়ী। তার ব্যবহারে কতখানি সত্য, কতখানি অভিনয় সে জানতে চায় না, মোহঘোরের আনন্দ সে অনুভব করতে চায়।

চিন্তাপূর্ণ দৃষ্টিতে কল্যাণ মালতীর মুখের দিকে চাইলে, যেমন ভাবে সে চেয়ে থাকে খাতার সাদা পাতায় কালো কালীতে লেখা অঙ্ক শাস্ত্রের কোন নতুন ফরমুলার দিকে। নিশিজাগরণমলিন শুভ্র বিবর্ণ মুখশ্রী, লম্বা দীর্ঘ চোয়ালে চিত্তের দৃঢ়তা পরিস্ফুট, আবার পেলবগণ্ডে অসম চিবুকে হৃদয়ের কমনীয়তা প্রকাশিত। অনুপমার পাশে মালতী, যেন পূর্ণ প্রস্ফুটিত রৌদ্রতাপম্লান রক্তগোলাপের পাশে শিশিরসিক্ত বিকচোন্মুখ রজনীগন্ধা।

কল্যাণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মালতীর আয়ত নয়নের কৃষ্ণ তারকায় আঘাত খেয়ে যেন ঠিক্‌রে গেল। মালতীর পাণ্ডুর গণ্ডে রক্তের ছোপ লাগল।

চা খাওয়া শেষ হতে অনুপমা বললে, তোমার গল্প করো, আমার কথা কইতে ক্লান্তি লাগছে, আমি বরঞ্চ চুপ করে শুনি।

অনুপমা এক কোণে চোখ বুজে বসেছে। মালতীও চুপ করে বসে, বলবার কথা খুঁজে পাচ্ছে না। কল্যাণ তার হৃদয়কে চঞ্চল কিন্তু বাণীকে মূক করেছে।

মাঝে মাঝে কল্যাণ মালতীর সঙ্গে কথা কইছে। সেটা প্রশ্নোত্তরের মত দাঁড়াচ্ছে। মালতীর পাশে চেয়ারে বসে সে মালতীর মুখের দিকে চাইছে। তাজা কচি ফলের মত এ মুখ, স্বপ্নে তারুণ্যে ভাবের ব্যঞ্জনায় ভরা। তরুণী অনুপমার কথা মনে পড়ে। যখন সে কলেজের ক্লাস পালিয়ে হঠাৎ চলে আসত অনুপমার সঙ্গে গল্প করতে। এ ব্যাধিক্লিষ্টা অপরূপা সুন্দরী নারী একদিন ছিল চঞ্চলা তরুণী।

অনুপমা বললে, তোমরা যে বড় চুপচাপ।

কল্যাণ হেসে বললে, অনেক সময় কথা বলার চেয়ে চুপ করে বসে থাকা ভাল লাগে।

অনুপমা কটাক্ষ করে বললে, শুনে সুখী হলুম।

মালতী ধীরে বললে, বোধ হয় কেউ কথা কইবার মুডে নেই। তা ছাড়া, এ সময়টা ঠিক গল্প জমে না।

কল্যাণ বললে, সামাজিক আইনের দিক থেকে অবশ্য চুপ করে বসে থাকাটা অপরাধ; কিন্তু অনেক সময় কথা না কয়ে আপনাকে গভীরভাবে ব্যক্ত করা যায়; অনেক সময় দুইবন্ধু পাশাপাশি চুপ করে বসে পরস্পরকে যে শান্তি আনন্দ দিতে পারে, তা কথা কয়ে পারে না।

অনুপমা হেসে বললে, সে-টা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেই বেশি দেখা যায়, কথা-না-কওয়ার শান্তি, আনন্দ!

মালতী বললে, অনুপমাদি, কি সিনিক্ তুমি!

কল্যাণ বললে, কবি টেনিসনের গল্প জানেন না। একবার টেনিসন গেছলেন কার্লাইলের সঙ্গে দেখা করতে বহুদিন পরে। লাইব্রেরীতে ফায়ার প্লেসের সামনে দুজনে বসলেন মুখোমুখি চেয়ারে। দু-এক কথার পর টেনিসন ফায়ার প্লেসের আগুনের দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলেন, কার্লাইলও চুপ করে বসে ভাবতে লাগলেন। দুজনে স্তব্ধ, চিন্তামগ্ন, তিনঘণ্টা কেটে গেল। তারপর হঠাৎ টেনিসন উঠে পড়লেন, কার্লাইলের সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করে বললেন, তোমার পাশে এই চুপ করে বসে যে গভীর আনন্দ পেয়েছি তার তুলনা নেই; কারণ আমার চিন্তার সঙ্গে তোমার নীরব চিন্তাধারা মিশে গেছে, আমি একটা কাব্যের খসড়া করে ফেলেছি। তোমাকে তার জন্যে ধন্যবাদ।

মালতী বললে, কার্লাইল তখন হয়ত ভাবছিলেন, ফরাসী বিপ্লবের প্যারিসের কোন পথদৃশ্য, আর টেনিসন হয়ত ভাবছিলেন কিং আর্থারের ক্যামেলটের সভা কি করে ভেঙে পড়ল—

কল্যাণ বললে, আমাদের প্রত্যেকের জীবনে কি এমনি বিপ্লব, ভাঙন নেই? হৃদয়ের সে সব গভীরতম বেদনা, স্বপ্ন-বাসনার কথা, একা বসে বসে ভাবার চেয়ে কোন বন্ধুর পাশে বসে ভাবলে কি নতুন শক্তি নতুন আশা জীবনের নতুন রহস্যময় আনন্দপথ খুঁজে পাওয়া যায় না!

অনুপমা মালতীর দিকে কটাক্ষ করে বললে, তোমার কথা শুনে আশা হচ্ছে, কল্যাণ! কি বল মালতী!

মালতী কোন উত্তর দিলে না। তার মুখ রক্তিম।

মানিকপুর স্টেশনে কল্যাণ কুপে থেকে নেমে গেল।

মালতীও নামবার চেষ্টা করাতে অনুপমা বাধা দিলে। বললে, খড়খড়ি ফেলে দিয়ে বস্ দেখি, একা আমি হাঁপিয়ে উঠব।

মালতী বললে, কেন জগদীশ বাবু ত আসছেন।

অনুপমা হেসে বললে, সাহেব এখন আসছেন না। কোন বড় মিলিটারী অফিসার যাচ্ছেন এ ট্রেনে, তাঁর সেলুনে বসে ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যরক্ষণের পরামর্শ হচ্ছে, যুদ্ধ নাকি শীঘ্র বাধবে।

মালতী বিস্মিত হয়ে বললে. যুদ্ধ শীঘ্র হবে নাকি? তা হলে আমার ইয়োরোপ যাওয়া ত হবে না।

অনুপমা বললে, দরকার কি, ঘরে বসেই যুদ্ধ চালা না; কল্যাণ বেশ ভাল fighter.

অনুপমা মালতীর গালে আঙুল টিপে বললে, তা অত রাঙা হয়ে উঠছিস কেন?

স্টেশন হতে গাড়ী ছাড়-ছাড় হয়েছে। একটা কুলী অনুপমাকে সেলাম করে বললে, গাড়ী সাফ করতে হবে, মেমসাব!

কণ্ঠস্বরে অনুপমা চমকে উঠল। কুলীর মুখের দিকে নির্নিমেষ নয়নে চাইলে। তারপর গম্ভীর স্বরে বললে, হাঁ, বাথরুম সাফা করতে হবে, শীগ্‌গীর! শীগ্‌গীর!

হাতে ছোট এক ঝাঁটা ও ময়লা ঝাড়ন নিয়ে কুলীটি তাড়াতাড়ি কুপেতে উঠে পায়খানা-ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে! সাফ করবার কোন শব্দ হল না। ট্রেন স্টেশন ছাড়িয়ে চলল।

মালতী একটু ভীতভাবে বললে, কুলীটা যে বাহির হল না, অনুপমাদি।

অনুপমা হেসে বললে, বোধ হয় চলে গেছে, দেখ্‌না দরজা খুলে।

মালতী দাঁড়িয়ে উঠে বললে, আমার কেমন ভয় করছে।

অনুপমা বললে, ভয় কিরে? তুই না ইয়োরোপ যাচ্ছিলি একা। জানলার আর দরজার খড়খড়িগুলো ফেলে বন্ধ করে দে দেখি, বড় তাত আসছে।

মালতী বিস্মিতভাবে অনুপমার দিকে চাইলে!

খড়খড়িগুলো ফেলে বসতেই ধীরে ট্রেনের গতি মন্দ হয়ে এল।

অনুপমা ভীতভাবে উঠে দাঁড়ালে। উদ্বিগ্নকণ্ঠে মালতীকে বললে, মুশকিল হল মালতী। এবার তোর সাহসের পরীক্ষা হবে।

মালতীর মুখ পাংশুবর্ণ। কম্পিতকণ্ঠে সে বললে, কি হয়েছে? আমি কিছু বুঝতে পারছি না, অনুপমাদি!

অনুপমা গম্ভীরস্বরে বললে, ও কুলীকে চিনলি নি, তোর পাশ দিয়ে গেল মুচ্‌কে হেসে, ও যে সমর!

—সমর!

—হাঁ, সমর আছে ওই বাথরুমে। ট্রেন যে থেমে এল। বোধ হয় তাকে খোঁজবার জন্যেই ট্রেন থামানো হচ্ছে।

—কিন্তু স্টেশনেই ত তাকে খুঁজতে পারত।

—স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের সব গাড়ীতে খোঁজা অসুবিধের। এখন গাড়ী থামিয়ে খোঁজা সুবিধের।

—ট্রেন যে সত্যিই থেমে এল।

—এখন ভয় পেলে চলবে না। সমর অন্য কোথাও লুকাবার জায়গা না পেয়েই এ গাড়ীতে আশ্রয় নিয়েছে। তাকে বাঁচাতে হবে।

—এখানে কি সার্চ করতে আসবে না?

—আসবে একবার নিশ্চয়, তবে সাহেবকে নিয়ে আসবে। না, অমন মুখ শুকিয়ে ভয় পেলে চলবে না। তুই বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দে!

—আমি! সে আমি পারব না!

—যা শীগ্‌গীর। পুলিশ খুঁজতে এলে, আমি বলব, আমার বোন বাথরুমে আছে; তুই ভেতর থেকে সাড়া দিবি। তা হলে কেউ খুলতে সাহস করবে না।

—আমার কেমন সাহস হচ্ছে না। যদি তা শুনেও না চলে যায়—

—কি বোকা মেয়ে, ট্রেন থেমে এল বলে, আর দেরি করিস্ না।

—অনুপমাদি!

—আচ্ছা, আমিই যাচ্ছি বাথরুমে। আমি সমরকে বলেছিলুম যে, আমি থাকতে তার কোন ভয় নেই। সেই ভরসায় সে এ গাড়ীতে এসেছে। তুই শুধু স্থির হয়ে থাকবি, কোন রকম ভয়ের ভাব দেখাস নি। আমার স্বামী এলে শুধু বলবি, অনুপমাদি আছেন ওখানে, বেশি কথা বলবি না—দে, আমার ওই জামা, আর ব্যাগটা দে।

ট্রেনের গতি আরও মন্দ হয়ে এল। এক ধাক্কায় দরজা খুলে অনুপমা বাথরুমে প্রবেশ করলে। সশব্দে দ্বার বন্ধ হয়ে গেল। মালতী সে দিকে চাইতে পারলে না। চেয়ারের হাত ধরে দাঁড়িয়ে সে কাঁপতে লাগল।

ট্রেন অতি মৃদু গতিতে চলেছে।

মালতীর দম আটকে আসছে বন্ধ কুপেতে। জানলার খড়খড়ি ফেলে সে বাইরে চাইলে। ট্রেন থামলে যেন সে বাঁচে।

ট্রেন কিন্তু থামছে না, ধীরে, অতি ধীরে চলেছে। তীব্র রৌদ্রালোকিত তরঙ্গায়িত প্রান্তর হিংস্র জন্তুর ক্ষুধিত চক্ষুর মত চকমক্ করছে।

ট্রেন ত থামছে না। তার গতি বাড়ছে না কমছে, মালতী কিছু বুঝতে পারছে না। চেয়ারে বসে সে হাঁপাতে লাগল।

কতক্ষণ কাটল তার বোধ নেই। সময়ের গতি যেন থেমে গেছে। এক নিমেষ যেন অনন্তক্ষণ।

ট্রেন আবার দুলছে। অথবা ট্রেন হয়ত থেমে গেছে, সে ভুল করে ভাবছে, ট্রেন নড়ছে, ট্রেন দুলছে।

অনুপমার কণ্ঠস্বরে মালতী চমকে উঠল। বাথরুমের দরজা খুলে অনুপমা বলছে, মালতী, জানলা খুলেছিস্ কেন, বন্ধ করে দে। মালতী কোন উত্তর দিতে পারলে না। জানলার দিকে চাইলে। পাহাড় বন প্রান্তর, সমস্ত পৃথিবী যেন উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে।

অনুপমা মালতীর সামনে এসে দাঁড়াল।

—আমাদের ভয় বোধ হয় অমূলক, ট্রেন ত থামল না।

—তাই ত মনে হচ্ছে, ট্রেন ত চলেইছে, থামতে চায় না।

—কি ফ্যাকাসে মুখ হয়েছে তোর, যা চোখে মুখে জল দিয়ে আয়। কিছু খা, সমরকেও কিছু খেতে দে

—আমি কেমন উঠতে পারছি না।

—আর ভয় নেই, ওঠ্। আমরা মিছে ভয় করেছিলুম।

—সত্যি আর ভয় নেই, অনুপমাদি—ট্রেন তা হলে থামবে না—পুলিস আসবে না—কি ভয় পেয়েছিলুম!

মালতী আবেগের সহিত অনুপমার কণ্ঠ জড়িয়ে ধরলে। আয়ত স্নিগ্ধ নয়নদ্বয় হতে অশ্রুবিন্দু শীতল পাণ্ডুর অধর দিয়ে টস্‌টস্ করে গড়িয়ে পড়ল।

অনুপমা মালতীকে বক্ষে চেপে ধরলে। সমর বক্রহেসে বললে, কমরেড্ মালতী, হাতের ঝাড়নটা বড়ই ময়লা, একটা রুমাল দিয়েও সাহায্য করতে পারলুম না!

অনুপমা একটু পরিহাসের সুরে বললে, সমর ত রাজী হয়েছে, তোর হার হল মালতি!

অদমনীয় ভাবোচ্ছ্বাসের প্রকাশে মালতী লজ্জিত হয়ে স্তব্ধ হয়ে বসেছিল। একটু বিরক্তির সঙ্গে সে বললে, কি রাজী হয়েছে?

অনুপমা বিজয়িনীর মত হেসে বললে, ভাল কোন কাজ পেলে ও বিপ্লবের পথ ছেড়ে দেবে। ও করতে চায় দেশের সেবা।

মালতী ক্ষুব্ধ স্বরে বললে, অসম্ভব! তার দু'চোখ জ্বালা করতে লাগল।

স্যাণ্ডউইচ খেতে খেতে সমর হেসে উঠল। ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে, অসম্ভব কেন কমরেড্ মালতি?

অগ্নিগর্ভ নয়নে মালতী একবার সমরের দিকে দৃষ্টিপাত করলে। তার বাঁকা হাসিভরা মুখের দিকে চাইতে ঘৃণা হল। শুষ্কস্বরে সে বললে, তুমি গভর্নমেণ্টের চাকরি করবে?

সমর উচ্চহাস্যে বলে উঠল, কেন কর না? যদি মোটা মাহিনা পাই।

মালতী ব্যঙ্গস্বরে বললে, তাহলে এত ঢং করা কেন—কাল রাত থেকে এতরকম ঢং না করলেই পারতে—

সমর ধীরে বললে, আহা চট কেন কমরেড্—ধরো, যদি কোন তরুণ আই-সি-এস তোমাকে শুভপরিণয়ের প্রস্তাব করে, তুমি কি প্রত্যাখ্যান করবে!

মালতী ক্রুদ্ধ হয়ে বললে, কমরেড্ বলবার তোমার কোন অধিকার নেই, অনুগ্রহ করে চুপ করো।

মুখ গুঁজে মালতী গুম্ হয়ে বসল। তার বুক কাঁপছে। আবার বুঝি সে কান্নায় ভেঙে পড়ে। দাঁতে দাঁত চেপে সে চোখের জল নিরোধ করলে।

ব্যাপারটা এরকম দাঁড়াবে, অনুপমা ভাবে নি। মালতীর আবেগ-অরুণ মুখের দিকে চেয়ে অনুপমা ভাবলে, মালতী সমরকে ভালবেসেছে।

সমরের কিন্তু কোন ভাব-চাঞ্চল্য দেখা গেল না। স্যাণ্ডউইচ শেষ করে সে কেক খাচ্ছে। মালতীর মনে যেন আরও আঘাত দেবার জন্য সে বললে, দিদি, মাইনেটা মোটা হয় যেন, রোজ এরকম স্যাণ্ডউইচ-কেক খেতে হবে।

মালতী নিজেকে সামলে নিলে। এত সহজে সে হার মানবে না। সমরের মুখে স্থিরনয়নে চেয়ে সে বললে, কেন অনুপমাদিদিকে কতগুলো মিথ্যে কথা বলছ। জগদীশবাবুকে বলে উনি পরে মুশকিলে পড়বেন। তুমি ত সত্যি গভর্নমেণ্টের চাকরি নেবে না।

সমর বললে, কেন নেব না! গভর্নমেণ্ট যদি আমাদের চাকরি দিতে আরম্ভ করে, ধীরে ধীরে আমরাই গভর্নমেণ্ট হয়ে উঠব।

অনুপমা উৎসাহের সঙ্গে বললে, বেশ বলেছ ভাই! কোন্ ডিপার্টমেণ্ট তোমার পছন্দ?

সমর বললে, আবকারী বিভাগ ছাড়া যে কোন ডিপার্টমেণ্টে দাও।

তর্জনী তুলে মালতী বললে, তোমাকে গোয়েন্দা-বিভাগে দেবে!

সমর যে পরিহাস করছে, এ কথা সে কেন এতক্ষণ বুঝতে পারেনি। কিন্তু সত্যই কি সে পরিহাস করছে?

মালতী ভাবতে লাগল, সমর যদি গভর্নমেণ্ট অফিসার হয়, তাতে তার রাগ করবার, আপত্তি করবার কি আছে। এ বিপ্লবের পথ, দুঃখ নির্যাতনময় জীবন, কত রোগভোগ, বেদনা, ব্যর্থতা। ভালই ত, সমর এ বিপ্লবের পথ ছেড়ে দেবে। তবু অদমনীয় ক্ষোভে মালতীর মন অশান্ত। এ যেন ঠিক হচ্ছে না।

সমর হেসে বললে, আচ্ছা, মালতী দেবী, এই যে আমি দাগী চোরের মত লুকিয়ে লুকিয়ে ট্রেনে পালিয়ে চলেছি, সেটা ভাল, না, এই যে জগদীশবাবু ফার্স্ট ক্লাশে সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে চলেছেন, সেটা ভাল, অথবা মিস্টার কল্যাণকুমার পাইপ টানতে টানতে একবার এ গাড়ী একবার ও-গাড়ীতে বসে গল্প করতে করতে চলেছেন, সেটা ভাল?

মালতী আবার রেগে উঠল, তিক্তস্বরে বললে, দেখুন, আমি আপনার অভিভাবক নই, আপনি যা খুশি করতে পারেন। তবে, আমাদের গাড়ীতে উঠে, এত ঢং এত ন্যাকামি করার দরকার ছিল না। তাই দেখেই আমার হাড় জ্বলে গেছে!

অনুপমা কটাক্ষে হেসে ভাবলে, অভিভাবক নও, সেইটাই হচ্ছে ক্ষোভের কারণ।

সমর কি বলতে যাচ্ছিল, মালতীর মনের অঙ্গারে খোঁচা দিয়ে সে স্ফুলিঙ্গলীলা দেখতে চায়, কিন্তু অনুপমা ঠোঁটের উপর তর্জনী রেখে ইসারা করাতে, সমর চুপ করে বসে রইল।

দ্রুত-চলন্ত ট্রেনে তিনজনে স্তব্ধ বসে রইল। বাইরে প্রখর রৌদ্র-ভরা শূন্যপ্রান্তর অগ্নিপ্রভ অঞ্চলের মত কাঁপছে।

পরের স্টেশনে মালতী কুপে থেকে নেমে নিজের গাড়ীতে গেল। বলে গেল, মা'কে চিঠি লিখতে হবে।

অনুপমা বললে, রাগ করিস না, জব্বলপুরে চা খেতে আসিস। ওর সঙ্গে ত আলাপ হল না।

জগদীশ খবর পাঠালে, এ স্টেশনেও সে আসতে পারলে না, বড় জরুরী কাজ পড়ে গেছে।

ট্রেন ছুটে চলল। সূর্য মধ্য-গগনে। বিজন গিরিপ্রান্তর মধ্য দিনের প্রখর আলোকে উদাসতায় ভরা।

খড়খড়ি সব নামিয়ে দিয়ে অনুপমা রঙীন কুশান ঠেসান দিয়ে বসল। সমরকে ডাকল, বস, আমার পাশে। মনটা খারাপ হয়ে গেল। মালতী বড় বেদনা পেয়ে গেল।

সমর বললে, তোমাকে বড় ক্লান্ত দেখাচ্ছে, দিদি। তুমি একটু ঘুমোও, আমি ততক্ষণ line of march-টা ভাবি।

অনুপমা একটু উদাস সুরে বললে, না, না, বস আমার কাছে, গল্প বল—চুপচাপ থাকতে ভাল লাগছে না—মাথাটা কেমন দপ্‌দপ্‌ করছে—এ সব emotion আমার সয় না।

তরুণ সুঠাম সমরের দিকে অনুপমা চাইলে। নয়নের কৃষ্ণতারকা অন্ধকারে রেডিয়মের মত জ্বলজ্বল্ করতে লাগল। কোন নারীর চোখে এরূপ অপরূপ জ্যোতি সমর কখনও দেখেনি। মন্ত্রমুগ্ধের মত সে বসল। ঝিলিমিলি-ঝরা আলো অনুপমার মুক্তকেশে রঙীন সিফং শাড়ীতে এসে পড়েছে, কোন মায়ালোকের মত।

সমরের দেহের রক্ত ঝিল্‌মিল্ করে উঠল। অনুপমা যে কি সুন্দরী,

এতক্ষণ চোখ মেলে সে দেখেনি। ওই এলায়িত তনুর ক্লান্তিমণ্ডিত সুষমা অপূর্ব জ্যোতিষ্কলোকের মত তার চোখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

—তুমি কি সুন্দর, দিদি! এতক্ষণ চোখ চেয়ে দেখিনি।

—যা, বেশি জ্যাঠামি করতে হবে না, বোস্।

—তোমার অসুখ সেরে গেছে?

—সম্পূর্ণ সারে নি, সাবধানে থাকতে হয়।

—আচ্ছা, ইয়োরোপে চলে যাও না কেন, সুইজারল্যাণ্ডের কোন স্যানিটোরিয়মে গিয়ে কিছুদিন থাকলে—

—কে নিয়ে যাচ্ছে বল্!

—কেন, জগদীশবাবু তোমায় বুঝি তেমন যত্ন করেন না? লোকটাকে দেখেই বুঝেছি, পাকা egoist.

—আমার অসুখের কথা থাক, তোর প্ল্যান কি বল্।

—আমি নিয়ে যাব, যাবে আমার সঙ্গে?

—পাগলা ছেলে!

—তুমি কি ভেবেছ সত্যি আমি গভর্নমেণ্টের কাজ নেব?

—কাজ নিতে বলি না, কিন্তু এ পথ ছাড়। কি সুন্দর স্বাস্থ্য, শক্তি, সমস্ত জীবন তোর সম্মুখে, ব্যর্থ করিস্ না এমন করে।

—জীবনে কে ব্যর্থ কে সার্থক হল, কে তার হিসাব করবে, কে তার বিচার করবে, দিদি!

—তা জানি! তবু ভয় হয়, বড় ব্যথা লাগে।

—কারাগারে যে মরল, সে মৃত্যু কি ব্যর্থ, নিরর্থক বলতে চাও?

—জানি, স্ফুলিঙ্গ হতেই দাবানল জ্বলে ওঠে। কিন্তু তুমি আমায় কথা দিয়েছ। আমি ওঁকে বলব। কাজ নিতে হয় নিও।

—বোলো। কি জানি, তোমার কথাতে 'না' বলবার শক্তি খুঁজে পাচ্ছি না। তুমি বোধ হয় আমায় জাদু করেছ।

—আমি! না মালতী?

—মালতীর সে শক্তি নেই দিদি, আমার প্রলয়-পথের সহযাত্রিণী হবার মত।

অনুপমা মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। বুকে একটা বেদনা যেন ঠেলে উঠতে চায়। আবার কাশির বেগ না আসে!

ধীরে সে বললে, আচ্ছা চুপ করে বস্। ওই শিশি হতে আমায় একটি পিল্ দে দেখি, আর এক গেলাস জল।

জল খেয়ে অনুপমা চোখ বুজে শুয়ে রইল। গাড়ীটা বড় দুলছে, বিরাট দানবের মত আর্তনাদ করতে করতে চলেছে, সে ধ্বনি বড় কর্কশ, বেদনাদায়ক।

রৌদ্রতাপক্লিষ্ট কমলের মত এ সুন্দরী নারীর দিকে সমর মুগ্ধ চোখে চেয়ে রইল। সদ্যোজাত শিশুর কান্নার মত এ অনুভূতি অপূর্ব নবীন!

মধ্যশ্রেণীর মহিলা-গাড়ীর কক্ষে মালতী ফিরে এল।

মধ্যদিনের তপনতপ্ত নির্মেঘ আকাশের মত তার দু'চোখ জ্বলছে।

গাড়ীর এক কোণের সব খড়খড়ি ফেলে দিয়ে সে গুম্ হয়ে বসল। মাথাটা হালকা, শূন্য বোধ হল। যেন সে ভাববার শক্তিও হারিয়েছে।

না, হার মানলে চলবে না। বন্ধ জানলাগুলির দিকে চেয়ে মালতী ভাববার চেষ্টা করতে লাগল। হার সে মানবে না।

সমরকে বাঁচাতে হবে। হঠাৎ সমর এমন বদলে গেল কেমন করে? অথবা সমর সত্যিই সোসিয়লিজমে বিশ্বাস করে না।

অনুপমা মায়াবিনী। অনুপমার রূপে সমর মুগ্ধ, মত্ত হয়েছে। অনুপমার নির্দেশে সে চলেছে।

কুপেতে ঝাড়ুদারের সাজে সমরের আবির্ভাবের পর হতে দ্রুত ঘটনার স্রোত অতিচঞ্চল সিনেমা-ফিল্মের আলোছায়ার নৃত্যের মত মালতীর চোখের সামনে প্রবাহিত হয়ে গেল। মালতী চোখ বুজলে। কালো পর্দার ওপর আলোর আবছায়া কাঁপতে দুলতে লাগল।

যদি সে সাহস করে বাথরুমে প্রবেশ করত, দেখাতে পারত, সমরের জন্ত সে ত্যাগ করতে প্রস্তুত, তা হলে সমর অনুপমার মায়াজালে পড়ত না। কিন্তু তার কেমন ভয় হল। জীবনে এমন ভয় কখনও সে পায়নি।

সমরকে বাঁচাতে হবে। সমর কি বুঝছে না, অনুপমার হাতে সে ক্ষণিকের ক্রীড়নক। উচ্চপদস্থ গভর্নমেণ্ট-অফিসারের স্ত্রী অনুপমার এ শুধু নিঃসঙ্গ রেলপথযাত্রার খেয়াল।

মালতী ভাবতে লাগল, কিন্তু সমরের ওপর তারই-বা কি অধিকার! তবু, সে হার মানবে না। সমরের এ মুগ্ধতা দূর করতে হবে। অনুপমার প্রতি সমরের মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টি সে দেখেছে, ভাবের রঙীন বাষ্পের আবরণে সে দৃষ্টি কুজ্ঝটিকায় পথ-হারা পথিকের মত। সমর যদি এখন তার বাড়ীতে আসে, সে বুঝিয়ে দিতে পারে, সে কি ভুল করছে। সত্যিই কি সমর গভর্নমেণ্টের কাজ নেবে, নিজেকে বাঁচাবার জন্ত!

মালতীর দুই চোখ ফেটে জল এল। শুভ্রমলিন গণ্ড দিয়ে দীর্ঘ চোয়াল বেয়ে অশ্রুবিন্দু ঝরে পড়ল গ্রীষ্মের বিশুদ্ধ অপরাহ্ণে বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটার মত।

মালতী আর ভাবতে পারলে না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

—বহিন!

মালতী চমকে চাইলে।

গাড়ীর অপর প্রান্তে জানালার ধারে একটি হিন্দুস্থানী মেয়ে বসে, তার চোখে পড়েনি। যেন একগাদা রঙীন ঘাঘরা ও ওড়না কুণ্ডলী পাকিয়ে পড়ে আছে।

ঘোমটার লম্বা ঢাকা মুখের ওপর থেকে সরিয়ে মেয়েটি এতক্ষণ জানালা দিয়ে রৌদ্রদীপ্ত বনপ্রান্তরের দিকে চেয়েছিল, আলো-ভরা বিশ্বপ্রকৃতির এ মুক্তরূপ সে বোধ হয় তার প্রাচীর-ঘেরা বাড়ীর ছোট জানালাগুলি দিয়ে দেখতে পায় না। দুই চোখ ভরে সে চলন্ত পথদৃশ্য দেখছিল।

কান্নার শব্দ শুনে সে ফিরে তাকাল। মালতীর কান্না দেখে তার মনে পড়ল, বাড়ীতে তার ছোটবোন বোধ হয় তার জন্যে এমনি কাঁদছে। আবেগের সঙ্গে সে মৃদুস্বরে ডাকলে, বহিন!

বিস্মিত হয়ে মালতী হিন্দুস্থানী মেয়েটির দিকে চাইলে। কি সরল স্নিগ্ধ কালো চোখ! একটু ভীত সলজ্জভাবে সে চেয়ে আছে। হাত-ভরা চাঁদির গহনা, কানেতে রূপার ফুল। খয়েরি রঙের মোটা কাপড়ের ঘোমটার ফাঁক দিয়ে সিঁথির সিঁদুর জল্‌জল্‌ করছে।

চোখ মুছে মালতী মুগ্ধ হয়ে তার দিকে চাইলে। এই ত সত্যিকার ভারতের মেয়ের রূপ। এ ত ফরাসী সিল্কের ব্লাউজ-পরা ইবসেন-তুর্গেনিভ-পড়া মেয়ে নয়। এদের দেখতে, এদের সুখদুঃখের কথা

জানাতেই ত মালতীর এই নিরুদ্দেশ যাত্রা। সমর এসে একবার এই মেয়েদের দেখুক।

মালতী উঠে দাঁড়ালে, একটু এগিয়ে এল। উৎসাহের সঙ্গে সে বলে উঠল, বহিন! তারপর সে হেসে উঠল। হিন্দি সে একেবারে জানে না। কি ভাষায় সে কথা বলবে? তার ভুল ভাঙা হিন্দি শুনলে মেয়েটি নিশ্চয় পরিহাস করবে।

মালতী তার বেঞ্চেতে বসে মৃদু হাসতে লাগল। এ মূক হাস্তে মেয়েটি ভয় পেলে। মুখের উপর সে ঘোমটা টেনে দিলে, তারপর মুখ ঘুরিয়ে চেয়ে রইল বাইরের প্রান্তরের দিকে।

মালতী চুপ করে বসে ভাবতে লাগল, পশ্চিমভারতের এ মেয়েটি হতে সে কত পৃথক, কত দূরে!

জব্বলপুর স্টেশনে ট্রেন এসে থেমেছে।

সমর বললে, আমি এখন যাই, দিদি।

অনুপমা বাধা দিয়ে বললে, না, না, বোস্, উনি এ স্টেশনে আসবেন, পরিচয় করিয়ে দিই। চা খাবার সময় হল।

সমর হেসে বললে, বেশটা ঠিক গভর্ণমেণ্টে চাকরির দরখাস্ত পেশ করবার মত নয়।

দরজার খড়খড়ি ফেলে অনুপমা প্ল্যাটফর্মের দিকে চেয়ে বললে, ওই উনি আসছেন! কিন্তু গাড়ীর ভেতর মুখ ফিরিয়ে সে দেখ্‌লে, সমর নেই। পলকের মধ্যে সে অন্তর্হিত। একটা ব্যঙ্গহাস্তের শব্দ জানলা দিয়ে ভেসে এল।

কুপেতে প্রবেশ করে জগদীশ অনুপমার ললাটে হাত দিয়ে দেখলে জ্বর এসেছে কি না, তারপর শ্রান্ত হয়ে অনুপমার পাশে বসে পড়ল। তার গম্ভীর মূর্তি অনুপমার ভাল লাগল না।

বিরক্তির সঙ্গে অনুপমা বললে, তোমাদের পরামর্শ শেষ হল?

স্থির দৃষ্টিতে অনুপমার দিকে চেয়ে জগদীশ বললে, হোল আর কৈ? চা খাবার ছুটি নিয়ে এসেছি।

—আবার যেতে হবে সেলুনে?

—হ্যাঁ, শোন, তুমি আর কিছুক্ষণ একা থাকতে পারবে?

—মোটেই নয়। এক মুহূর্তের জন্যও নয়। তোমার সাহেবের অত গল্প করবার থাকে, এগাড়ীতে এসে করতে পারেন।

—দেখ, অবুঝ হোয়ো না। Situation-টা তুমি বুঝছ না।

—সিচুয়েসন্ আমি জানতে চাই না, আমি শুধু জানি তুমি এখন ছুটিতে আছ।

—আচ্ছা, আগে চা খেয়ে নেওয়া যাক্। কি খাবে আর?

—শুধু এক কাপ চা, আর কিছু খাব না।

—রাগ কর কেন। তোমার জন্য চিকেন-প্যাটি আনতে বলেছি। আচ্ছা, মালতী ত ছিল এ-গাড়ীতে, আর মিস্টার ঘোষ, সব গেলেন কোথায়?

—তারা কি তোমার স্ত্রীকে আগলাবার জন্যে ট্রেনে চলেছে।

—মালতীকে ডেকে দি তোমার গাড়ীতে। চা খেয়ে গেলে ডিনারের আগে ছুটি পেতে পারি।

—তা না হলে সাহেবের সঙ্গেই রাত কাটাতে হবে না কি!

—বোঝ না, duty first.

—করোগে তোমার duty. আমি একাই থাকতে পারব, মালতীকে ডেকো না। ডাকলেও সে আসবে না।

বিস্মিত ভাবে জগদীশ অনুপমার দিকে চাইলে। জগদীশের দিকে কটাক্ষপাত করে অনুপমা হাসলে।

এ রহস্যময় হাস্যোদ্ভাসিত অপরূপ মুখের দিকে চাইলে জগদীশের রক্ত ঝিল্‌মিল্‌ করে ওঠে।

বয় টোস্ট, চা, প্যাটি, কেক সব দিয়ে গেল। পেয়ালায় চা ঢালতে ঢালতে অনুপমা বললে, শোন, তোমার সঙ্গে বিশেষ কথা আছে।

চিকেন-প্যাটি দাঁত দিয়ে চিবোতে চিবোতে জগদীশ বললে, fine করেছে, একটা খাও তুমি আগে!

জগদীশের কালো কদাকার মুখের উপর জল্‌জ্বলে চোখে চেয়ে অনুপমা ধীরে বললে, শোন, আমার এক ভাই এই ট্রেনে যাচ্ছে।

জগদীশ হেসে বললে, তোমার ভাই! আমার সম্বন্ধী বল—তোমার ভাই আছে বলে ত জানতুম না। জগদীশ আর একটা প্যাটি মুখেতে পুরলে।

জগদীশের হাসির ভঙ্গীতে অনুপমার ভয় হল। উদ্বিগ্নকণ্ঠে সে বললে, সে আমার ভাই, আমাকে দিদি বলেছে; আমি বলেছি, আমি থাকতে তার কোন ভয় নেই। তার কোন বিপদ হবে না।

এক চুমুক চা খেয়ে জগদীশ বললে, বিপদ হবার আশঙ্কা আছে নাকি?

অনুপমা ক্ষুব্ধস্বরে বললে, দেখ, আমার ভয় দেখিও না; তুমি নিশ্চয় জানো, রিপোর্ট পেয়েছ।

জগদীশ হেসে বললে, তুমিও যে রিপোর্টারদের দলে রয়েছ, তা জানতুম না।

অনুপমা বললে, তাকে আমি অভয় দিয়েছি। তোমাকে বাপু অত সাধতে পারি না—তাকে একটা কাজ দিতে হবে।

জগদীশ বললে, বরাভয়দায়িনি, যদি অভয় দিলে, তবে আমার ভয়ে সে এ কুপে ছেড়ে চলে গেল কেন?

অনুপমা উত্তেজিত হয়ে বললে, তোমার ভয়ে যায় নি। ভয় তারা জানে না!

জগদীশ এবার উচ্চস্বরে হাস্য করে উঠল।

—ভয় যদি জানে না, তা হলে তুই মহিলার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করতে আসে কেন?

—সে আসেনি, আমি বলেছিলুম আসতে।

—বেশ. তুমি রক্ষা করার দায়িত্ব ত নিয়েছ।

—তুমি বাঁচাবে না, তুমি কাজ দেবে না! আমি যে তাকে বলেছি—

অনুপমার হাত কেঁপে খানিকটা চা কাপ হতে ছল্‌কে পড়ে গেল শাড়ীতে।

—আমি কি বলেছি কাজ দেবো না, অস্থির হোচ্ছ কেন?

—বেশ, দরকার নেই তোমার কাজে, শুধু বোম্বে পর্যন্ত তাকে নিরাপদে যেতে দাও।

জগদীশ হেসে বললে, এতখানি পথ যখন নিরাপদে আসতে পেরেছে, তখন বাকিটুকুও যেতে পারবে; কোন ভয় নেই। তবে তার আর একটা বড় বিপদ ঘনিয়ে আসছে—একটা প্যাটি খাও।

—সে বিপদ কি?

—সোশিয়লিজম্ ও সুন্দরী নারীর মধ্যে কোনটা বেশি ভয়ঙ্কর দেখা যাক!

—দেখ, সব বিষয়ে পরিহাস কোরো না।

অনুপমা স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। এ গম্ভীর স্তব্ধতা অকস্মাৎ আঘাতের মত জগদীশকে দূরে ঠেলে দেয়। রহস্যময় সৌন্দর্য-আবরণের সৃষ্টি করে।

পরম বিস্ময়ে জগদীশ অনুপমার দিকে চাইলে।

যে অপরূপ নারীসৌন্দর্যে সে মন্ত্রমুগ্ধ, সে মায়াজালে এ সোসিয়লিস্ট যুবকও ধরা পড়েছে। অলৌকিক এর শক্তি।

জগদীশ বললে, ওগো, তোমার ভাইকে আমি ভাল কাজ দেব। সত্যিই সে সোসিয়লিজম্ ছেড়ে দেবে?

অনুপমা কোন উত্তর দিলে না। চা-ভেজা শাড়ীটা ছাড়তে সে উঠল। তার মন ভারী হয়ে উঠেছে! সমর যে পথে চলেছে, সেই পথেই হয়ত তার জীবনের সার্থকতা। স্বপ্ন-ভরা দুরন্ত প্রাণ-ভরা তরুণের জীবন নিয়ন্ত্রিত করবার অধিকার বা শক্তি তার আছে কি?

মিস্ মল্লিক, কাকে খুঁজছেন!

মালতী চমকে চাইলে। তার সামনে কল্যাণকুমার, ঠোঁটের কোণে তির্যগভাবে লাগান পাইপ থেকে ঈষৎ ধূম উদ্‌গীর্ণ হচ্ছে।

জব্বলপুর স্টেশনে ট্রেন থামতে মালতী প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়েছে। মনে ক্ষীণ আশা আছে, সমরের দেখা পেতে পারে। সমর হয়ত আর ছদ্মবেশে থাকবে না। অনুপমার কুপের দিকে যেতে তার ইচ্ছা হচ্ছিল না। সমরকে সে একা চায়। সমরের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতে চায়।

মুখ হতে পাইপ নামিয়ে কল্যাণ বললে, আপনি কাউকে খুঁজছেন মনে হচ্ছে।

মালতীর মুখ রাঙা হয়ে উঠল। অপরাহ্নের আলো সে রক্তিম মুখে এসে পড়ল। যেন কোন বিকাশোন্মুখ পুষ্পের পাপড়িতে রঙ লাগল।

ম্লান হেসে মালতী বললে, বিশেষ কাউকে খুঁজছি না।

ওলের মত বড় ভারী মাথাটা নেড়ে কল্যাণ বললে, সেই-ত আরও মুশকিল, লক্ষ্য যেখানে স্থির, সন্ধান করতে সেখানে দেরি হয় না, আমরাও সাহায্য করতে পারি; কিন্তু এই যে নির্বিশেষ থেকে বিশেষকে নির্বাচন করা, নিরুদ্দেশে বার হয়ে উদ্দেশ্য খোঁজা, এ অবস্থাটা বেদনাময়।

আয়তনয়নে মালতী কল্যাণের দীপ্ত চোখের দিকে চাইলে; পাইপের ধূম্রজালে গৌরবর্ণ মুখকান্তি আচ্ছন্ন। কল্যাণ কি পরিহাস করছে!

মালতী হাস্যের সুরে বললে, আপনার কি সেই অবস্থা নাকি?

পাইপটা পরিষ্কার করতে করতে কল্যাণ বললে, অবস্থাটা কি ঠিক বুঝতে পারছি না, মিস্ মল্লিক। চেষ্টাও করি না। তবে এটা বুঝছি, চা খাবার সময় হয়েছে, চায়ের তৃষ্ণাও জেগেছে, কিন্তু একা খেতে যেতে ইচ্ছা করছে না, একা বসে আমি চা খেতে পারি না, বিশেষত বিকেল বেলা।

মালতী গম্ভীর ভাবে বললে, একা খেতে হবে কেন, যিনি নিমন্ত্রণ করেছেন তিনি সঙ্গে খাবেন।

বিস্ময়ের সুরে কল্যাণ বললে, নিমন্ত্রণ? কৈ আমি ত জানি না। এই দেখুন, আমার নিমন্ত্রণ, আমি নিজে জানি না, এমনি করে জীবনের বড় বড় সুযোগ সুবিধেগুলো হারাই—কে নিমন্ত্রণ করেছে?

—কেন, অনুপমা দিদি !

—অনুপমা ! কৈ, মনে ত পড়ছে না। আপনাকেও বোধ হয় করেছে।

—আমাকে বলেছিল, কিন্তু আমি যাব না।

—আর আমাকে হয়ত বলেছিল, আমি ভুলে গেছি। এ ভালই হয়েছে। চলুন, তার চেয়ে রেস্তোরাঁ-কারে গিয়ে চা খাওয়া যাক্—আপনি রাজী মিস্ মল্লিক !

—চা খেতে আমার বিশেষ ইচ্ছে নেই।

—আবার বিশেষ ইচ্ছার কথা তুললেই মুশকিল হয়। ইচ্ছাটা এখন অবিশেষই থাক, যখন বিশেষ রূপ ধরে উঠবে, জানাবেন। চলুন, মিস্ মল্লিক, এখন গাড়ীতে একা বসে চা খেতে হ'ল মন বড় খারাপ হয়ে যাবে, ভাবব, পৃথিবী জুড়ে, ট্রেন ভরে এত নরনারী, অথচ চা খাবার একজন সঙ্গীও আমার নেই।

—সেটা ত সহজেই করতে পারেন—সব সকাল-বিকেলের চা-খাবার সঙ্গী—আপনাকে চা তৈরি করে খাওয়াবে।

পাইপে অগ্নিসংযোগ করে কল্যাণ বললে, আপনি কি বলতে চান, বুঝতে পারছি। দেখুন, অত বড় লোভ আমি করি না, সেজন্যে ঠকিছিও বার বার—আজ বিকেলে যে আপনার সঙ্গে চা খেতে পাচ্ছি, এই আনন্দ কণাটুকুই চাই, চিরদিনের অসীম আনন্দের দাবি করতে সাহস হয় না।

মালতী বলতে চাইলে, আপনি আমার কথা কিছুই বুঝছেন না, এ সব কি বলছেন—কথার রঙীন জাল রচনা করছেন। কিন্তু সে কোন কথা বলতে পারলে না। পাণ্ডুর আনন রক্তোচ্ছ্বাসে অরুণ। নীরবে সে কল্যাণের সঙ্গে রেস্তোরাঁ-কারের দিকে চলল। কল্যাণ যেন তাকে

টেনে নিয়ে চলেছে। স্টেশনের কুলী-বেশি সময় তার পাশ দিয়ে চলে গেল, সে চিনতেও পারল না।

রেস্তোরাঁ-কারে টেবিলে দু'জনে মুখোমুখি বসল।

গণেশ ঘুমিয়ে পড়েছে।

শিপ্রা ও দেবপ্রিয় তাস খেলে চলেছে। স্টেশনের পর স্টেশন চলে যাচ্ছে, তাদের খেয়াল নেই।

হঠাৎ তাসগুলো ছড়িয়ে ফেলে শিপ্রা বললে, শুনুন দেবপ্রিয়বাবু, আপনি আমায় সাহায্য করবেন, কথা দিয়েছেন।

বিস্মিত হয়ে দেবপ্রিয় বললে, কথা দিয়েছি বটে, কিন্তু কি করতে হবে জানাননি ত।

গম্ভীরভাবে শিপ্রা বললে, ব্যাপারটা সহজ নয়।

শিপ্রার স্বর্ণ-কঙ্কণের দিকে চেয়ে দেবপ্রিয় বললে, আপনার উপযোগী কোন সিনেমা-গল্প লিখে দিতে হবে, যাতে আপনার অভিনয়-নৈপুণ্য প্রকাশিত হয়,—আমি কখনও গল্প লিখিনি—তবে চেষ্টা করতে পারি।

—সিনেমা-গল্প নয়, জীবনের গল্পরচনায় যোগ দিতে হবে।

—কার জীবনের?

—আমার।

—আপনার! আমি ত আপনার জীবন লিখতে ব্যগ্র।

—পুরাতন জীবন নয়, নতুন জীবন গড়তে হবে। আচ্ছা, দেবপ্রিয়-বাবু, আমাকে দেখে আপনার কি মনে হয়?

—বেশ ভালই মনে হয়।

—হতে পারি আমি এ্যক্‌ট্রেস্‌, তা বলে আমি খারাপ মেয়ে ত নই।

—কে বলে আপনি খারাপ!

আবেগের সঙ্গে দেবপ্রিয় দাঁড়িয়ে উঠল। শিপ্রার নিন্দুককে সে বুঝি মুষ্টিযুদ্ধে আহ্বান করবে।

—বসুন, স্থির হয়ে। শুনুন আমার কথা, আপনি পণ্ডিত মানুষ, বুঝতে পারবেন।

—আমি বুঝতে পারছি, এই এ্যক্‌ট্রেসের লাইফ আপনার ভাল লাগছে না, আপনি চান সহজ সরল জীবন, শান্ত গৃহকোণ—

—ঠিক বলেছেন, আপনি পণ্ডিত লোক, সহজেই বুঝতে পারলেন, আর এই কথা অন্য লোকদের বললে—হাসে। তবে এ্যক্‌টিং করতে ভাল লাগে না, বলতে পারি না। দেখুন না থিয়েটারে এ্যক্‌টিং করতুম, এখন ফিল্মে এ্যক্‌টিং করতে চলেছি—বেশ একটা উত্তেজনা, আনন্দ আছে বই-কি—কিন্তু এতে ত সমস্ত মন ভরে না।

—বলুন, হৃদয় ভরে না। আপনি চান ভালবাসা—হৃদয় পেতে চান।

—ভালবাসা! জানি না সত্যি ভালবাসা কি—স্টেজে কত ভালবাসার অভিনয় করেছি, কিন্তু আমাদের জীবনটা কি দেখুন।

—জীবনে ভালবাসা পেতে চান। আপনি স্টেজে যে প্রেমের অভিনয় করেন, জীবনে তা সত্যরূপে পেতে চান, আর আমরা জীবনে যে প্রেমের বেদনা পাই, তা ভুলতে মিথ্যার অভিনয় দেখতে যাই।

—দেখুন, আপনার হেঁয়ালি বুঝলুম না।

—জীবনটা যে একটা হেঁয়ালি।

—হেঁয়ালির সমাধান করবার এখন সময় নেই, আমার কথাটা শুনে নিন—গণেশবাবু এখনি জেগে উঠতে পারে।

—এর মধ্যে গোপনীয় কি আছে?

—আপনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। আপনার সঙ্গে যা পরামর্শ করতে চাই, সে-ত গণেশবাবুর সম্বন্ধেই।

—গণেশবাবুর সঙ্গে আপনার কি সম্বন্ধ আমি ত জানি না।

—কি সম্বন্ধ মনে হয়।

—দেখুন, যা জানি না, সে বিষয়ে অনুমান করতে পারি, কিন্তু তা বলা উচিত নয়।

—আপনি বলুন। আমি তার জন্যে দুঃখিত বা লজ্জিত হব না।

—আপনারা দু'জনে বন্ধু!

—বন্ধু! বা বেশ বলেছেন, গণেশবাবুকে জাগিয়ে শোনাতে ইচ্ছে করছে।

—গভীরভাবে ভেবে দেখুন, আপনার মধ্যে শুধু কামনার যোগ নয়, শুধু লালসার নয়, তার চেয়ে গভীর যোগ রয়েছে—এ যোগে দু'জনের আত্মা আনন্দ পাচ্ছে।

—আত্মা! লোকে যে বলে, এ্যাক্‌ট্রেসের আবার আত্মা!

—তা হলে, কাল রাতে কে কাঁদছিল আপনার হৃদয়ে বসে? সে কি আপনার অশান্ত অতৃপ্ত আত্মা নয়!

—আপনি আমাকে কাঁদতে দেখেছিলেন!

—সেই সময়ে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেছল। মনে হল, কে যেন কাঁদছে, সে কান্না যেন পৃথিবীর বুক থেকে আসছে।

—মাঝে মাঝে আমার কেমন মন খারাপ হয়ে যায়, কিছু ভাল লাগে না—আমি অমন কাঁদি—ওটা বোধ হয় আমার একটা অসুখ। তারপর লজ্জা হয় সে কথা ভাবলে।

—আমারও ত কিছু ভাল লাগে না, কিন্তু আমি ত অমন কাঁদতে পারি না।

—কি পাগলের মত বকছেন, আপনি যে পুরুষ মানুষ, কাঁদবেন কি! তবে গণেশবাবু মাঝে মাঝে খুব মাতাল হয়ে গেলে, হঠাৎ কাঁদতে বসে।

—না, কাঁদবার জন্যে মাতাল হতে রাজী নই।

—দেবপ্রিয়বাবু, আপনি সুখী নন, বুঝতে পারছি।

—সুখ জীবনের কাম্য নয়, বেদনাকে ভয় করি না। কিন্তু এই যে মহারহস্য, এর কোন সন্ধান পাওয়া যায় না, জীবনের সব জটিল প্রশ্নের কোন উত্তর মেলে না- থিওরীর পর থিওরী গড়ি—কেন দুঃখ, কেন অবিচার অত্যাচার, কেন ব্যাধি—সমস্যার সমাধান নেই—বলতে পার—এ অশান্তি—

—দেবপ্রিয়বাবু, ভুলে যান কেন, আমি এসব বিষয়ে অজ্ঞ। শুনুন, আসল কথাটা বলা হচ্ছে না।

চশমার কাচ মুছে দেবপ্রিয় কালো চশমাটা পরলে। বহির্জগতের ওপর কালো রং ঢেলে দূরে সরিয়ে সে যেন অন্তরজগতে বাস করতে চায়।

দেবপ্রিয় দেখলে, ঘুমন্ত গণেশের দিকে শিপ্রা স্থিরনয়নে চেয়ে আছে। কি ব্যাকুল মমতা সে দৃষ্টিতে! দেবপ্রিয় চমকে উঠল!

তত্ত্বজিজ্ঞাসুর মত দেবপ্রিয় বললে, আপনি গণেশবাবুকে বিবাহ করতে চান?

সোনার চুল দুলিয়ে শিপ্রা হেসে উঠল, কোন উত্তর দিলে না।

দেবপ্রিয় বললে, আর গণেশবাবু রাজী নন, সেজন্য আপনি আমার সাহায্য চাইছেন, তাঁকে রাজী করাতে।

বিস্মিতভাবে শিপ্রা দেবপ্রিয়ের মুখের দিকে চাইলে, কে বললে এসব কথা?

—এই কথাগুলি বলবার জন্যে আপনি এতক্ষণ চেষ্টা করছিলেন ?

—আপনি সাংঘাতিক লোক !

—এ বিষয়ে ভেবে আপনাকে বলব।

—কি ভাববেন ? এত ভাবেন কেন ?

—সাহায্য করা উচিত হবে কি না—অর্থাৎ আপনার বিবাহ করা—

বাধা দিয়ে শিপ্রা ক্ষুব্ধস্বরে বলল, উচিত কি না ! চাই না আপনার সাহায্য। আবেগের সঙ্গে শিপ্রা দাঁড়িয়ে উঠল, ক্রোধে তার দুই চোখ জলে ভর-ভর।

দেবপ্রিয় হতাশভাবে বসে রইল। অনেক বইয়ে পড়েছে, অভিনেত্রীদের মনের অবস্থা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তনশীল। দৃষ্টান্ত তার সম্মুখে।

রেস্তোরাঁ-গাড়ীতে চা খাওয়া শেষ হয়ে গেছে।

একটা ছোট স্টেশনে গাড়ী থামতে মালতী টেবিল ছেড়ে ওঠবার চেষ্টা করলে।

কল্যাণ তাকে বাধা দিয়ে বললে, আর একটু গল্প করা যাক, বসুন। তাড়া কিসের ?

বয়কে আর এক পট্ চা আনতে বলে কল্যাণ বললে, চতুর্থ কাপ হোক!

মালতী হেসে বললে, মোটেই না। আপনি কি চা খেতেই পারেন !

—সত্যেন দত্তের সেই চীনে কবিতার অনুবাদ মনে পড়ে, 'প্রথম পেয়ালা কণ্ঠ ভেজায়'—আমি বোধ হয় গতজন্মে চীনে ছিলুম।

—এবার মগজে মুকুতা মানিক তুলবে ?

—দেখুন মিস্ মল্লিক, আজ বড় ফুর্তি করে চা খাচ্ছি—ভাববেন না ফ্লাটারি, বড় ভাল লাগছে আপনাকে।

—কথাগুলো ইংরেজীর অনুবাদ বলে মনে হচ্ছে।

—এতদিন ইংলণ্ডে থেকে বোধ হয় ইংরেজী ভাষায় ভাবি।

—অথবা, ইংরেজ মেয়েদের ওই সব কথা বলে এমন অভ্যাস হয়ে গেছে যে, দেশের মেয়েদেরও ভুলে বলে ফেলেন।

—আপনার কি সত্যিই একথা মনে হচ্ছে ?

মালতী কোন উত্তর দিতে পারলে না। চা-খাওয়া খালি পেয়ালার মধ্যে অকারণে একটা চামচ নাড়তে লাগল।

—দেখুন মিস্ মল্লিক, আপনার সাহসিকতায় আমি মুগ্ধ। এই যে একা বেরিয়ে পড়েছেন—দেশের তারুণ্যের জয়যাত্রা দেখছি আপনার মধ্যে।

—অত বড় বড় কথা বলবেন না, লজ্জা করে। আপনি ত কত দেশ ঘুরেছেন।

—বলেন ত আর একবার ঘুরতে পারি আপনার সঙ্গে, আমাকে গাইড করলে ঠকবেন না।

অপরাহ্নের আলো-ভরা স্তব্ধ বনানীর দিকে চেয়ে মালতী দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। মনে পড়ল সমরের সঙ্গে তার আর ইয়োরোপ যাওয়া হবে না, বোধ হয় বোম্বে হতেই বাড়ী ফিরতে হবে।

আনমনা মালতীর দিকে কল্যাণ মুগ্ধব্যাকুল চোখে চেয়ে রইল। বড় জানতে ইচ্ছে করল, কি ভাবছে সে। হয়ত, এই সন্ধ্যার পৃথিবী তার চোখে সুন্দর লাগছে, মধ্য-ভারতের এ ঘন অরণ্যের রহস্যরূপে সে চকিতা।

মালতীর আয়ত নয়নের করুণব্যাকুল দৃষ্টি কল্যাণের তীক্ষ্ণচক্ষুর দীপ্ত-

কালো তারকায় গিয়ে কখন পড়ল মালতী তা জানতে পারল না। এ সম্মোহনের মত।

—আপনি কি আবার ইউরোপে যাবেন? এই ত এলেন কত বছর পরে।

—দরকার হলে আবার যেতে পারি!

—এখন কি দরকার?

—ধরুন, আপনি আমাকে প্রদর্শকরূপে নিযুক্ত করলেন।

—কি যে বলেন! ইচ্ছা হয় ইউরোপে যেতে। একটি ছেলের সঙ্গে প্ল্যান করেছিলুম—সে প্ল্যান ভেস্তে গেল।

—একজনের সঙ্গে প্ল্যান হল না বলে আর একজনের সঙ্গে হবে না? আপনি সাহসিকা. life নিয়ে experiment করতে ভয় পাবেন কেন?

—না, ভয় করব না। Life is an experiment, ইংরেজীতে বললে বেশ শোনায়, কিন্তু তার বাংলা করে 'পরীক্ষা' বললেই ভয় করে।

তা হলে ফোর্থকাপ্ হোক, বলে সমর মালতীর শূন্য পেয়ালায় চা ঢেলে ভরে দিলে।

প্রায়ান্ধকার সান্ধ্য পার্বত্যশ্রীর দিকে মালতী দীপ্ত নয়নে চেয়ে রইল। তার বুক দুরদুর করছে। চুপ করে সে বসে রইল। কল্যাণের মুখের দিকে চাইতে পারলে না।

পাইপে তামাক ভরতে ভরতে কল্যাণ বললে, আপনি বিশ্বাস করছেন না আমার কথা? কথাগুলো সহজসুরে বলি, সেজন্য আমাকে কোন মেয়ে সিরিয়স্ ভাবে না—

রঙীন দিগন্তের দিকে চেয়ে মালতী বললে, আমি আপনাকে খুব সিরিয়স ভাবছি। কিন্তু ভেবে দেখুন, আপনার সঙ্গে আমার পথের ক্ষণিক আলাপ, আপনি আমাকে কিছুই জানেন না।

পাইপটা টেবিলে রেখে কল্যাণ বললে, জানার ত এক জায়গায় শুরু হবে মিস্ মল্লিক, সে পথেই হোক আর বিপথেই হোক। আর এ জানার যে শেষ নেই—এ অশেষের পারচয়—

—বুঝতে পারছি কেন লোকে আপনাকে সিরিয়স ভাবে না। কথার কৃত্রিম জালে আপনি মনের আসল কথা ঢেকে রাখেন।

—আশ্চর্য! এই কথাগুলি আমাকে এক ফরাসী মেয়ে বলেছিল, প্যারিসের কোন কাফেতে। বুঝতে পারেন না কি, মনের অধিক অংশটা অব্যক্ত, আমার কাছে ত অজ্ঞাতই মনে হয়, কথার ঘোমটা পরে সে বসে থাকে!

—আমি খুব স্পষ্টভাবে ভাবতে চাই, আর খুব সহজ স্পষ্ট করে তা বলতে ভালবাসি।

—কিন্তু তা কি সম্ভব? ওই যে শুকতারা শুভ্র পুষ্পের মত অন্ধকার দিগন্তে ফুটে উঠল, দিনের আলোয় কে ভাবতে পেরেছিল, ওই তারা ছিল ওখানে? মনের আকাশে তেম্নি হঠাৎ কোন সুখ, কোন কথা জেগে উঠে আপনার চমক লাগিয়ে দেয় না কি? অথচ সে সুখ সে ব্যথাকে ভাষায় ব্যক্ত করবার চেষ্টা করলে ওই শুকতারার মত কোন্ অসীম অতল অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

পাইপটা মুখে তুলে কল্যাণ চুপ করলে।

স্তব্ধ বনপ্রান্তে শুকতারার দিকে মালতী চেয়ে রইল।

অনুভব করলে কোন্ গভীর আনন্দ, শান্তি, ব্যাকুলতায় হৃদয় ভরে আসছে, এ অনুভূতির ভাষা বুঝি নেই। শুধু চুপ করে দু'জনে কাছাকাছি বসে থাকা।

৯

পশ্চিম দিগন্তের অন্ধকারে শুকতারা মিলিয়ে গেছে, হঠাৎ নিভে-যাওয়া প্রদীপের মত। এখনও চাঁদ ওঠেনি। চারিদিকে মায়াময় অন্ধকার।

খোলা জানলার ওপর রঙীন কুশন রেখে অনুপমা এলিয়ে শুয়ে পড়েছে। অর্দ্ধকার কুপেতে সে একা। বাহিরে আকাশের অন্ধকার গাড়ীর ভেতরের অন্ধকারের মত এত গাঢ় নয়। মাঝে মাঝে তারা ফুটে উঠছে। নিম্নভূমিতে মধ্যভারতের ঘন বনানীর তিমির-স্রোত।

দিনের নানা ঘটনায় মানসিক উত্তেজনায় সে শ্রান্ত। কিন্তু এ দৈহিক ক্লান্তিতে অন্তর আরও উদ্দীপিত হয়ে উঠেছে। বল্‌গা-ছেঁড়া উন্মত্ত অশ্বের মত উদ্দাম চিন্তার স্রোত ছুটে চলেছে, মাথা টন্‌টন্‌ করছে। এ চিন্তার গতিরোধ করবার শক্তি তার নেই।

প্রবল বায়ুস্রোতের দিকে মুখ করে চোখ বুজে অনুপমা ভাবছিল। কিছু ভাবতে সে চায় না, কে যেন তার মাথার ভেতর বসে ভেবে চলেছে।

অনুপমা ভাবছিল, যদি তার অসুখ না হত। আবার কখনও ভাবছিল, তার কোন অসুখ হয়নি; মালতীর মত সে তরুণী, প্রাণে-ভরা।

আবার ভাবছিল, জগদীশের সহিত যদি তার বিবাহ না হত, তা হলে এখন সে কি ভাবে থাকত, কি কাজ করত? হয়ত সে গান্ধী-শিষ্যা হয়ে জেলে যেত, অথবা কোন বিদ্রোহী দলে মিশত, সমরের মত সোসিয়লিস্ট হয়ে বক্তৃতা দিত, অথবা জীবিকার্জনের জন্য কোন স্কুলে শিক্ষয়িত্রীর কাজ নিত।

জীবনটাকে ভেঙেচুরে নতুন করে গড়তে ইচ্ছে করে।

যদি তার বাবা হঠাৎ মারা না যেতেন; যদি তিনি এখন বেঁচে থাকতেন। হয়ত, কল্যাণের সঙ্গে তার বিবাহ হত, অথবা সে কাউকেই বিবাহ করত না। মালতীর মত ভ্রমণে বার হত।

ভাল লাগে না ভাবতে, তবু সে ভেবে চলেছে।

সম্মুখে স্নিগ্ধ ঘন অন্ধকার; সৃষ্টির পূর্বের আদিম অন্ধকারের মত গম্ভীর রহস্যময়, প্রলয়ের অন্ধকারের মত ভীষণ, ধ্বনিবহুল। এমনি কোন রাত্রির অন্ধকারে সন্ধ্যার শুকতারার মত সে মিলিয়ে যাবে। তারপর কোন নবলোকে নবপ্রভাতে নবজন্ম হবে কি?

কেন বাঁচতে সাধ যায়? পৃথিবী কি এমনি সুন্দরী যে বার বার দেখতে ইচ্ছে করে, জীবন কি সত্যই সুখময় মধুময় যে এত ব্যর্থতা এত বেদনা ভোগ ক'রেও ত্যাগ করতে ইচ্ছা হয় না?

হয়ত সে কোন অজানা ক্রীড়কের হস্তের পুত্তলিকা; বেঁচে থাকবার কামনা ক্রীড়াকারীর ইচ্ছায় চিরজাগ্রত, আর সকল দুঃখজ্বালা ভোগ, হৃদয়ের সকল বেদনা তার প্রাপ্য।

সে হবে বিদ্রোহিনী। কিন্তু কার বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করবে? রাষ্ট্র, সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যায়, আইন অমান্য করে বিপ্লবের বাণী প্রচার করে যুদ্ধ করে বিদ্রোহ করা যায়। কিন্তু এ অজানা শক্তির বিরুদ্ধে কি করে সে বিদ্রোহ করবে? আত্মহত্যা করে যেখানে বিদ্রোহ করতে হয় সে বিদ্রোহে লাভ কি? এ জীবন ত্যাগ করবার জন্য নয়, এ মানব-জীবন আরও পূর্ণরূপে উপভোগ করবার জন্য সে হবে বিদ্রোহিনী।

অনুপমা চোখ মেলে উঠে বসল।

সম্মুখে দিগ্বলয়ে অন্ধকার কেটে গেছে। স্বপ্নতরীর মত শুভ্র চন্দ্রমা অন্ধকারসমুদ্রে পাড়ি দেবার জন্য যাত্রা শুরু করেছে।

অনুপমা হেসে উঠল, তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেললে। হাসতে গিয়ে বুকে একটা ব্যথা খচ্‌খচ্‌ করে উঠেছে। কাশির বেগ আসে বুঝি। চাঁদের আলোয় চাইতে আর ইচ্ছা হল না। আবার সে চোখ বুজে শুয়ে পড়ল। সে অনুভব করতে চাইল, অসীম অন্ধকারে সে ছুটে চলেছে, অনন্তব্যোমে কক্ষচ্যুত কোন তারকার মত, সংঘাতে বিপ্লব, নবসৃষ্টি হবে।

একটি ছোট স্টেশনে ট্রেন থেমেছে ক্ষণকালের জন্য। নিঃশব্দে কে একজন কুপের দরজা খুলে প্রবেশ করলে। তার দীর্ঘ দেহের ছায়া জানলার ফ্রেমে-বাঁধান আকাশটুকু ভরে দিলে। প্রবেশ করেই আগন্তুক কুপের আলো জেলে বাইরের অন্ধকার দূর করে দিলে। সবিস্ময়ে চকিতভাবে অনুপমা চেয়ে দেখলে, এ সমর নয়, কল্যাণও নয়, এক অজানা সন্ন্যাসী।

অনুপমা ভয় পেলে না। হাঙ্গেরীয় ব্লাউজের উপর কটকী শাড়ীর রঙীন চওড়া আঁচলা টেনে মৃদু হাসলে। অজানা ক্রীড়কের কোন নতুন খেলা বুঝি শুরু হবে।

লজ্জিতভাবে প্রেমদাস বললেন, আমি যে গাড়ী ভুল করে ফেললুম, দেখছি, মা! এ যে বড় অন্যায় হল।

অনুপমা হেসে বললে, এ অন্যায় আপনার স্বেচ্ছাকৃত নয়, আপনি বসুন। গাড়ী চলতে আরম্ভ করেছে, এখন নামবার চেষ্টা করবেন না।

—এ যে বড় ভুল করলুম।

—ভুল আপনি করে থাকতে পারেন, কিন্তু এ ম্যারিয়নেটের অভিনয়ে দড়ি যিনি টানছেন, তিনি ভুল করেন নি। আপনি বসুন।

—বড় সুন্দর কথা বলেছ মা, ভুল তিনি করেন না।

—দেখুন, আমার বড় একা লাগছিল, মনে হচ্ছিল ওই আকাশ-

জোড়া অন্ধকার আমার বুকে চাপ দিচ্ছে, আমি হাঁপিয়ে উঠছিলুম, ঠিক সেই সময় আপনি গাড়ীতে ঢুকে আলো জেলে দিলেন। আমি বোধ হয় আপনাকেই খুঁজছিলুম।

—আমাকে? আমাকে কি তুমি চেন?

—এই ত চেনার শুরু হল। তবে আপনার নাম শুনেছি।

—কার কাছ থেকে শুনলে?

—দু'জনের কাছ থেকে। একজন আমার পুরাতন বন্ধু, আর একজনের সঙ্গে এই ট্রেনেই আলাপ।

—আমাকে ত নয়, তাকেই ত তুমি চাইছিলে। তোমার নতুন আলাপীটিকে।

—হাঁ, তার কথা আমি ভাবছিলুম, তার জন্যে আমি চিন্তিত। আপনি ঠিক বলেছেন। আপনি কি মনের কথা বুঝতে পারেন?

—তোমার মন বড় চঞ্চল, বড় ব্যথা-ভরা, এ বুঝতে পারছি।

—আপনাদের ত অলৌকিক শক্তি আছে, আমার মনকে শান্ত করে দিন্ দেখি!

প্রেমদাস মৃদু হাসলে।

জলজলে চোখে চেয়ে অনুপমা বললে, কি, চুপ করে রইলেন যে! আচ্ছা আপনি অসুখ সারিয়ে দিতে পারেন?

—আমি ত ডাক্তার নই।

—আপনাদের ত অলৌকিক শক্তি আছে।

—আমি ত ঐন্দ্রজালিক নই। আমি সন্ন্যাসী। তবু লোকে ভাবে আমি জাদুবিদ্যা জানি। এই দেখ আমার গাড়ীতে একজন ব্যবসাদার চলেছে, তার অর্থের প্রয়োজন, আমাকে বলে, আপনি টাকা যোগাড় করে দিন, আপনার শিষ্য হব, আপনি টাকা দিন। আচ্ছা', আমি কি

তেজারাতির কারবার করি? কিন্তু লোকটির নিষ্ঠা প্রবল। সেজন্য তাকে সাহায্য করতে গাড়ী থেকে নেমেছিলুম। এই ট্রেনে একটি ধনী যুবক যাচ্ছে, তার সঙ্গে একটি অভিনেত্রী আছে, শুনলুম, ফার্স্ট ক্লাস গাড়ীতে সে যাচ্ছে, তারি খোঁজে এসেছিলুম, ভুলে তোমার গাড়ীতে উঠে পড়েছি।

—আপনি যাদের খুঁজছেন, তাঁরা বোধ হয় পাশের গাড়ীতে আছেন। মাঝখান থেকে আমার লাভ হয়ে গেল। জানেন, সন্ন্যাসীদের আমার বেশ লাগে, আমার বাবার কাছে অনেক সন্ন্যাসী আসতেন, তাঁরা বড় মজার মজার কথা বলতেন। একজন ছিলেন অদ্বৈতবাদী। জগৎ যে মিথ্যা, এ প্রমাণ করতে প্রাণান্ত পরিশ্রম করতেন। তিনি কিন্তু সবচেয়ে বেশি খেতে পারতেন। তাঁর গলাবাজি ও খিদেটা যে মিথ্যে নয়, তা সবাই বুঝতে পারত।

—তুমি কি অনুপমা?

—হ্যাঁ, আমার নাম অনুপমা।

—আমিই সে-ই সন্ন্যাসী।

রাধাকান্ত আবার নোটবুক নিয়ে হিসাব করতে বসছে। গাড়ীর ঝাঁকুনিতে সংখ্যাগুলি ঠিকমত লিখতে পারছে না, বার বার লিখছে আর কাটছে; দেনার টাকা পাওনার চেয়ে বেশি হয়ে যাচ্ছে। সেজন্য সে চিন্তিত নয়। এখন কিছু টাকা ধার পেলে হয়, দু'লাখের কমে চলবে না, চার লাখ পেলে বেশ ভাল হয়। কলটা সারতে দেরি হবে। অবশেষে কি বোম্বে মার্কেটে গিয়ে ধার করতে হবে? কলের শেয়ার-

গুলির ওপর বাটলিওয়ালার লোভ ভয়ানক, সে জানে; শেয়ার গচ্ছিত রেখে টাকা চাইলেই সে পাবে। কিন্তু খাল কেটে কুমীর ঢোকাতে সে চায় না।

টাকা তার চাই। হার সে মানবে না। বোম্বে পৌঁছেই ব্যবস্থা করতে হবে। হাত পাততে হবে পার্শী ধনীর কাছে। অথচ ওই গণেশ ইচ্ছা করলেই দু'লাখ টাকা দিতে পারে। সন্ন্যাসীরও অনেক ধনী শিষ্য আছে নিশ্চয়। সন্ন্যাসী যে তখন বললে, আপনি টাকা পাবেন, তার মানে কি?

রাধাকান্ত দাঁড়িয়ে উঠল। আর একটা আলো জ্বেলে দিলে।

সামনের বেঞ্চিতে সন্ন্যাসী নেই। এ গাড়ী ছেড়ে সবাই গেছে কেন? শুধু সেই বৃদ্ধ লোকটি বসে আছে; সাদাচুল-ভরা মাথা দেখলে মনে হয় যেন পরচুল পরে যাত্রার অভিনয় করতে নেমেছে।

আর একটি অজানা লোক সামনে বসে তার দিকে সন্দিগ্ধনয়নে চাইছে। যেন তার সঙ্গে কথা কইতে চায়, কিন্তু তার সাহস হচ্ছে না কথা কইতে। লোকটি পরিচিত, শেয়ার মার্কেটে দেখেছে, অথবা কোন ইংরেজ দালালের অফিসে।

লোকটি দাঁড়িয়ে উঠল টেরা চোখ কাঁপিয়ে বললে, তাজ্জব ব্যাপার! মিতর সাহাব! কোথা চলেছেন? ফতেসিংকে চিনতে পারছেন না হুজুর!

ফতেসিং! রাধাকান্তর বিশ্বাস হল না তার সামনে ফতেসিং দাঁড়িয়ে। কোটিপতি ফতেসিং!

আবেগের সঙ্গে রাধাকান্ত ফতেসিং-এর দুহাত জড়িয়ে ধরলে, আশায় আনন্দে সে কাঁপছে।

রাধাকান্তকে জোরে ধরে ফতেসিং বললে, আপনার কি অসুখ হোল,

মিত্তর সাহাব! আরে বস্থন, বস্থন—ট্রেনে এতো হিসাব করলে ত মাথা গরম হোবে—এতো হিসাব কেনো—কোন্ কোম্পানীকে লাটে তোলাচ্ছেন!

রাধাকান্ত দীপ্তকণ্ঠে বললে, আপনার দেখা পেয়েছি, আর আমার ভয় নেই, বস্থন।

মাথায় মাড়োয়ারীর পাগড়ি, কানে হীরার ফুল, গলায় সোনার হার, পশ্চিমী ফতুয়ার উপর চীনে-সিল্কের লম্বা পার্শী কোট, পরনে জরি-পাড় ধুতি, পায়ে লণ্ডনে-কেনা জুতো। ফতেসিংকে মাড়োয়ারী বললে ভুল করা হবে। বস্তুত তার কোন দেশ নেই, কোন জাতি নেই। সে বলে, সে জহুরী, হীরক-ব্যবসায়ী। আসলে সে কুসীদজীবী। সে রাজামহারাজদের টাকা ধার দেয়, পৃথিবী জুড়ে তার টাকা খাটছে। পৃথিবীর যে সব অর্থপতিরা রাজশক্তিকে অর্থ দেয় প্রজাশক্তিকে দমন করবার জন্য, আবার প্রজাদের ক্ষমতালাভের প্রচেষ্টায় অর্থ সাহায্য করে রাজশক্তিকে খর্ব করবার জন্য, এক জাতিকে ঋণ দেয় অপর জাতির নিকট হতে রণ-সম্ভার ক্রয় করবার জন্য, আবার বিক্রেতা-জাতিকে টাকা ধার দেয় যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করবার জন্য, দেশে দেশে কলকারখানার চাকা ঘোরার সঙ্গে যাদের টাকা খাটে, খনিতে তেল কয়লা ওঠার সঙ্গে যাদের টাকা ওঠে, কামানের ধূমে বোমার আগুনে যাদের টাকা পুড়ে খাঁটি সোনা হয়, ফতেসিং সেই সব ধনপতিদের দলের।

ফতেসিং হেসে বলে উঠল, মিত্তার সাহাব, তাজ্জব ব্যাপার, বোম্বে যাচ্ছেন, না বিলেত? আপনার মিলে স্টারাইক শুনলুম।

রাধাকান্ত বললে, স্ট্রাইক বিশেষ কিছু নয়, প্রায় মিটে গেছে, ক'টা ছোকরা এসে বড় গোলমাল করছিল। কিছু টাকা দিতেই সরে পড়েছে।

ফতেসিংকে সে মিলের সত্যিকার অবস্থা জানাতে চায় না।

ফতেসিং হেসে বললে, এ আপনি ভুল করলেন, আবার টাকা নিতে আসবে—স্টারাইক বাধাবে—তার চেয়ে একটা সর্দারি কাজ দিয়ে দিতেন ওদের সর্দারকে। এমনি করে বড় বড় গভরনমেণ্টও চোল্‌ছে।

রাধাকান্ত আগ্রহের সঙ্গে বললে, এ ঠিক বলেছেন, তা আপনিও বোম্বে চলেছেন—what a great pleasure—আপনাকে দেখে বড় আনন্দ হচ্ছে। একটা কাজের কথাও আছে।

সরু লম্বা গোঁফে একবার আঙুল বুলিয়ে ফতেসিং বললে, সে জানি, আপনার সব সময়ই কাজ, আর কিছু চিন্তা করেন না—খালি ব্যবসা, টাকা—টাকা! এসব সঙ্গে যাবে না, মিতির সাহাব!

রাধাকান্ত একটু বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠল, এ যে ভূতের মুখে রাম নাম! টাকার জন্যে আপনি যে সমস্ত পৃথিবী ঘুরে বেড়াচ্ছেন—কোটিপতি হয়েও ত আপনার তৃষ্ণা মিটছে না।

ফতেসিং টেরা চোখের তারা ঘুরিয়ে বললে, আরে কি বলেন, টাকা কি আমার? দেনে-ওয়ালা দিচ্ছেন, খেলাচ্ছেন, আমরা ত ভগবানের খাতাঞ্চী মাত্র।

রাধাকান্ত হেসে বলে উঠল, ভগবানও কি তেজারতির ব্যবসা খুলে বসেছেন নাকি?

ফতেসিং গম্ভীর হয়ে গেল। ধীরে বললে, ভগবানকে নিয়ে joke করবেন না। তাঁর কৃপা না হলে কিছুই মেলে না।

রাধাকান্ত চুপ করে বসল। অবাক হয়ে ভাবলে, হয়ত ভগবানের কৃপায় সে ফতেসিং-এর দেখা পেয়েছে, কিন্তু যতক্ষণ না সে তিন লাখ টাকা ধার পাচ্ছে, ততক্ষণ সে নিশ্চিন্ত হতে পাচ্ছে না। বোধ হয় ফতেসিং বুঝতে পেরেছে, সে টাকা ধার চাইবে, সেজন্যে কথাবার্তায় এমন ধর্মের সুর লাগিয়েছে।

রাধাকান্ত আর ধৈর্য ধারণ করতে পারল না। আবেগের সঙ্গে সে বললে, দেখুন ফতেসিং, আমায় কিছু টাকা ধার দিতে হবে।

ফতেসিং কোনরূপ বিস্ময় প্রকাশ করলে না। বিনীতভাবে বললে, এ ত আমার সৌভাগ্য, আনন্দের কথা। তবে আমার কি সামর্থ্য!

রাধাকান্ত বুঝলে, ফতেসিং ধার দিতে বিশেষ রাজী নয়, কিন্তু কত টাকা দরকার জানবার জন্য ব্যগ্র।

রাধাকান্ত বল্লে, বেশি নয়, চার লাখ টাকা হলেই এখন হবে, এ ত আপনার কাছে সামান্য টাকা, বলেন ত মিলের কিছু শেয়ার আপনার কাছে রেখে দেব।

টেরা চোখে চেয়ে ফতেসিং বললে, মিলের স্টারাইক ত থেমে গেছে বলছেন। তা হ'লে অত টাকার কি দরকার হচ্ছে?

রাধাকান্ত বুঝলে, ফতেসিং টাকা দিতে রাজী, মিলের শেয়ারের ওপর সকলেরই লোভ। ধীরে বললে, আপনাকে সত্যি কথা বলছি, একটা কল একটু ভেঙ্গে গেছে, চালাতে সাহস হচ্ছে না, ইংলণ্ড থেকে ইঞ্জিনিয়ার আনতে হবে।

গোঁফের ওপর আঙুল বুলিয়ে ফতেসিং বললে, আচ্ছা, সে কথা হবে কাল সকালে। বোম্বেতে ত যাচ্ছেন।

রাধাকান্ত বুঝলে, ফতেসিং কাল সকালে কাগজে সব খবর জানতে চায়, কলের শেয়ারের দর কত দেখতে চায়। রাত্রের মধ্যে কথাটা পাকাপাকি করে নিলে সুবিধে হয়।

ফতেসিং বললে, দেখুন মিতার সাহাব, যে কাজের জন্যে আপনার গাড়ীতে এলুম, আগে সে কার্যসিদ্ধি হোক। টাকার কথা পরে হবে।

সবিস্ময়ে রাধাকান্ত বললে, সে কাজ কি?

ফতেসিং অনামিকায় বৃহৎ পোখরাজের আংটির দিকে চেয়ে বললে,

এসেছিলুম সাধু-দর্শনে। শুনলাম এ গাড়ীতে প্রেমদাস বাবাজী যাচ্ছেন—তিনি কোন্ গাড়ীতে জানেন ?

টেরা চোখে ফতেসিং কোন্ দিকে চাইছে, বিরিঞ্চি বুঝতে পারলে না, ভাবলে তার দিকে চেয়ে প্রশ্ন করছে। কথা কইতে সে-ও উৎসুক হয়েছিল। সে বলে উঠল, ঠাকুর ত এই গাড়ীতেই ছিলেন, কাছের কোন গাড়ীতে গেছেন, পরের স্টেশনে এ গাড়ীতে আসতে পারেন। আপনি তাঁকে চেনেন ?

ফতেসিং হেসে বললে, কিছু চিনি বই-কি। বড় জোর সাধু। তাঁর আশিস চাই। যে বছর তাঁর কথায় হাসপাতালে ছ'টা বেড দিলুম, নিউইয়র্ক মার্কেটে বড় লাভ করেছিলুম। মিতার সাহাব, এত বড় সাধু আপনার সঙ্গে গাড়ীতে, আর আপনি তাঁর পদসেবা না করে টাকার হিসাব করছিলেন !

বিরিঞ্চি ধীরে বললে, তিনি বোধ হয় ওঁর জন্যে টাকার যোগাড় করতে গেছেন।

ফতেসিং অবাক হয়ে বললে, টাকার যোগাড় ! আরে বাবা, তিনি ধুলি ছুঁয়ে দিলে সোনা হয়ে যায় !

বিরিঞ্চি আগ্রহের সঙ্গে বললে, আপনি দেখেছেন ? সত্যি ?

মনে মনে সে ঠিক করলে, কিছুদিন প্রেমদাস ঠাকুরের পদসেবা করবে, সঙ্গ কিছুতেই ছাড়বে না। অন্তত ছোট মেয়ের বিবাহের খরচটা যোগাড় করে নেবে।

ফতেসিং হেসে উঠল। বললে, দেখিনি ! বাবাজী বললেন, এই বিধবার মেয়ের বিবাহের খরচ দিতে হবে। যেদিন চেক লিখে দিলুম, তার পর দিনই "হিমালয়ান মিল" কিনলুম অর্ধেক দামে। বিনালাভে টাকা দিই না, বুঝলেন।

ঠাকুরের কথায় ওই লোকটি একজনের মেয়ের বিবাহের খরচ দিয়েছে!

বিরিঞ্চি আকুল নয়নে ফতেসিং-এর দিকে তাকালে। কিন্তু ফতেসিং কোন্ দিকে চেয়ে আছে, সে বুঝতে পারলে না।

ফতেসিং বললে, আচ্ছা, যুদ্ধ লাগবে শুনছি না কি?

কেউ উত্তর করলে না।

রাধাকান্ত খোলা জানলা দিয়ে অন্ধকার বনভূমির দিকে চেয়ে রইলো।

মধ্যম শ্রেণীর মেয়ে-গাড়িতে মালতী ফিরে এসেছে। গাড়ীতে সে একা। হিন্দুস্থানী মেয়েটি পথে কোথাও নেমে গেছে।

এক কোণে চুপ করে সে বসে রইল। মনটা কেমন ভারী হয়ে উঠেছে। অকারণে কল্যাণ তাকে কেন এমন করে ডেকে চা খাওয়ালে।

সত্যিই কি অকারণে?

গাড়ীতে পৌঁছে দিয়ে কল্যাণ বলেছিল, সাহস হয় না বলতে, ডিনারের সময় যদি আসেন ত ডেকে নিয়ে যাব।

মালতী উত্তর দিয়েছিল, রাতে আর খেতে পারব বলে মনে হয় না। আর কেমন ক্লান্তি লাগছে।

কল্যাণ হেসে চলে গেল পাইপের ধূম্র উদ্গারিত করে। কিন্তু তার মুখে হাসি এল না।

ট্রেনের ঝক্ঝক্ ধ্বনির মধ্যে কল্যাণের-বলা টুকরো টুকরো কথা

তার কানে বাজতে লাগল। কতকগুলি কথা হেঁয়ালির মত তখন মনে হয়েছিল, এখন যেন সে অর্থ বুঝতে পারছে। ইমপ্রেসনিস্ট চিত্রশিল্পীর ছবি যেমন খুব নিকট থেকে দেখলে কতকগুলি অসংলগ্ন পুরু রঙের মোটা ছোপ বলে মনে হয় কিন্তু দূরে গিয়ে দেখলে সমস্ত ছবিটি আলোর দীপ্তিভরা বর্ণের সুষমামণ্ডিত ঐক্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, তেমনি গাড়ীতে একা বসে ভাবতে ভাবতে কল্যাণের চা-খাওয়ান ভাবব্যঞ্জক চিত্রের মত ফুটে উঠল। জল্‌জ্বলে রঙে রেখাগুলি হারিয়ে গেছে।

ভাল লাগছে দেখতে, কিন্তু অর্থ স্পষ্ট নয়। নয়নে রঙের নেশা লাগে কিন্তু হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়। এ সুখ নয়, এ হৃদয়জ্বালা।

মালতীর কাঁদতে ইচ্ছে করল।

চারিদিকে চেয়ে দেখলে, গাড়ীতে কেউ নেই। বাইরে চেয়ে দেখলে, স্তব্ধ বনানী অন্ধকারঘন।

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে সে কাঁদতে লাগল। অনেকক্ষণ ধরে সে কাঁদলে। কেঁদে তার মন হালকা হল। মনে হল, বানিয়ে কথা বলতে কল্যাণ ওস্তাদ। এতক্ষণ সে তার সঙ্গে ফ্লার্টিং করেছে মাত্র। কিন্তু সমরও কি তাকে ভালবাসে না?

সে কেন ভালবাসা পাবার জন্য তৃষিত? সে জীবনের লক্ষ্যভ্রষ্ট হচ্ছে কেন?

মায়ের কথা মনে পড়ল, মালতীর। মাকে চিঠি লেখা হয়ে ওঠে নি। ইতরসি-স্টেশন থেকে একটা টেলিগ্রাম করতে হবে। মা এখন রাঁধতে বসেছেন। আর মনু কি করছে? তার পরীক্ষার ফল কি হল, কে জানে!

মালতীর আবার কান্না পেল। কিন্তু এবার সে কাঁদল না। আপন মনে হেসে উঠল, হাসি-কান্না-ভরা এ জীবন বড় মজার। গুন্ গুন্

করে সে গেয়ে উঠল, কান্না-হাসির দোল-দোলান মাঘ-ফাগুনের পালা—

দু'লাইন গান গেয়ে সে থামল। মনে হল, কে যেন হেসে উঠছে তার গানের সুরে হাততালি দিচ্ছে, আর তার মনটা কাঁদছে।

বোধ হয় সমর আবার তার গাড়ীতে প্রবেশ করেছে।

গাড়ীর প্রতি কোণে সে সমরকে খুঁজলে, জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলে। কোথাও কেউ নেই। স্থির হয়ে সে গাড়ীর মাঝের বেঞ্চিতে বসলে। তার কেমন ভয় করছে। সমস্ত রাত হয়ত একা থাকতে হবে। হয়ত অনুপমাদিদির কুপেতে আশ্রয় নিতে হবে। একা সে থাকতে পারবে না। সমর কি আসবে না? সমর!

অজ্ঞাতভাবে সে চেঁচিয়ে উঠল—সমর!

পেছন থেকে আবার কে হেসে উঠল।

পরম বিস্ময়ে মালতী দেখলে, সমর তার পেছনে দাঁড়িয়ে।

কমরেড্! স্মরণ করতেই সাড়া দিয়েছি, বলে সমর তার সামনে বেঞ্চিতে বসল।

মালতী হতবাক্ বসে রইল।

সমর বললে, দেখ মালতী দেবী, চোখের জল বুর্জোয়া নারীদের নয়নের শোভাবর্ধন করে, আঁখির কোণে অশ্রুর রেখাকে বুর্জোয়া কবি আষাঢ়-আকাশের নবমেঘ-সঞ্চারের সঙ্গে তুলনা করতে পারে, কিন্তু কম্যুনিস্টের পক্ষে ক্রন্দন শুধু লজ্জাকর নয়, গর্হিত কর্ম। সে কেঁদে ভিক্ষা করে নেয় না, জোর করে কেড়ে নেয়। আপন অধিকারে নেয়।

মালতী লজ্জিতভাবে বললে, কই, আমি কাঁদছি না ত। আমায় কাঁদতে দেখছ নাকি?

—দেখিনি, তবে অনুমান করছি।

—মোটেই কাঁদছি না।

—মোট কথা, বুর্জোয়া মনোবৃত্তি তুমি ত্যাগ করতে পারনি। পারবেও না।

—কেন? আমি সোসিয়লিজ্‌মে বিশ্বাস করি।

—তার চেয়ে বেশি বিশ্বাস করো যে, পুরুষ হচ্ছে মেয়েদের সম্পত্তি, বিশ্বাস করো যে মেয়েরা প্রেমের লীলা খেলে রূপের মায়াজাল ছড়িয়ে, ভাবের কুজ্ঝটিকা সৃষ্টি করে, পুরুষদের মত্ত অন্ধ বিপথগামী কোরে এ সম্পত্তি লাভ করবার অধিকারিণী।

—কেন! আমি কি করেছি? ওসব রূপের লীলা, ভালবাসার ঢং যার মধ্যে দেখছ, তাকে বলগে। আমাকে বলতে এসেছ কেন?

—এই দেখ আমার কথা প্রমাণ হয়ে গেল। তুমি আমাকে তোমার সম্পত্তি বলে ভাবছ—তাই জেলাস্ হয়ে উঠছ।

—জেলাস্! নিজের সম্বন্ধে তোমার বড় বেশি উঁচু ধারণা দেখছি।

—তা হ'লে ও গাড়ীতে থেকে অমন করে চলে এলে কেন?

—ভাল লাগল না বলে। ফাঁদ-পাতা আমার ব্যবসা নয়।

—অথবা ফাঁদ-পাতার প্রতিযোগিতায় পেরে উঠলে না।

—দেখ, তোমার সঙ্গে আমি ঝগড়া করতে চাই না। কিন্তু তুমি যে এত দুর্বল তা ভাবিনি।

—নারীর রূপে কে না ভোলে বল!

—ভাল্‌গার হোয়ো না। অনুপমাদিদির এ হচ্ছে ক্ষণিকের খেয়াল, তা বুঝতে পারছ?

—এই খেয়ালের খেলায় আমি যদি কিছু আনন্দলাভ করে নিতে পারি, মন্দ কি?

—সমর, ঠাট্টা নয়, তোমার সত্যিকার প্ল্যান কি বলো। সত্যি ইয়োরোপ যাবে? আমিও যাব তোমার সঙ্গে, বলো

—কেন তোমার পথপ্রদর্শক পদলাভের জন্য যিনি এত করে দরখাস্ত পেশ করলেন,—তার মত সঙ্গী থাকতে—

—এবার কে জেলাস্?

—ফুঃ!

—রঙ্গ নয়, একটা ঠিক করো। চাকরি নিতে তোমায় কিছুতেই দেব না।

—তুমি কি আমার গার্ডিয়েন হলে।

—দরকার হলে হতে হবে।

—দেখ, sex আর property, এই দুই সমস্যার সমাধানের জন্য মানুষের সকল বেদনা, বাসনা, সংঘাত, সংগ্রাম—আর যেখানে এই দুই শক্তিধারার যুক্ত আবর্ত, সে কি ভীষণ অবস্থা ভাবো।

—তোমার হেঁয়ালি আমি বুঝতে চাই না। তুমি ইয়োরোপে যাবে কি না বলো?

—বোম্বে গিয়ে তোমায় জানাব। ইতিমধ্যে অন্য পথসঙ্গীটিকে হাতছাড়া কোরো না।

—তোমার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ।

—ডিনারের সময় হয়ে এল। রাতে খিদে পেলে, পথে কোথাও খাবার পাবে না, খিদের জ্বালায় ঘুমও হবে না। সে জন্য এখন নিমন্ত্রণ রক্ষা না করাটা বুদ্ধিহীনের কাজ হবে।

রেগে মালতী বলে উঠল, খুব হয়েছে, চুপ করো।

মুচকি হেসে সমর এক দরজা খুলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মালতীর দুই চোখ জ্বলতে লাগল। গুম্ হয়ে সে এক কোণে বসলো।

মনে মনে সে বললে, আমার মনে এমন করে ব্যথা দিয়ে তুমি কি আনন্দ পাও?

ট্রেনের ছোট একটা কম্‌পার্টমেণ্ট খালি দেখে দেবপ্রিয় সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। কালো চশমা পরে সে এক কোণে বসে। সে একা থাকতে চায়। চিন্তা করা শুধু তার স্বভাব নয়, তার ব্যাধিস্বরূপ।

সে ভাবছিল, গণেশ-শিপ্রার গাড়ীতে সারাদিন সে কাটালে কি করে! এখন তাদের সঙ্গ শুধু লজ্জাজনক নয়, ঘৃণাকর। বোধ হয়, নব অনুভূতির সন্ধানে সে গেছল। বাইরের ঘটনা, নব নব চরিত্রের সংস্পর্শে তার মনে আঘাত করে, চিন্তার ঢেউ জাগিয়ে তোলে; তখন সে লোকসমাজ হতে মনন-লোকে চলে যেতে চায়।

দেবপ্রিয় ভাবছিল, বৌদ্ধযুগের বিহারের মত, ইয়োরোপের মধ্য-যুগের মনস্টারীর মত কোন নির্জন উদ্বেগহীন আশ্রয়-স্থান বর্তমান যুগে নেই, চিন্তকরা যেখানে স্থিরচিত্তে চিন্তা করতে পারে। বর্তমান যুগের মানুষের গভীরভাবে নির্লিপ্তভাবে চিন্তা করবার স্থান বা অবকাশ নেই, সেজন্য কোন সমস্যার সমাধান হচ্ছে না; লালসাপীড়িত আবেগচঞ্চল চিত্ত হানাহানি কাড়াকাড়ির মধ্যে সত্য-দর্শন কি করে লাভ করবে? তার যদি টাকা থাকতো, সে এরকম একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা করত।

দেবপ্রিয় আবার হেসে ভাবলে, সত্যিই যদি তার টাকা থাকত, হয়ত সে রাধাকান্তর মত কলকারখানা তৈরি করত, অথবা গণেশের মত নর্তকীর নূপুর-নিক্বণে টাকা দিত ছড়িয়ে, মদিরাধারায় টাকা

দত গলিয়ে। সুতরাং প্রশ্ন হচ্ছে, মানুষের চরিত্র ও ব্যবহার, তার ইচ্ছা, জীবনের আদর্শ, তার ধর্ম ও নীতি, তার আর্থিক অবস্থার ওপর কত দূর নির্ভর করে, তার ধনসঞ্চয় দ্বারা কতদূর নিয়ন্ত্রিত? এই বুর্জোয়া মরালিটি কি বুর্জোয়া অর্থসংগ্রহের অহর্নিশি প্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত নয়? সম্পত্তি-রক্ষণের উপায়রূপে সৃষ্ট হয় নি? আজ ধনতান্ত্রিক সভ্যতার ভাঙনের সঙ্গে সঙ্গে তার উচ্চ স্তম্ভগুলি কি ধসে পড়ছে না? মানব-আত্মার চিরন্তন প্রকাশ, শাশ্বত সত্যভূমি কোথায়?

এ সমস্যা ভাবতে হবে।

কালো চশমাটা মুছে দেবপ্রিয় ভাবতে বসল।

স্থিরচিত্তে দেবপ্রিয় ভাবতে পারছে না। দেহ ক্লান্ত, মন অবসাদে ভারাক্রান্ত। গাড়ীর শক্ত কাঠে মাথা রেখে সে অর্ধশয়ানভাবে বসল।

দিশাহারা দৈত্যের মত ট্রেন ছুটে চলেছে অন্ধকার বনপথ দিয়ে।

দেবপ্রিয়ের চিন্তার সূত্র বার বার ছিন্ন হয়ে যাচ্ছে। কোন্ নটীর নৃত্যদোদুল পদপল্লবে সে ছিন্নসূত্র বারবার জড়িয়ে যাচ্ছে।

নটীর পূর্ণরূপ সে দেখতে পাচ্ছে না, শুধু চঞ্চল পদের অশান্ত ভঙ্গিমা। ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ সমুদ্র-তরঙ্গ যেমন শূন্য বিজন বালুকাময় তীরে বার বার আছাড় খেয়ে পড়ে তেমনি বেদনাবিহ্বল-ছন্দে নৃত্যপরা পদমৃণাল দুলছে।

এ কার পা বার বার তার চোখের সামনে ভেসে উঠছে, কাঁপছে, দুলছে, অজানা পথে আহ্বান করছে?

কোন ফরাসী গল্পে পড়েছিল, লেখকের ঘরে বহুযুগের পার হতে কোন সুন্দরী নারী এসেছিল তার ভাঙা পা খুঁজতে। কিন্তু এ পা অতীতকালের কোন নর্তকীর নয়, কালিদাসের উজ্জয়িনীর বা হারুন-অল-রসিদের বোগদাদের কোন লীলাচঞ্চল সুন্দরীর নয়।

দেবপ্রিয় চমকে উঠে বসল, এ শিপ্রার পদভঙ্গিমা! পদ্মের ডাঁটার মত দীর্ঘ সুন্দর। দুপুরে গাড়ীতে সে নর্তকী শিপ্রার অনেকগুলি ছবি দেখেছিল, তা ছাড়া, কোন চিত্রশিল্পী শিপ্রার নৃত্যভঙ্গীর কতকগুলি রঙীন রেখাচিত্র এঁকেছিল, সেগুলি শিপ্রা দেবপ্রিয়কে দিয়েছিল দেখতে। বর্তমান ধনতান্ত্রিক সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে যখন সে ভাবতে বসেছে, এক নাচওয়ালীর নর্তিত চরণ তার চোখের সামনে এল বিঘ্ন ঘটাতে!

দেবপ্রিয় বুকে একটা অজানা বেদনা অনুভব করল।

ব্যর্থ সে! শূন্য এ জীবন!

মানবসভ্যতার ভবিষ্যৎ যাই হোক, তার নিজের জীবনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন্ আশা আছে? তার বর্তমান জীবন বাসনাবিহ্বল, হতাশ্বাসময়, নিরর্থক মনে হয়।

গরীব সাব-এডিটারের একঘেয়ে জীবনের দিনের পর দিনের সঞ্চিত গ্লানি, ক্ষোভ, হতাশার ভার আর সে বহন করতে রাজী নয়। সে বিদ্রোহ করবে।

কিন্তু কার বিরুদ্ধে সে বিদ্রোহ করবে?

সে আর ভাবতে চায় না। আর চিন্তন, সমীক্ষণ নয়। সে জীবনকে উপভোগ করতে চায়। দেহের প্রতি স্নায়ু দিয়ে শিরায় শিরায় রক্তস্রোতের উল্লাসে, তনুস্পর্শের উন্মাদনায় সে অনুভব করতে চায় বেঁচে থাকার আনন্দ। ওই গণেশ হালদারের মত।

মনের বিদ্রোহী ভাবকে আরও উদ্দীপিত করবার জন্য দেবপ্রিয় নিজ জীবনের একটি দিনের কথা ভাবতে লাগলো।

সকালে যখন ঘুম থেকে ওঠে, দেহের অবসাদ দূর হয় না, কারণ রাত্রে সুনিদ্রা সম্ভবপর নয়। স্ত্রীর বুকের ব্যথা প্রায়ই বাড়ে, অথবা

কোন ছেলেমেয়ের অসুখের জন্য মাঝরাতে জেগে বসে থাকতে হয়। ছেলেমেয়েরা পালা করে অসুখ করে চলে। আর রাত্রে একবার ঘুম ভাঙলে সহজে তার ঘুম আসে না, নানা চিন্তা মাথায় ঘোরে, কখনও বা সে কোন প্রাচীন দার্শনিক বা আধুনিক ঐতিহাসিকের গ্রন্থ পড়তে আরম্ভ করে। সকালে দেরি করে ওঠার উপায় নেই; কারণ রান্নাঘরের ধোঁয়ায় ঘর ভরে যায়, তখন গলির মোড়ে চায়ের দোকানে শীঘ্র আশ্রয় নিতে হয়।

কোন রকমে ভাত খাওয়া সেরে ছুটতে হয় আফিসে, রোজ এক রকমের রান্না, স্বাদহীন, বিস্বাদও লাগে না! ট্রামে লোকের ভিড়, ঘেঁষাঘেষি বসতে হয়, কোন দিন বসবারও জায়গা পাওয়া যায় না; গোলমালে, গরমে, জনতার তপ্ত নিশ্বাসে চারিদিক বিরক্তিকর বোধ হয়।

আফিসের পুরানো কালের চেয়ার ও দাগকাটা বড় পুরানো কাগজ-ভরা টেবিল দেখলে মনে ঘৃণার ভাব জাগে। মানবসমাজের প্রতি, দেশের প্রতি, কাগজের কর্তৃপক্ষদের প্রতি ঘৃণা! সে ভাব দমন করে প্রুফ দেখতে হয়, রয়টারের ইংরাজির বাংলা তর্জমা করতে হয়, অবসর-সময়ে পরনিন্দা, খোসামোদ ও ইয়োরোপ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী। সন্ধ্যায় ধুঁকতে ধুঁকতে বাড়ী ফিরে শুনতে হয় সংসারের অনটনের কথা; মায়ের মুখে শুনতে হয় তাঁর বোম্বের ছেলের সচ্ছলতার সঙ্গে তুলনামূলক সমালোচনা; ছোট মেয়ে এসে বলে, বাবা একটু পড়া বলে দাও। চুপ করে শুনে সে চলে যায় পাড়ার আড্ডায়। ইচ্ছা করে রাতে বই পড়ে বা লেখে, টয়ন্‌বীর বর্তমান ইউরোপ সম্বন্ধে বইগুলিতে ধুলা জমে, বাড়ীতে নিরিবিলি পড়বারও একটু জায়গা নেই, পাড়ার ক্লাবেই আশ্রয় নিতে হয়। ময়লা সতরঞ্চির ওপর বসে দাবাখেলায় মেতে সব ভুলে

যাওয়া! সেখানেও বেশিক্ষণ খেলার জো নেই। বার বার বাড়ীর চাকর আসে তাগাদা দিতে; চাকরটা কিছু বলে না, শুধু দরজার কাছে এসে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। ক্লাবের লোকেরা মুচকে হেসে বলে, দূত বড় শীগ্‌গীর এল দেবপ্রিয়বাবু, উঠে পড়ুন। রোজই সেই এক রসিকতা! কোন কোন দিন সে বিরক্তি দমন করতে পারেন না, গঞ্জ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে উঠে পড়ে। ছোট ভাড়াটে বাড়ীতে ঢুকতে যেন দম আটকে যায়। তবু হাসিমুখে নলিনীর সঙ্গে কথা কইতে হয়। নলিনী হয়ত কোনদিন শ্রান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়ে, ঘুমঘোরে বলে, আমি কিছু খাব না, তুমি খেয়ে নাও। নলিনীকে জাগাতে হয়, বলতে হয়, 'উঠ নলিনী, খোল গো আঁখি'। আধ ঘুমভরা নলিনীকে বড় রহস্যময় সুন্দর দেখায়। সে সৌন্দর্য ক্ষণিক! একটু পরেই কথা কাটাকাটি আরম্ভ হয়, নলিনীর মুখ রুক্ষ, কণ্ঠস্বর কর্কশ হয়ে ওঠে। রাতের খাবারেরও কোন স্বাদ থাকে না।

এমনি দিনের পর দিন কাটে, ক্লান্তিকর, গ্লানিময়, ব্যর্থতা-ভরা।

আবেগের সঙ্গে দেবপ্রিয় দাঁড়িয়ে উঠল।

ছোট কম্পার্টমেণ্ট, বেঞ্চিগুলি শূন্য, ধূলিময়।

দ্রুতগামী ট্রেনের দোলায় দেবপ্রিয় চঞ্চল হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। তারপর মাঝের বেঞ্চির উপরের অংশে হাত দিয়ে জোর করে করে সে অভিনয়ের ভঙ্গীতে দাঁড়াল।

আপন মনে সে বেদনার আবেগে উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠল, বিদ্রোহ! এ সমাজ, এ রাষ্ট্র ভেঙে নতুন করে গড়তে হবে। দেখ জগদীশকে, বি-এ পরীক্ষায় আমি হয়েছিলুম ফার্স্ট, আর জগদীশ ফার্স্ট ক্লাশও পেলে না; পিতৃসঞ্চিত অর্থে জগদীশ বিলেত যেতে পেরেছিল বলে আজ তার এতবড় চাকরি, এমন সুন্দরী স্ত্রী। এই ধনতান্ত্রিক সভ্যতা—হুঁ!

দেবপ্রিয় বেঞ্চিতে বসল। সরবে সে ভাবতে লাগল, সে যে আপন মনে কথা কইছে, সে জ্ঞান তার নেই।

শূন্য বেঞ্চির দিকে চেয়ে দেবপ্রিয় বললে, দেখ, আমি কিন্তু কম্যুনিজম্ বিশ্বাস করি না—রাশিয়ার্ অবস্থা দেখ—স্বাধীন চিন্তাধারা লুপ্ত—হুঁ! কিন্তু বিপ্লব চাই, আমি মানবসভ্যতার ইতিহাসের ছাত্র—অত্যধিক তাপের পর 'পিঙ্গল, বিহ্বল, ব্যথিত নভতলে' যেমন ঝড়ের মেঘ ওঠে, তেমনি আসে যুদ্ধ, বিপ্লব—আমার মত কত ব্যথিতজনের হৃদয়ের তাপ সঞ্চিত হচ্ছে—হুঁ! বুঝতে পারছি, গণেশবাবুর জীবনে কোন গভীর বেদনার ক্ষত আছে, জ্বালা আছে; গণেশবাবু বলেছিল, 'বাসনার ব্যর্থতা,' ঠিক বোঝাতে পারেনি, অর্থাৎ বাসনা রয়েছে, দেহের, মনের, তা পূর্ণ হচ্ছে না, কেন হচ্ছে না—তা পূর্ণ করা যায় না, সম্ভবপর নয়, পূর্ণ হলে সৃষ্টিধারা শেষ হয়ে যায়। বাসনার অন্ধগুহা হতে এই রূপের নির্ঝরিণী অবিরাম ঝরে পড়ছে, সে গুহাদ্বার বন্ধ করে দাও, শুকিয়ে যাবে এই বস্তুর বালুচরে অনন্ত প্রাণরসের তরঙ্গিণী, অসীম শূন্য অন্ধকারে মিলিয়ে যাবে এই বিচিত্র জগৎ-চিত্রের চঞ্চল ধারা। হুঁ!

দেবপ্রিয় আবার দাঁড়িয়ে উঠল। বেঞ্চিতে হাত দিয়ে বলে যেতে লাগল, দেখ গণেশবাবু, তুমিও বিদ্রোহী, তোমার দলেই যোগ দেব ভাবছি, রূপের ঝরনাতলায় বসে পান করব সুধা, ওই বিদ্রোহী মানবের তৈরি-করা জ্বালাময় সুধা। কিন্তু তোমার বিদ্রোহ বড় নতুন ধরনের। ধনতান্ত্রিক সমাজের সম্মুখে তুমি টাকা দিচ্ছ উড়িয়ে, বলছ, দেখ অর্থ কত তুচ্ছ জিনিস, কত সহজে খরচ করা যায়, অর্থের মোহশক্তি হতে আমি মুক্ত। এই বুর্জোয়া সমাজনীতিকে ব্যঙ্গ করে তুমি বলছ, দেখ, নারী হচ্ছে পণ্যদ্রব্য ভোগের বস্তু; যে নারীকে তোমরা সন্তানের

জননী, গৃহের মঙ্গলদীপ বলো, সে নারী দাবাগ্নি, সে নারী আলেয়া—বা—চোখের সামনে আবার দুলছে পদমৃণাল!

দেবপ্রিয় বেঞ্চিতে স্থির হয়ে বসতে চেষ্টা করলে।

ভূগর্ভের কোন গভীর উচ্চ স্রোত ভূপৃষ্ঠ ভেদ করে মুক্তধারার মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলে যেমন ভূকম্পন হয়, তেমনি কি বিচিত্র আলোড়ন তার দেহে মনে। এ অজানা শক্তি, রহস্য!

দেবপ্রিয় আবার ভাবতে বসল।

নারীর এ মোহিনী শক্তিকে, দেহলালসার পরিতৃপ্তিকে, সে শুধু অবহেলা নয়, অবজ্ঞা করেছে। এ তাহারি প্রতিশোধ! জ্ঞানের সত্যকে জানা তার চিন্তার সাধনা, আত্মার গভীর শান্তিকে উপলব্ধি করবার পথ সে জীবনে খুঁজেছে—stillness of the spirit—শান্তি ত সে পেল না, মননের পথে নানা মতবাদ, তর্কের ধূলি, নব নব সন্ধানের উৎসুক বেদনা। এবার সে যাবে রূপানুভূতির পথে, দেহের পেয়ালা দিয়ে রূপের সুধা পান করে মোহমুগ্ধ আনন্দে চিন্তনের ব্যর্থ বেদনা ভুলে থাকা।

আবেগের সঙ্গে দেবপ্রিয় আবার উঠে দাঁড়াল, বলে উঠল, কি সুন্দর তোমার তনু, নারী! পরিপূর্ণা সুন্দর নারীকে দেখতে ইচ্ছে করে—জানতে ইচ্ছে করে তার রূপের রহস্য, জানতে ইচ্ছে করে সে রূপ যখন যুবতী-তনুতে প্রস্ফুটিত পদ্মের মত বিকশিত হয় তখন তার মনে কি অনুভূতি কি বেদনা কি আনন্দ জাগে—হ্লাদিনী শক্তি নারীদেহে কি অপরূপ মূর্তিতে প্রকাশিত হয়,—কেশের বর্ণে, ত্বকের লাবণ্যে, নয়নের তারকার জ্যোতিতে, গ্রীবার রেখায়, বক্ষের সুষমায়, কটির ভঙ্গীতে, চরণ-মৃণালের নৃত্যপরা ছন্দে!

—বা চমৎকার!

দেবপ্রিয় বিস্মিতভাবে চারিদিকে চাইলে।

সমর আবার বলে উঠল, বা! চমৎকার! আপনাকে আমি সি. আই. ডি. অফিসার ভেবেছিলুম, এখন দেখেছি আপনি সিনেমার এ্যাক্টর!

দেবপ্রিয়ের কানে কোন কথা গেল না, সে শুধু দেখলে তার সামনের বেঞ্চে একটি তরুণ যুবক বসে! একটু এগিয়ে সে চাইলে, চশমাটা খুলে ভাল করে চাইলে। সত্যিই একটি যুবক বসে।

চশমাটা রুমালে মুছতে মুছতে দেবপ্রিয় বললে, কে তুমি? নাচওয়ালীর পায়ের মত তুমি ত অলীক ছায়া নও?

সমর হেসে দাঁড়িয়ে উঠে বললে, না, দেখতে পাচ্ছেন, আমি অলীক নই; এবং নাচওয়ালীর পা তার কাছে অলীক নয়, বিশেষত সেই পায়ে নেচে যখন তাকে জীবিকার্জন করতে হয়।

দেবপ্রিয় স্থির হয়ে বেঞ্চিতে বসে বললে, হুঁ! আপনি কখন এলেন, কোন্ স্টেশনে গাড়ী থেমেছিল?

—গাড়ী কোন স্টেশনে থামেনি। আমি চলন্ত ট্রেনের দরজা খুলেই এসেছি। আপনাকে গোড়ায় আমি সি. আই. ডি. র লোক ভেবেছিলুম, এখন দেখছি আপনি পাকা সিনেমা এ্যাক্টর।

—আমি সি. আই. ডি.! আমি সিনেমা এ্যাক্টর! বাঃ!

—আপনি সিনেমার অভিনেতা নন? সারাদিন ত ছিলেন এ্যাকট্রেসের গাড়ীতে, সুন্দর বক্তৃতাও দিচ্ছিলেন।

—বক্তৃতা! আমি বক্তৃতা দিচ্ছিলুম!

—যদি ভুল বুঝে থাকি ক্ষমা করবেন, আমার মনে হচ্ছিল, আপনি খালি গাড়ী পেয়ে পার্ট রিহার্সেল করছিলেন।

করুণভাবে দেবপ্রিয় হাসলে। ধীরে ধীরে বললে, ঠিক বলেছ তুমি আমি রিহার্সেল দিচ্ছিলুম বটে।

দেবপ্রিয় চুপ করে বসল।

সমর প্রশ্ন করলে, আপনি কি শিপ্রার গাড়ীতে ছিলেন না?

—ছিলুম, তাতে কি প্রমাণ হয়?

—প্রমাণ কিছুই হয়ত করা যায় না। শিপ্রার নাচ আমার ভাল লাগে। তার প্রমাণও যদি চান, আমি দিতে পারব না।

—না, প্রমাণ আর চাই না।

দেবপ্রিয় স্থিরদৃষ্টিতে সমরের দিকে চাইলে। ভাবলে, যদি এই যুবকের মত তার তারুণ্য, শ্রী, উদ্বেলতা থাকত, হয়ত বা শিপ্রার মন জয় করতে পারত।

দেবপ্রিয় বললে, দেখুন, আমি অভিনেতা নই, রিহার্সেলও দিচ্ছিলুম না, I was thinking aloud.

সমর গম্ভীরভাবে বললে, আপনি তা হ'লে নিশ্চয়ই কবি।

দেবপ্রিয় হেসে বললে, ভুল হল, আমি সাব-এডিটারী করি; সাব-এডিটার কবি শুনেছেন?

সমর বললে, এ বিষয়ে আমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। আচ্ছা শিপ্রা দেবীর সঙ্গে আপনার খুব আলাপ নিশ্চয়।

—কেন বলুন ত?

—তার সুপারিসে যদি কোন সিনেমা-কোম্পানীতে কাজ পাওয়া যায়—

—কি পাস?

—এম্. এ. পাস করেছি; এখন বাংলার বহুশত বেকার যুবকের একজন—সেজন্য চাকরির বাচ-বিচার করি না।

—কি পার্ট তুমি করতে পার?

—ধরুন কম্যুনিস্ট, কলকারখানায় গিয়ে স্ট্রাইক করাচ্ছে, গ্রামে গিয়ে চাষাদের ক্ষেপাচ্ছে, এ পার্ট মন্দ পারব না।

—তা ত পারবে, তোমরাই বিপ্লবের অগ্রদূত।

—কোন্ বিপ্লবের?

—দেখছ না ভাঙন ধরেছে, উনবিংশ শতাব্দীর গড়া জীর্ণ প্রাসাদ আর থাকছে না। কিন্তু আমি কম্যুনিজমে বিশ্বাস করি না।

—কিন্তু বিপ্লবে বিশ্বাস করেন?

—এখানে বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন ওঠে না, এটা প্রাকৃতিক ঘটনার মত, ঝড়ের মত, বন্যার মত, শীতের পর বসন্তের জাগরণের মত ঘটবে। বিপ্লব নানা রূপে আসবে—যুদ্ধ, যুদ্ধ—নব সৃষ্টি! রুশিয়ার কম্যুনিজম্ কি গতযুদ্ধের ফল নয়?

সমর হেসে বললে, তার চেয়ে হ্লাদিনী শক্তির রূপ বর্ণনা করুন, শুনি।

দেবপ্রিয় সমরের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে বসল।

প্রেমদাস বললেন, আশ্চর্য, দেখ অনুপমা, তোমার কণ্ঠস্বরে তোমাকে চিনলুম; তোমায় যখন দেখেছিলুম, তুমি চঞ্চলা কিশোরী, গিরিঝরনা আজ দু'কূল-ভরা নদী হয়েছ, কিন্তু সে কলধ্বনি একই সুরে বাজছে।

দীপ্তনয়নে অনুপমা সন্ন্যাসীর দিকে চাইলে। মালার রুদ্রাক্ষগুলি তাকে মুগ্ধ করল। ওই গেরুয়া-বসন-পরা লোকটির মধ্যে কি রহস্যময় শক্তি রয়েছে, সে শক্তির পরিচয় সে পেতে চায়।

প্রেমদাস বললেন, গাড়ীতে আর একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হল, তাকেও বহুদিন আগে ছেলেবেলায় দেখেছিলুম।

পিঠের কুসানে ঠেস দিয়ে এলিয়ে বসে অনুপমা বললে, কে ?

—পাশের গাড়ীতে যে অভিনেত্রীটি যাচ্ছে, শিপ্রা !

—শিপ্রা ? আপনার শিষ্যা নাকি ?

—না, আমার শিষ্যা নয়, তার বাবা-মাকে আমি জানতুম।

—শিপ্রার অভিনয় আমি দেখেছি, তার নাচ আমার ভাল লাগে, কিন্তু অভিনয় মনকে স্পর্শ করে না, মনে হয় বড় বানিয়ে করছে, জীবনে সত্যিকার দুঃখ সে জানে নি।

—অভিনয়টা কি বানানো জিনিস নয় ?

—দেখুন, জীবনে আমরা বানিয়ে চলবার চেষ্টা সারাক্ষণ করছি, অলীক স্বপ্ন ভেবে, মিথ্যার রং দিয়ে। জীবনে গভীর সত্যের, ব্যথার অনুভূতি স্টেজের অভিনয়েতেই ঠিক করে প্রকাশ করা যায়। সে জন্য জীবনে মিথ্যার এ্যাক্টিং করা বড় সহজ কিন্তু স্টেজে সত্যের এ্যাক্টিং করা বড় শক্ত।

—আমি ছোটবেলায় যাত্রা দেখেছি, থিয়েটার কখনও দেখিনি।

—আপনি কি শিপ্রাকে ছোটবেলায় জানতেন, তখন সে কেমন ছিল ?

—ছোটবেলায় তাকে ভাল করে দেখিনি, তখন আমি ছিলুম তান্ত্রিক।

—তান্ত্রিক !

অনুপমা সোজা হয়ে বসল, প্রশ্ন করলে, এখনও কি আপনি তান্ত্রিক ?

কৃষ্ণ ভ্রূলতামণ্ডিত আয়ত নয়নের কৃষ্ণতারকা জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে, অধরের সুচিক্কণ শুভ্রচর্মে অরুণাভা, হাঙ্গেরীয় ব্লাউজের নীচে বক্ষপঞ্জর স্পন্দিত।

বিমুগ্ধ নেত্রে প্রেমদাস অনুপমার দিকে চাইলেন, তুষারশুভ্র উত্তুঙ্গ হিমাচলশিখরে উষারুণের দ্যুতির মত রক্তিমা।

অন্তরের আবেগ দমন করে প্রেমদাস ধীরে বললেন, ভয় নেই, আমি এখন তান্ত্রিক নই।

অনুপমা হেসে উঠল। যে-হাসিতে জগদীশ মন্ত্রমুগ্ধ হয়েছে, সমরের তরুণচিত্ত পূজার প্রদীপের মত জলে উঠেছে, সে হাসির অপরূপতায়, নয়নতারকার অলৌকিক দীপ্তিতে প্রেমদাসও বিচলিত হলেন।

হাসির স্বরে অনুপমা বললে, তান্ত্রিককে ভয় করি, কে আপনাকে বললে? আমি তান্ত্রিক সন্ন্যাসীকে সত্যিকার জানতে চাই। কপালকুণ্ডলার কাপালিককে দেখবার জন্যে ছেলেবেলায় মাঠে, নদীর ধারে একা ঘুরেছি। তন্ত্রশাস্ত্র সম্বন্ধে বাবার কত বই ছিল দেখেছেন ত, সেগুলো লুকিয়ে পড়তুম, বিশেষ কিছুই বুঝতে পারতুম না—তবু পড়তুম—মনে হত সে এক অপূর্ব শক্তির জগৎ—দেখ্‌তে ইচ্ছে হত অমাবস্যার অন্ধকারে শ্মশানে তান্ত্রিক কি ভাবে সাধনা করে—

অনুপমা হঠাৎ চুপ করলে, যেন আর সে কথা কইতে পারছে না, স্থির হয়ে সে বসল—গভীর স্থির দৃষ্টিতে প্রেমদাস তার দিকে চেয়ে আছেন, সে দৃষ্টিতে কি দীপ্তি, কি জ্বালা! কাঁচা-পাকা দাড়ি আগুনের শিখার মত, তাঁর শরীর হতে শুধু তেজ নয় একটা তাপ বিকীর্ণ হচ্ছে, ভয় করে, আবার এগিয়ে যেতেও ইচ্ছে করে—মধ্য রাতের স্তব্ধ অন্ধকারে হঠাৎ কোথাও আগুন লাগলে যেমন ভয় করে আবার দাবাগ্নির মূর্তি দেখতে ছুটে যেতে ইচ্ছে করে।

ভয় দূর করবার জন্যে অনুপমা হেসে উঠল।

আপনাকে সংযত করে প্রেমদাস স্তব্ধ হয়ে বসলেন, তাঁর মুখ রুক্ষ, চক্ষুতারকা অগ্নিগোলকের মত। অনুপমার মুখ হতে দৃষ্টি সরিয়ে

তিনি খোলা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চাইলেন, উর্ধ্বে আকাশের দিকে নয়, নিম্নে অরণ্যের সঘন অন্ধকারের দিকে।

এবার অনুপমার ভয় হল। একটু সরে এককোণে সে বসলে। এলার্ম চেন কোথা থেকে টানা যায়, কম্পিত দৃষ্টিতে খুঁজতে লাগল। গাড়ী বড় দুলছে, আবার বুঝি তার কাশির বেগ আসে! কখন পরের স্টেশনে এসে থামবে? অজানিত ভাবে সে টাইমটেবল হাতে টেনে নিলে কিন্তু খুললে না, চুপ করে বসে রইল। সন্ন্যাসীর দীর্ঘ বিপুল পৃষ্ঠ দেখাচ্ছে যেন হলুদবর্ণের কোন অজানা জন্তু গুঁড়ি মেরে বসে।

করুণ কণ্ঠে অনুপমা বললে, আপনি কথা বলুন।

লৌহচক্রের বিরামহীন কর্কশধ্বনি আর সে শুনতে পারছে না, তার কান বুঝি ফেটে যাবে, সহচর মানুষের স্নিগ্ধস্বর সে শুনতে চায়, তা না হলে ভয় দূর হচ্ছে না।

অনুপমার দিকে না চেয়ে সন্ন্যাসী বললেন, ভয় নেই, কোন ভয় নেই, স্থির হও, শান্ত হও।

কি স্নিগ্ধ স্বর সন্ন্যাসীর! তাঁকে সে ভয় করছিল! গ্রীষ্মের গুমোট রাতে হঠাৎ-জাগা বাতাসের মত এ কণ্ঠস্বর চারিদিকের তাপ দূর করে দিল।

ব্যথিত কণ্ঠে অনুপমা বললে, আপনি এদিকে তাকান, আমার দিকে চেয়ে দেখুন একবার, আকাশের দিকে অমন চেয়ে আছেন কেন? আপনার মুখ দেখি, তা না হলে আমার ভয় দূর হবে না।

প্রেমদাস ধীরে মুখ ফেরালেন। দুই নয়নে অবিরল ধারায় অশ্রু ঝরছে। কি ব্যথিত শীর্ণ মুখ! অশ্রুপূর্ণ নয়ন কুজ্ঝটিকাচ্ছন্ন প্রভাতের মত।

অনুপমার ইচ্ছা হল সন্ন্যাসীর হাত জড়িয়ে ধরে।

অস্ফুটস্বরে সে বললে, আপনি কাঁদছেন ?

হেসে প্রেমদাস বললেন, কাঁদা সন্ন্যাসীর পক্ষে কি লজ্জার কথা, সন্ন্যাসীও মানুষ, একথা ভুলে যাও কেন ? শান্ত হও তুমি।

অনুপমা ধীরে বললে, আমি আপনার শিষ্যা হব।

প্রেমদাস প্রশ্ন করলে, কেন ?

অনুপমা সন্ন্যাসীর মুখে চোখ রেখে বললে, আমি শান্তি চাই, আমার যা রোগ, বেশিদিন বাঁচবার কথা নয়—আচ্ছা, কাঁদলে মন অনেক হালকা হয়, আমি কিন্তু কাঁদতে পারি না—কান্না পায় না।

সন্ন্যাসী স্নিগ্ধস্বরে বলেন, রাগ হয় ? ক্ষোভ ?

অনুপমা বিস্মিত হয়ে বললে, ঠিক বলেছেন। ভয়ঙ্কর রাগ হয় সবার ওপর—আর নিজেকে ভোলাতে নানারকম কল্পনার জাল বুনি—উপন্যাস, কবিতা পড়ি—সাহিত্যের জগৎ বড় সুন্দর জানেন, বেশ ভুলে থাকা যায়।

প্রেমদাস মৃদু হেসে বললেন, এখন সাহিত্যের জগতে গিয়েও শান্তি আনন্দ পাচ্ছ না, তাই ধর্মের জগতে শান্তির সন্ধান করতে চাও ?

অনুপমা চিন্তিতভাবে বললে, হয়ত আপনি ঠিক বলছেন, অত আত্মবিশ্লেষণ করিনি, ধর্মজগৎ একটা কল্পলোক মনে হয়—এও ত মানুষের কল্পনার খেলা।

প্রেমদাস বললেন, তুমি সংসার সমাজ থেকে পালিয়ে ধর্মের সন্ধান করতে চাচ্ছ, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত সুখ-দুঃখের মধ্যে থেকেই ধর্মের সাধনা করতে হবে—একটা স্টেশন বোধ হয় কাছে এল, আমি এখানে নামব।

অনুপমা উৎসুকভাবে বললে, আপনি ত বোম্বে যাচ্ছেন, কাল দেখা হবে ?

সন্ন্যাসী একটু বিস্মিতভাবে বললেন, বোধ হয় মাঝের কোন স্টেশনেই নেমে যাব।

অনুনয়ের কণ্ঠে অনুপমা বললে, না, না চলুন বোম্বেতে। আর দেখা পাব না? আর একবার আসবেন—মাঝের কোন স্টেশনে আসবেন!

সন্ন্যাসী বিচলিত হয়ে অনুপমার দিক হতে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, অনুপমার চোখ আবার জল্ জল করে উঠেছে।

আবেগ দমন করে প্রেমদাস তারা-ভরা রাত্রির দিকে চাইলেন। আপন মনে জপ করতে লাগলেন, শান্ত হও, তুমি শান্ত হও।

ছোট একটা ষ্টেশনে হঠাৎ ট্রেন থামল!

প্রেমদাস চমকে উঠে দাঁড়ালেন। অনুপমার দিকে একবার ফিরে চাইলেন।

কি কাতর দৃষ্টিতে অনুপমা চেয়ে আছে তাঁর দিকে! ওই প্রদীপ্ত নয়নে এ কাতরতা দেখলে বিস্মিত হতে হয়।

প্রেমদাস ধীরে বললেন, আমি এখন যাই।

কাতরকণ্ঠে অনুপমা বললে, না, না, যাবেন না, বসুন। একা থাকতে বড় ভয় করবে আমার। বাইরে অন্ধকার বড় গভীর মনে হচ্ছে।

প্রেমদাস বললেন, এখন আমায় যেতে হবে অনুপমা। কোন ভয় নেই তোমার, শান্ত হও তুমি, শান্ত হও।

অনুপমা সোজা হয়ে উঠে বসে বললে, সে শান্তির পথ আমায় বলে দিন আপনি। আপনি পালাচ্ছেন কেন অমন করে?

চমকিত হয়ে প্রেমদাস অস্ফুটস্বরে বললেন, পালাচ্ছি! বোধ হয় পালাচ্ছি, কি জানি তুমি আমায় বড় বিচলিত করে তুলেছ, আমার মনের শান্তিভঙ্গ করেছ।

একটু রুক্ষস্বরে অনুপমা বলে উঠল, যত দোষ আমাদের, নয়? আচ্ছা যান আপনি, আপনাকে ধরে রাখতে চাই না।

প্রেমদাস বললেন, এখন যাই, পারি যদি আর একবার আসব। ভুলে তোমার গাড়ীতে উঠে পড়েছিলুম, এ ক্ষণিকের আসা ভুলে যেও।

অনুপমা একটু ব্যঙ্গের সুরে বললে, আমি সন্ন্যাসী নই, অত সহজে ভুলি না। ভেতরে আপনি এখনও এত দুর্বল কেন? যান আপনি, তপোভঙ্গ করতে চাই না। কোন্ সাহসে পাশের গাড়ীতে যাচ্ছিলেন!

অনুপমা হেসে উঠল।

প্রেমদাস বুকে একটা ব্যথা অনুভব করলেন। কুপের দরজা খুলে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে লাফিয়ে পড়ে যেন টলতে লাগলেন।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অনুপমা বললে, আপনার গাড়ী পেছন দিকে, গাড়ী কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াবে না, বরঞ্চ পাশের গাড়ীতে উঠে পড়ুন।

অনুপমার কোন কথা বোধ হয় প্রেমদাসের কানে গেল না। তিনি সামনে এগিয়ে চললেন। রাধাকান্তের টাকার জন্য যে গণেশের সঙ্গে দেখা করতে নিজের গাড়ী থেকে নেমেছিলেন, সে কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেলেন। এগিয়ে চললেন ইঞ্জিনের দিকে। মনে হল ট্রেনটা দুলে উঠছে। চলন্ত ট্রেনে প্রেমদাস লাফিয়ে উঠলেন। তাঁর গাড়ীতে কেউ নেই দেখে নিশ্চিন্ত হলেন। তিনি এখন একা থাকতে চান। ধ্যানে বসতে চান।

প্রেমদাস স্থির হয়ে বসতে পারলেন না। খোলা দরজায় কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন একটা বেঞ্চি ধরে। নিম্নে বনানীর কৃষ্ণধারা বয়ে চলেছে রহস্যময় কালস্রোতের মত। ট্রেন ছুটে চলেছে।

অনুপমার ব্যঙ্গভরা কথা কানে বেজে উঠল, পালাচ্ছেন কেন অমন করে?

প্রেমদাস ভাবতে লাগলেন, সত্যিই ত পালিয়ে এলুম। সেই যুবক তান্ত্রিক এ প্রৌঢ় বৈষ্ণবের মধ্যে মাঝে মাঝে জেগে ওঠে; বলে, এ প্রেমের ধর্ম, সেবার ধর্ম আর নয়, শক্তির ধর্মকে জাগাও, জাগ্রত কর উদ্দীপ্ত কর হ্লাদিনী শক্তিকে।

শ্রাবণের অন্ধকার রাত্রে সর্পিল বিদ্যুন্মালার চকিত দীপ্তিতে উচ্ছল কালিন্দী তীরে কম্পিত অন্তরে রাধিকার অভিসার নয়; অমাবস্যার তামসী রাত্রে ভৈরবীচক্রে ভৈরবীকে আহ্বান কর, পরমাসুন্দরী নারীর অপরূপ লাবণ্য এ অন্ধকারে লুপ্ত হয়ে যাক, মহাশক্তির উদ্বোধন কর, নৃমুণ্ডমালিনী কালিকার নৃত্য শুরু হোক।

প্রেমদাস বেঞ্চির এক কোণে বসে পড়লেন। স্থির হয়ে বসতে পারলেন না, দুলতে লাগলেন, উচ্চৈঃস্বরে বলে উঠলেন, যা দেবী সর্বভূতেষু রূপবতীরূপেন সংস্থিতা—অনুপমারূপেন—মোহিনীশক্তিরূপেন—অপরূপ সৌন্দর্যরূপেন—

প্রেমদাস দাঁড়িয়ে উঠলেন। মুষ্টিবদ্ধ বাম হস্ত কম্পিত। কম্পিতকণ্ঠে বলে উঠলেন, জয় করতে হবে, এ মোহ জয় করতে হয়; নারীর সৌন্দর্য কেন আমাকে এমন বিচলিত করে!

ক্লান্ত অবসন্নতায় প্রেমদাস আবার বসে পড়লেন। প্রথম যৌবনের প্রেমস্বপ্নভরা নারীসৌন্দর্যমণ্ডিত বেদনা-উদাস দিনগুলি মনে পড়ল। তখন তিনি যেমন সৌখিন তেমনি সুরসিক খেয়ালী ছিলেন। কখনও

বসতেন ছবি আঁকতে, কখনও আরম্ভ করতেন বেহালা বাজাতে। ভাবতেন, চণ্ডীদাসের মত প্রেমের কবিতা লিখব, রেনোয়াঁর মত নারীসৌন্দর্য আঁকব, নীট্‌সের মত নব মানবের কথা বলব। বন্ধু শিল্পীর স্টুডিওতে রাতের পর রাত মদের পেয়ালার সামনে আর্ট, নারী, সভ্যতা, সমাজ, কত কথাই না আলোচনা হয়েছে।

সেই চির-তরুণ শিল্পী বুভুক্ষু হয়ে জেগে ওঠে, জীবন রসের শূন্যপাত্র কম্পিত হস্তে ধরে দাঁড়ায়।

আজ সন্ধ্যায় অনুপমাকে দেখে মনে পড়ল, স্টুডিওর কত সুন্দরী মডেলের মূর্তিসৌন্দর্য, কত যুবতী বাঈজীর কণ্ঠসঙ্গীতমাধুরী, কত তরুণী প্রেমিকার চকিত ব্যাকুল চাউনি।

তারপর, ভৈরবীচক্রে কত যোগিনী!

কিন্তু তন্ত্র-সাধনায় তিনি কোন সুন্দরী নারীর সহায়তা পাননি। সেজন্য বার বার তাঁর মন বিক্ষিপ্ত বিরুদ্ধ-ভাবাপন্ন হয়েছে। অনুপমার মত কোন অপরূপা সুন্দরী নারীর সাহচর্য পেলে হয়ত তিনি তন্ত্র-সাধনায় সফলকাম হতেন।

প্রেমদাস চমকে দাঁড়িয়ে উঠলেন।

অনুপমার নয়নে কোন্ নবলোকের অপূর্ব আলোক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। সে ত নীপবনে মিলনোৎকণ্ঠিতা রাধিকার আশা-সঙ্কুল দৃষ্টি নয়; সে যে কালীর উদ্যত খড়্গের ঝল্‌মলানি, কুলকুণ্ডলিনীর দিব্যদ্যুতি।

অনুপমা তাঁর শিষ্যা হতে চায়, ভাবছে ধর্মের পথে সে শান্তি পাবে। শান্তি কোথায়? লোকে দেখে বাইরের শান্তি, অন্তরে অহর্নিশি নব নব কামনার সংঘাত চলেছে, ক্রুদ্ধ সর্পের মত বাসনা উদ্যত হয়ে ওঠে।

যুক্তকরে প্রেমদাস দাঁড়িয়ে উঠলেন, হে কৃষ্ণ! যেমন তুমি বিষধর কালিয় দমন করেছিলে তেমনি দমন কর এ ক্ষুব্ধ কামনাকে তোমার কঠোর পদাঘাতে।

সমর বললে, সন্ন্যাসীটা এসেছিল বুঝি!

অনুপমা ম্লান হেসে বললে, হাঁ এসেছিলেন।

—দেখলুম গাড়ী গাড়ী ঘুরে বেড়াচ্ছে, কি মন্ত্র ঝেড়ে গেল, তোমাকে বড় অসুস্থ দেখাচ্ছে, দিদি।

—উনি সাধারণ সন্ন্যাসী নন, শক্তিমান পুরুষ।

—হাঁ, জানি, মেয়ে-শিষ্যা যোগাড় করতে ওস্তাদ।

—ওঁর কথা থাক। তুমি এসে আমায় বাঁচালে ভাই।

—তুমিও যে ভক্তাদের দলে ভিড়বে, ভাবিনি।

—আমার কেমন বড় ভয় করছিল; শুধু ভয়ই নয়, মনের মধ্যে যেন কোন জোর নেই—মনে হচ্ছিল, যদি একটা কলিসন্ হয়, আমি মরে যাই, বেশ হয়।

—তুমি সুখী নও, তোমার বিবাহিত জীবন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, এ বুর্জোয়া সমাজ ভেঙে কম্যুনিস্ট-স্টেট না হলে মানুষের সত্যিকার সুখ হবে না।

—সেটা কবে হবে ভাই? মরার আগে দেখে যেতে পারব?

—ইয়োরোপে আর একটা যুদ্ধ বাধলেই হবে, গত মহাযুদ্ধে দেখলে না, কত রাজ্য লুপ্ত হল, কত রাজার মুকুট ধুলায় লুটিয়ে পড়ল। আগামী যুদ্ধে পৃথিবী-জোড়া ধনতান্ত্রিক সভ্যতা ভেঙে

চুরমার হয়ে সেই ধ্বংসস্তূপের ওপর নতুন সমাজ গড়ে উঠবে—কম্যুনিজ্‌ম্‌।

সমরের তরুণ দীপ্ত মুখের দিকে অনুপমা ক্লান্ত করুণ চোখে চাইলে। কি অপূর্ব স্বপ্ন! কি সহজ বিশ্বাস!

অনুপমা ধীরে বললে, দেখ সমর, তোমার মত ভাবতে চাই, কিন্তু পারি না। তরুণ তুমি, তাই ভবিষ্যতের স্বপ্নে মুগ্ধ হয়ে এগিয়ে চলতে পার, কিন্তু আমরা বর্তমান জীবনটাকেই উপভোগ করতে চাই।

সমর আবেগের সঙ্গে বলে উঠল, ভুল! ভুল দিদি। এখন সবাইকে ভাঙনের কাজে লাগতে হবে।

অনুপমা হেসে বললে, আমি নিজেই যে ভাঙা। ফ্যানটা এদিকে একটু ঘুরিয়ে দাও ত ভাই, কেমন গরম লাগছে।

সমর সিলিং-ফ্যানটা অনুপমার দিকে ঘুরিয়ে দিয়ে বললে, তুমি শুয়ে পড, সেই বড়িটা কি আবার খাবে?

এলিয়ে শুয়ে অনুপমা বললে, মানব-সভ্যতার কথা থাক্, মালতীর খবর বল, সারাদিন তার আর দেখা পাওয়া গেল না, বিকেলে চা খেতে আসতে বলেছিলুম, এল না ত।

সমর একটু চঞ্চল হয়ে বললে, আমি ত তার খবর রাখবার ভার নিইনি, তবে দেখলুম কল্যাণকুমারের সঙ্গে চা খাচ্ছিলেন—

অনুপমা হেসে উঠল, বললে, কাজটা তুমি পছন্দ করনি মনে হচ্ছে।

সমর তাচ্ছিল্যের সুরে বললে, কাজটার মধ্যে এমন কিছু অপছন্দের নেই, মামুলী ব্যাপার, তবে ওসব ঢং ন্যাকামি আমার ভাল লাগে না। কমরেড হবার সাধ কেন?

অনুপমা কটাক্ষ করে বললে, তুমি চাও ফ্রি লাভ!

সমর গম্ভীরভাবে বললে, ঠাট্টা কোরো না দিদি, শেকলপরা প্রে হয় না।

অনুপমা বুঝলে ব্যথায় সমরের মন টন্‌টন্ করছে। স্নিগ্ধস্বরে সে বললে, দেখ সমর, মালতী তোমায় ভালবেসেছে। তার মুখ দেখে আমি তা বুঝেছি। কিন্তু তুমি ত সে ভালবাসা চাও না, স্নিগ্ধ গৃহকোণে মাটির প্রদীপের শিখার মত সে ভালবাসা—তুমি চাও প্রলয়ের আগুন।

—ভালবাসায় আমি বিশ্বাস করি না। এ ভালবাসা বুর্জোয়া সভ্যতার সৃষ্টি। ধনসঞ্চয়, সম্পত্তিকে ভালবাসার এ আর এক রূপ।

—এ তুমি কেতাবের বুলি বলছ। সত্যি ভালবাসা কি তুমি এখনও জান নি।

—তুমি কি জেনেছ?

—আমার কথা থাক্। গল্পটা শুনি, কল্যাণের সঙ্গে মালতী কোথায় চা খাচ্ছিল?

—রেস্তোরাঁ-গাড়ীতে।

—আর তাই দেখে তোর 'জেলসি' হচ্ছিল!

—ফুঃ!

—কল্যাণের সঙ্গে মালতীর বিবাহ হলে মন্দ হয় না।

—যদিও, তোমার মতে, সে আমাকে ভালবাসে।

—কিন্তু তুই ত বিয়ে করবি না, তোর প্রলয়-পথের সঙ্গিনী কে হবে!

—তবে অত পোজ্ কেন?

—যে মালতী তোকে ভালবাসে সে ত ঘর ছেড়ে বার হয়েছে দুর্গম অভিসারে, কিন্তু সাহসে তার কুলাচ্ছে না, যদি কেউ ডাকে

ঘর বাঁধতে, সে আর এগুতে পারবে না—ঘর বাঁধা আমাদের রক্তে—

—তুমিও বুঝি সেজন্য বিয়ে করেছ দিদি!

—হয়ত তা সত্যি! কিন্তু ঘর গড়তে পারলুম কই? দম আটকে আসে তবু শেকল খুলতে ইচ্ছে করে না। তোর সঙ্গে কথা কয়ে মন অনেকটা হালকা হল। একা গাড়ীতে কত অদ্ভুত কথা ভাবছিলুম। ওই অন্ধকার বনগুলির দিকে চেয়ে মনে হচ্ছিল, চলে যাই ওদের মধ্যে, ওই গিরিবনে কি রহস্য লুকান আছে! ওরা যেন আমায় ডাকছে। মনে হচ্ছিল, সন্ন্যাসী যদি বলেন, এস আমার সঙ্গে, আমার অলৌকিক শক্তিতে তোমার ব্যাধি সারিয়ে দেব, তারপর ভারতের রহস্যময় অরণ্য-পর্বতে পরিভ্রমণ করব—আমি চলে যেতে পারি সন্ন্যাসীর সঙ্গে—

—ওই সন্ন্যাসীর সঙ্গে?

—সে কি, কোন সন্ন্যাসীর সঙ্গে? সে যে নবজীবনের অনুভূতির সন্ধানে—পুরানো জীবন ভেঙে গড়তে।

—কিন্তু এ ধনতান্ত্রিক সভ্যতা, এ সমাজ-ব্যবস্থা, এ রাষ্ট্রমূর্তি না ভাঙলে নতুন জীবন গড়বে কি করে? তুমি হয়ত পারবে দিদি—

—কি হয়ত পারব?

—চলো তুমি ইয়োরোপে, যাবে আমার সঙ্গে? তোমায় সারিয়ে তুলব—তারপর—

মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে অনুপমা বললে, চুপ করো সমর, চুপ করো, আমার মধ্যে যে আগুন আছে তার জ্বালা তোমায় দিতে চাই না।

ক্লান্তনয়নে অনুপমা চাইলে।

মন্ত্রমুগ্ধের মত সমর তার দিকে চেয়ে।

অনুপমা অনুভব করলে, সমর তার অসামান্য রূপে বিমোহিত, অন্ধকার নিশীথের চঞ্চল বাতাসে মশালের আগুনের শিখার মত তার তরুণ প্রাণ কাঁপছে।

দু'জনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

ওপরের বাঙ্কের এক কোণে বিরিঞ্চি ঘুমিয়ে পড়েছিল। এমন কোণ ঘেঁষে সে ছিল যে প্রেমদাসের চোখে পড়েনি।

সন্ধ্যা হতে বিরিঞ্চির শরীর ভাল নেই। পেটের ব্যথা অসহ্য হয়ে ওঠেনি, তবে শরীর বড় ক্লান্ত। বোধ হয় এত দীর্ঘকাল রেলগাড়ীর ঝাঁকুনিতে দেহ অবসন্ন হয়ে পড়েছে।

ফতেসিং-এর কথা শুনে সে বিশেষ উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল। ঠাকুর প্রেমদাসের পা জড়িয়ে ধরে ছোট মেয়ের বিবাহের টাকা কোন রকমে যোগাড় করতেই হবেই।

মাঝে স্টেশনে গাড়ী থামতে রাধাকান্ত চলে গেল ফতেসিং-এর সঙ্গে, বোধ হয় সন্ন্যাসীর সন্ধানে। বিরিঞ্চি আর বসে থাকতে পারল না। নিজের বাঙ্কে উঠে শুয়ে পড়ল। অবসাদে সে ঘুমিয়ে পড়ল। প্রেমদাস যখন গাড়ীতে উঠলেন, সে জানতে পারল না।

গাড়ীর এক ঝাঁকুনিতে বিরিঞ্চির ঘুম ভেঙে গেল। সে স্বপ্ন দেখছিল, তার ছোট মেয়ে বিমলা লাল বেনারসী পরে বিবাহের বধূবেশে তার সামনে দাঁড়িয়ে, গলায় মুক্তার হার, হাতে সোনার কঙ্কণ, কানে হীরের দুল ঝল্‌মল্ করছে। বিমলা কেঁদে বলছে, বাবা আমি বিয়ে করব না, বাবা আমি শ্বশুরবাড়ী যাব না। আর বিরিঞ্চি

হেসে বলছে, দূর বোকা মেয়ে, বিয়ে করবিনি কি! দেখবি বরকে কত ভাল লাগবে, তখন আর আসতে চাইবিনি।

ঘুম ভেঙে গেল কিন্তু সালঙ্কৃতা বিমলার ছবি তার চোখে যেন ভাসছে; বিরিঞ্চির চোখ ছল্‌ছল্‌ করে উঠল।

উঠে বসে বিরিঞ্চি দেখলে, প্রেমদাস মুদিতনয়নে স্থির হয়ে ধ্যানের আসনে গাড়ীর মেজেতে বসে।

ঠাকুর গাড়ীর ধুলায় কেন? বেঞ্চিতে ত বসলে পারেন।

বিরিঞ্চি তাড়াতাড়ি বাঙ্ক হতে নামলে। প্রেমদাস নীচে বসে, সুতরাং বেঞ্চির গদিতে বসা চলবে না। প্রেমদাসের সামনে সে গাড়ীর মেজেতে বসে দুই হাত জোড় করে প্রার্থনার সুরে বললে, ঠাকুর একটি নিবেদন আছে, বিরিঞ্চিকে তরিয়ে দিন প্রভু।

প্রেমদাস কিন্তু চোখ মেলে চাইলেন না, কোন কথাও কইলেন না।

বিরিঞ্চি ভাবলে, ঠাকুর গভীর ধ্যানমগ্ন। ঠিক এই সময় কেন ধ্যানে বসলেন? এখন কেউ নেই, একেবারে পা জড়িয়ে কেঁদে মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা করে নেওয়া যেত। হঠাৎ গাড়ী থেমে যেতে পারে, তারপর ফতেসিং, রাধাকান্ত—সব এসে হাজির হলে মুশকিল।

বিরিঞ্চি যুক্তকরে জোর গলায় বললে, ঠাকুর, বিরিঞ্চিকে এবার কৃপা করুন।

প্রেমদাস বিচলিত ভাবে চোখ মেলে চাইলেন। সম্মুখে নতজানু বিরিঞ্চিকে দেখে বিরক্তির সুরে বলে উঠলেন, এ কি! এখানে এমন করে বসে কেন? তুমি কোথায় ছিলে?

দীনভবে বিরিঞ্চি বললে, আমি বাঙ্কে ঘুমিয়ে পড়েছিলুম, জেগে দেখি, ঠাকুর এই গাড়ীর ধুলায় ধ্যানস্থ বসে। আমি কি আর ওপরে থাকতে পারি?

প্রেমদাস সন্দিগ্ধস্বরে বলে উঠলেন, এতক্ষণ ঠিক ঘুমোচ্ছিলে ?

—হাঁ ঠাকুর, স্বপ্ন দেখছিলুম আমার ছোট মেয়ের বিয়ে হচ্ছে।

—বেশ! ওঠ। অমন হাতজোড় করে আছ কেন ?

—আপনার কৃপাভিক্ষা, ঠাকুর, আপনার আশীর্বাদ।

—উঠে বস, পা ধোরো না—কি হল তোমার ?

—আপনিও উঠে বসুন।

প্রেমদাস বুঝলেন, আর স্থিরচিত্তে চিন্তা করা চলবে না। তিনি উঠে গাড়ীর গদিতে বসলেন। বিরিঞ্চি তখনও করজোড়ে তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে।

একটু বিরক্তির সুরে প্রেমদাস বললেন, কি চাই তোমার ? রাধাকান্ত বাবুর মত টাকা ধার চাই ?

—আপনি কৃপা করলে সব হবে। টাকা ধার করে আমি শুধবো কি করে ?

—ও, ধার নয়, দান।

—শুধু কৃপা করুন।

—শোন বিরিঞ্চি, আমি অতি তুচ্ছ, নগণ্য মানুষ, কৃপা করবার আমি কে ? যদি দুঃখ হতে ত্রাণ পেতে চাও কৃপাময় ভগবানকে ডাক, আমি এতক্ষণ তাঁকেই ডাকছিলুম।

—আমাদের কাছে আপনিই ভগবান, আপনিই কৃপাময়ের অংশ।

প্রেমদাস রাগ করতে পারলেন না, হেসে উঠলেন। লোকটা কি নাছোড়বান্দা। বোধ হয় মেয়ের বিয়ের জন্য টাকার দরকার, তাই প্রথমেই স্বপ্নের কথাটা বললে।

—কি, মেয়ের বিয়ের জন্য টাকা দরকার ?

—ঠাকুর ত অন্তর্যামী, মনের কথা জানতে পারেন। ঠাকুর যে কত বড়, কত উদার, বুঝতে পারিনি ; ফতেসিং-এর কাছে শুনলুম।

—ফতেসিং !

—হাঁ, তিনি এসেছিলেন ঠাকুরের দর্শন পেতে। রাধাকান্তবাবু ত তাঁর সঙ্গে আপনার খোঁজ করতে গেলেন।

প্রেমদাস বিচলিত হয়ে উঠলেন, পরের স্টেশনে গাড়ী থামলেই রাধাকান্ত ও ফতেসিং একসঙ্গে হাজির হবে, তারপরে ঋণের জন্ত দু'জনের মধ্যে দর কষাকষি চলবে। তার আগে বিরিঞ্চির টাকার ব্যবস্থা করে দেওয়া যাক।

মৃদু হেসে প্রেমদাস বললেন, ফতেসিং কি বললে, দিতে চায় টাকা ? কন্যাদায়গ্রস্তদের অর্থদান করে ও বিশেষ আনন্দ পায়—কি বলে ?

বিরিঞ্চি বুঝলে এমন সুযোগ আর আসবে না। সে আবেগের সঙ্গে প্রেমদাসের পা জড়িয়ে ধরে বললে, ঠাকুর শুধু আপনার একটি কথা—আপনি খুশি হবেন, এইটুকু তাকে জানাতে পারলেই হল।

প্রেমদাস বিরিঞ্চিকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। ঝোড়ো বাতাসে ভাঙা ডালে শুকনো পাতার মত সে কাঁপছে। তার সাদা চুলগুলি তীব্র আলোয় সাদা খড়ির তালের মত দেখাচ্ছে।

বিরিঞ্চিকে পাশে বসিয়ে প্রেমদাস বললেন, বিরিঞ্চি তুমি স্থির হও, শান্ত হও, তোমার মেয়ের বিবাহের ব্যবস্থা আমি করে দেব, নিশ্চিন্ত থাকো।

—ঠাকুরের অসীম কৃপা।

—তুমি স্থির হয়ে শুয়ে থাক, তোমার শরীর ত ভাল নেই, বিরিঞ্চি।

—হ্যাঁ সন্ধ্যে থেকে শরীর কেমন ঝিমিয়ে পড়ছে। আর শরীরে জোর

নেই। মেয়ের বিয়েটা হয়ে গেলেই আমার সংসারের সব কর্তব্য হয়ে গেল, তারপর আপনার সঙ্গ আর ছাড়ছি না—আপনার তল্পী বয়ে বাকি জীবন কাটিয়ে দেব।

—বড় দীর্ঘ তোমার যাত্রা, বিরিঞ্চি—তুমি স্থির হয়ে শুয়ে পড়। আমাকে একটু স্থির হয়ে বসতে দাও, ভগবানের কৃপা এখন আমার যে বড়ই দরকার!

বিরিঞ্চির বুক কোন্ অজানা ভয়ে দুলে উঠল। প্রেমদাসের পদধূলি নিয়ে সে বিনীতকণ্ঠে বললে, ঠাকুর ক্ষমা করবেন, ভগবানকে ডাকার মাঝে আপনায় এমন করে বিরক্ত করলুম। আমরা সংসারের জীব, বড়ই স্বার্থপর।

১০

ইতরসি স্টেশনে গাড়ী থামতে মালতী উৎসুকভাবে প্ল্যাটফর্মে নেমে দাঁড়াল। পুরানো শাড়ী ছেড়ে সে ঘননীল রঙের শাড়ী পরেছে, মহিসুরি জর্জেটে সুরাটী পাড় বসান, বেণীর উদ্যত কুণ্ডলীর সঙ্গে শাড়ীর রং মিশে গেছে, শুভ্র মুখশ্রীর বিবর্ণতা আরও অধিক হয়ে উঠেছে, চক্ষের কৃষ্ণ রহস্য সঘন। স্টেশনপ্ল্যাটফর্মের চেয়ে আষাঢ়ের প্রথম মেঘের ছায়ায় কদম্ববৃক্ষতলে দাঁড়ালে তাকে বেশি ভাল মানাত।

চঞ্চলচিত্তে মালতী দাঁড়াল।

কল্যাণের ডিনারের নিমন্ত্রণরক্ষা করা সম্বন্ধে সে কোন সিদ্ধান্ত করতে পারছে না। কখনও ভাবছে, বলবে, তার খিদে নেই, খাবে না। কখনও ভাবছে, খাবে কিন্তু তার নিজের খাবার বিলের টাকা নিজে দেবে, কল্যাণকে দিতে দেবে না। কখনও ভাবছে, যদি সমরের সঙ্গে দেখা হয়, তাকে টেনে নিয়ে রেস্তোরাঁ-গাড়ীতে খেতে যাবে, সমর সারাদিন নিশ্চয় ভাল করে খায়নি। কিন্তু সমরের দেখা পাওয়া মুশকিল! সে যখন রেস্তোরাঁ-গাড়ীতে যাবে তখন হয়ত সমর তার গাড়ীতে এসে হাজির হবে। কল্যাণ আচ্ছা মুশকিলে ফেললে।

মালতী স্থির দাঁড়িয়ে থাকতে পারলে না, টেলিগ্রাফ আফিসের দিকে এগিয়ে গেল, কল্যাণ তাকে না দেখতে পেয়ে চলেও যেতে পারে।

—মিস্ মল্লিক, একটু দাঁড়ান।

চমকে ফিরে মালতী দেখলে কল্যাণ তার দিকে দ্রুতপদবিক্ষেপে আসছে ; মুখে পাইপ নেই ; ঠোঁটের কোণে বাঁকা হাসির রেখা, যেন সে বলছে ডিনার খাবার জন্য সাজ ত করা হয়েছে দেখছি।

দ্বিধাজড়িত স্বরে মালতী বললে, দেখুন আমি বোধ হয় আপনার সঙ্গে ডিনার খেতে যেতে পারছি না।

মালতীর রক্তিমগণ্ডে চোখ রেখে কল্যাণ বললে, কেন? আর কোন নিমন্ত্রণ আছে?

হাতের চামড়ার সাদা ব্যাগ দুলিয়ে মালতী বললে, না, তা নয়— কেমন খিদে নেই।

কল্যাণ দৃঢ়স্বরে বলে উঠল, অর্থাৎ কারণ কিন্তু খুঁজে পাচ্ছেন না— এ আপনার কাছ থেকে আশা করিনি, মিস্ মল্লিক—আপনি যা বলবেন স্পষ্ট করে বলবেন, কোথাও দ্বিধা করবেন না—সাধারণ বাঙালী মেয়ের মত—

মালতী বাধা দিয়ে বললে, আমি অসাধারণ কিসে!

মালতীর গভীর কালো চোখে চোখ রেখে কল্যাণ বললে, অসামান্যা আপনি, এই যে স্টেশনে ভিড়ের মাঝে নীল শাড়ী পরে দাঁড়িয়েছেন—

মালতী বাধা দিয়ে বললে, আচ্ছা, বক্তৃতা দিতে হবে না চলুন। কল্যাণ অসঙ্গত কিছু বুঝি বলে, ভেবে, তার বুক কাঁপছে। ধীরে সে বললে, কিন্তু আমায় যে একটা টেলিগ্রাম করতে হবে।

কল্যাণ বললে, কোথায় বলুন, করে দিচ্ছি।

মালতী মুখ রাঙা করে বললে, বাড়ীতে, মায়ের কাছে।

কল্যাণ হাসির সুরে বললে, বিশেষ প্রাইভেট না হয় ত বলুন, কি জানতে হবে, আমি টেলিগ্রাম করে আসছি, আপনি ভিড়ে যাবেন কেন? পথে এমন কিছু কি ঘটল যে এখুনি মাকে টেলিগ্রাম করতে হবে?

মালতী রাগের সুরে বললে, আপনি বড় বাজে কথা বলেন, চুপ করুন দেখি একটু!

নীরবে দু'জনে এগিয়ে রেস্তোরাঁ গাড়ীর দিকে এগিয়ে চলল।

টেলিগ্রাম করে মালতী ও কল্যাণ রেস্তোরাঁ-গাড়ীতে এসে বসতে ট্রেন স্টেশন ছাড়িয়ে চলল।

কল্যাণ দেখলে, অদূরে কনক ও গ্রেগরি 'আপেরিতিভ' পান করছে। কল্যাণের ইচ্ছা ছিল তাদের টেবিলে গিয়ে বসে কিন্তু মালতী ওদিকে যেতে রাজী হল না। জানালার ধারে এক কোণের চেয়ারে মুখ রাঙা করে সে বসে পড়ল। কল্যাণ প্রথমে পাশের চেয়ারে বসবে ভেবেছিল, কিন্তু মালতীর সামনের চেয়ারে মুখোমুখি বসল। মালতীর পেলব শুভ্র অধরে রক্তের ছোপ তার বড় ভাল লাগল। কিন্তু এ মুগ্ধতায় তার কথা বলবার সহজ স্রোত মৃদু হয়ে এল। রূপোলী পাড়-বসান নীল শাড়ীর পটভূমিকায় এই তরুণীর আবেগকম্পিত আনন রহস্যময় সুন্দর, এমন স্নিগ্ধতা এমন অনির্বচনীয়তা সে কখনও কোন ইংরেজ মেয়ের মুখে দেখেনি।

মালতীর মধ্যে কি বিশেষ আকর্ষণ?

কল্যাণ ভাবলে, মালতী রেলপথে আকস্মিক আলাপে আধ-জানা বলে এমন রহস্যময়ী হয়ে উঠেছে, তার চারিদিকে কত ইসারা কত ইঙ্গিত! এ রহস্যময় মাধুর্যটুকু সে উপভোগ করতে চায়।

ভোজ্য-তালিকার কার্ড নিয়ে বয় এসে সামনে দাঁড়াতে মালতী বলে উঠল, আমি কিন্তু বেশি খেতে পারব না, বলে দিচ্ছি।

কল্যাণ হেসে বললে, বেশি খাবার জন্যে জোর করা আমার স্বভাব নয়, আমার কাজও নয়, কিন্তু কিছু ত খাবেন, কি খাবেন বলে দিন।

মালতী মৃদুকণ্ঠে বললে, আমি অত ভাবতে পারছি না, আপনি যা হয় বলে দিন।

কল্যাণ বয়কে দুটো ডিনারের অর্ডার দিয়ে মালতীর মুখের দিকে

চেয়ে বললে, দেখুন মিস্ মল্লিক, আপনাকে জোর করে খাওয়াব বলে ত আপনাকে নিমন্ত্রণ করিনি, ট্রেনের ঝাঁকুনিতে ডিনারটা একা খেতে হবে না, দু'জনে এক সঙ্গে খাব, এই আনন্দলাভ করবার জন্যেই আপনাকে ডেকেছি, এর মধ্যে আমার স্বার্থপরতা যথেষ্ট। খাওয়াটা এখানে গৌণ, আপনার সঙ্গে গল্প করাটাই মুখ্য।

মালতী হাসির সুরে বললে, আবার আপনি বানিয়ে বানিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করেছেন। আমার কিন্তু বেশি কথা বলবার মত শক্তি নেই—

কল্যাণ বাধা দিয়ে বললে, অথবা মুড নেই। অথবা যা অনুভব করছেন তা ভাষাতীত।

—দেখুন, সব সময় ঠাট্টা করবেন না।

—এই মুশকিল, মিস্ মল্লিক, আমার এমনি দুর্ভাগ্য, মনের গভীর অনুভূতির কথা বলতে গেলেই, মেয়েরা ভাবে পরিহাস করছি।

মালতী ভীতবিস্মিত চোখে চাইলে।

কল্যাণ বলে যেতে লাগল, দেখুন, এই যে রাতের অন্ধকারে মধ্যভারতের গিরিবনপ্রান্তর পার হয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ট্রেন ছুটে চলেছে, তার রেস্তোরাঁ-কারে আমরা দু'জনে বসে ডিনার খাবার প্রতীক্ষায়—মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে আপনাকে আমি খুবই জানি, আবার কখনও মনে হচ্ছে আপনি অজানা রহস্যময়ী, একটুকু চিনেছি মাত্র—অথচ ওই যে পাহাড়ের মাথায় তারাগুলি ঝল্‌মল্ করছে, বনপ্রান্তে উঠেছে চাঁদ, তাদের দিকে না চেয়ে, চেয়ে আছি এই টেবিলের দিকে—এই যে পরম বিস্ময়, রহস্যময়—অন্তরের এ ভাব কি কোন কথায় প্রকাশ করতে পারা যায়—আমি চেষ্টা করে কি পারছি প্রকাশ করতে—এই যে ঠিক আজকে রাতে ট্রেনে বসে—

মালতী এতক্ষণ মুখে রুমাল চেপে ছিল, মনে মনে ক্রুদ্ধ হচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ সে উচ্চৈঃস্বরে হেসে ফেললে, কল্যাণের কথার ছন্দে বলবার ভঙ্গীতে আর সে হাসি চেপে রাখতে পারলে না। সে যেন খুব খুশি হয়ে উঠল, মনের অস্বাচ্ছন্দ্যের ভাব দূর হয়ে গেল। কল্যাণ যেন তার মনের খুব নিকটে এসেছে।

মালতী হাসির সুরে বললে, খুব হয়েছে, এবার চুপ করুন। বেশি কথা না বলে এবার খেতে আরম্ভ করুন।

কটাক্ষে মালতীর দিকে চেয়ে কল্যাণ ডিনারের প্রথম কোর্সে মনোযোগ দিলে।

গ্রেগরি বললে, দেখছেন কনক রায় মহাশয়, সারাদিন ঘোষের কেন দেখা পাওয়া যায় নাই, তাহার কারণ এখন বোঝা যাইতেছে।

কনক হেসে বললে, ব্যাপারটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না, এই মেয়েটি ত সন্ধ্যেতে চা খেয়ে গেল।

গ্রেগরি হেসে বললে, যার সঙ্গে চা খাওয়া যায় তাহার সহিত কি ডিনার খাওয়া যায় না?

কনক বললে, তা নয়। অকারণে মেয়েদের নিমন্ত্রণ করে খাওয়ান কল্যাণের একটা খেয়াল বললেই হয়! ও বলে, ও একা রেস্তোরাঁতে খেতে পারে না, কোন নিমন্ত্রিতার সঙ্গে খেলে খাওয়াটা আনন্দকর হয়। কিন্তু, কল্যাণ কখনও একই মেয়েকে একই দিনে দু'বার খাওয়ায় না। বিলেতে কখনও দেখিনি, একদিনে একই মেয়েকে চা খেতে নিমন্ত্রণ করেছে আবার ডিনার খেতেও অনুরোধ করেছে।

গ্রেগরি বললে, তা এ রেলপথে পরিচিত কত জন পাইবে?

কনক কটাক্ষ করে বললে, ইনিও ত অপরিচিতা।

গ্রেগরি উৎসাহের সঙ্গে বললে, গার্লটির কিন্তু striking face. ওঁর একটা পোরট্রেট আঁক কনক রায় মহাশয়। আর বাঙালী মেয়েদের মুখে এমন—কি বলিব—softness—আমাদের দেশের মেয়েদের মুখে দেখি না—বোধ হয় পর্দাপ্রথার ফল।

কনক মাংসের কাটলেট কাটতে কাটতে বললে, ওটা ভুল বললেন, বাঙালী মেয়েদের মুখের রঙে যে অপরূপ স্নিগ্ধতা আছে, আমাদের মাটির ঘরের মাটির প্রদীপের আলোর মত, তোমাদের ষ্টিলফ্রেমের প্রাসাদের ইলেকৃট্রিকের তীব্র আলো নয়—এ স্নিগ্ধতা তাদের অন্তরের প্রকৃতির ও দেশের প্রকৃতির পরিবেষ্টনীর ফল, পর্দাপ্রথার জন্য হয়নি। ঘনসবুজ আমগাছের পাতায় তালতমালের আস্তরণে আষাঢ়ের মেঘের স্নিগ্ধ-ছায়াপাত দেখছ, চৈত্রের নির্মল রাতে দীর্ঘ নারিকেল পাতাগুলিতে চাঁদের আলোর ঝিকিমিকি দেখছ, ভাদ্রের বাংলায় ভরা নদীর রূপ দেখছ—তা যদি না দেখে থাক ত বাঙালী মেয়ের স্নিগ্ধ-রূপ-মাধুরী বুঝবে না, গ্রেগরি সাহেব।

গ্রেগরি হেসে উঠল। বয়কে ডেকে মদ্য-তালিকা আনতে বললে। গ্রেগরি বললে, কল্যাণের মুখ দেখিয়া তোমার কি মনে হইতেছে সে আম্র পল্লবে বর্ষার মেঘের ছায়া দেখিতেছে!

কনক একটু গম্ভীর ভাবে বললে, কল্যাণ সম্বন্ধে আমি চিন্তিত হয়ে উঠেছি। আমার মনে হচ্ছে, ওই মেয়েটিকে কল্যাণ ভালবেসেছে!

গ্রেগরি বিস্ময়ের সুরে বললে, কল্যাণ ভালবেসেছে?

কনক বললে, কেন, সে কি খুব আশ্চয্যি?

গ্রেগরি বললে, আচ্ছা আসুন এক bet রাখা যাক?

কনক বললে, bet! কি?

গ্রেগরি হেসে বললে, আমি বলছি, কল্যাণ ও মেয়েটিকে ভালবাসে নাই কিন্তু ওই সুন্দরী তরুণীকে বিবাহ করিবে—আপনার মত কি?

কনক বললে, আমি বলছি, কল্যাণ ওকে ভালবেসেছে কিন্তু বিয়ে করবে না।

গ্রেগরি বললে, তা হলে কি বাজি বলুন?

কনক একটু চিন্তিতভাবে বললে, কিন্তু আর এক সম্ভাবনা রয়েছে, কনক ওকে ভালবেসেছে এবং বিবাহ করবে।

গ্রেগরি বললে, তাহা হইলে ভালবাসিয়াছে কি ভালবাসে নাই এই প্রশ্ন বা সমস্যা। বিবাহ করিতে পারে, নাও করিতে পারে। বেশ, তবে এই এক বোতল স্যাম্পেন অর্ডার দেওয়া যাক। ডিনারের পর আমি কল্যাণকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিব—যদি কল্যাণ ওই গার্লকে ভালবাসিয়া থাকে তবে আমি এই স্যাম্পেনের দাম দিব, আর যদি ভাল না বাসিয়া থাকে তাহা হইলে আপনি দেবেন—এই বাজিতে রাজী?

কনক বললে, স্যাম্পেন আসুক—কিন্তু সত্যিকার ভালবাসা কি মিস্টার গ্রেগরি? তার রূপ আর অনুভূতি কে বলতে পারে?

কাটলেটের বাকি অংশটুকু কনক মুখে পুরিয়া চিবাইতে লাগিল।

ডিনার খেতে গণেশ রেস্তোরাঁ-গাড়ীতে যায়নি। রেস্তোরাঁ-গাড়ী হতে আহার্য ও পানীয় আনিয়েছে গাড়ীতে। আহার্যের চেয়ে পানীয় অধিক।

দেবপ্রিয়ও তাদের গাড়ীতে এসেছে। দেবপ্রিয় নিজেই এসেছে, যেন এ গাড়ীতে তার নৈশ-ভোজের নিমন্ত্রণ ছিল।

দেবপ্রিয় না আসলে গণেশ তাকে খুঁজে নিয়ে আসত, অথবা আর কোন সহভোজীকে। কারণ, রাত্রে সে একা মদ খেতে পারে না।

মদ্যপান সম্বন্ধে গণেশ যেমন অভিজ্ঞ তেমনি সুনির্বাচক। আজ সে দেবপ্রিয়ের জন্য বিশেষ করে ককটেল তৈরি করেছে। সাত-আট রকম মদের ছোট-বড় বোতল সামনে সাজান।

অবাক হয়ে শিপ্রা দেখছিল, গণেশের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দেবপ্রিয় মদ খেয়ে চলেছে, কিন্তু মাতাল হয়ে উঠছে না, শুধু চশমার কালো কাচ দিয়ে অত্যুজ্জ্বল চক্ষের দীপ্তি বৈশাখের খর-রৌদ্রের মত জ্বালাময়।

মদের গেলাস শূন্য করে একটা চেরী চিবিয়ে দেবপ্রিয় চেঁচিয়ে বলে উঠল, হাঃ হাঃ, বাজি মাৎ?

শিপ্রা ভীতভাবে তার দিকে চাইলে। গণেশকে সে ইঙ্গিত করলে, শূন্য গেলাসে আর মদ ঢালতে। দেবপ্রিয়ের ওপর তার কেমন করুণা হল। এবার কিছু খাবার খাওয়াতে পারলে নেশাটা নাও লাগতে পারে।

অনুনয়ের সুরে শিপ্রা বললে, দেবপ্রিয়বাবু, এবার কিছু solid হোক।

দেবপ্রিয় যেন চমকে উঠল, তারপর উচ্চৈঃস্বরে হাসলে, Solid, হুঁ! solid, liquid, gas—জগৎ, এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড আগে ছিল গ্যাস, সে গ্যাসে অহর্নিশি আগুন জ্বলছে—সে গ্যাস হতে হল লিকুয়িড্‌ জল, মহার্ণবে নারায়ণ ভাসছে—তারপর এল সলিড্‌ মাটি. মাংস—হাঃ হাঃ, আমরা—

গণেশ বলে উঠল, কি চমৎকার সৃষ্টিতত্ত্ব, কিন্তু মধ্যাবস্থায় থাকলেই ত বেশ হত—ভাবুন ককটেলের মহার্ণব—

শিপ্রা চঞ্চলভাবে বললে, চুপ করো, গণেশবাবু। দেবপ্রিয়বাবু, আপনি একটা মাটন কাট্‌লেট খান—বড় সুন্দর করেছে।

দেবপ্রিয় একটু রেগে বলে উঠল, দেখ, ঠকিয়ে আমায় খাওয়াতে পারবে না!

শিপ্রা বিস্ময়ের স্বরে বললে, আপনাকে কে ঠকাচ্ছে?

গণেশ কটাক্ষ করে বললে, ঠকাচ্ছ বই-কি। আমি সত্যি কথা বলছি, ওটা মাটন্ নয়, পর্ক।

দেবপ্রিয় একখানি কাটলেট তুলে বললে, বন্যবরাহ, বন্যবরাহ, কোন দোষ নেই। কিন্তু আমি ঠকছি না—তোমার অনুরোধে খাচ্ছি—ভুলিয়ে খাওয়াতে পারবে না।

একটু ভীত স্তব্ধভাবে শিপ্রা দেবপ্রিয়ের দিকে চাইলে।

দেবপ্রিয় নীরবে কাটলেট খাওয়া শেষ করলে, তারপর দাঁড়িয়ে উঠে বললে, বাজিমাৎ, এবার কি পার্ট করতে হবে?

শিপ্রা হেসে বললে, এবার একটা বক্তৃতা করুন।

দেবপ্রিয় একটু ক্রুদ্ধস্বরে বললে, দেখ, পরিহাস কোরো না, তুমি বড় এ্যাক্‌ট্রেস্ জানি, আমিও এ্যাক্‌টিং করতে পারি—কি পার্ট করতে হবে বলো?

ককটেলের গেলাস নামিয়ে গণেশ বললে, পার্ট ত আপনার জন্যে তৈরি রয়েছে, প্যারিস-ফেরতের পার্ট—

দেবপ্রিয় বেঞ্চির গদিতে বসে তার শূন্য গেলাস গণেশের দিকে এগিয়ে বললে, ঠিক বলেছ। আমি ঠিক করলুম তোমাদের দলেই যোগ দেব।

শূন্য গেলাস ভরে দিয়ে গণেশ বললে, বাজিমাৎ, কিন্তু বৌদিদি যদি আপত্তি করেন?

দেবপ্রিয় গম্ভীর হয়ে বসে রইল, পূর্ণ গেলাস স্পর্শ করলে না। যেন তার নেশা কেটে গেছে।

শিপ্রা ধীরস্বরে বললে, দেবপ্রিয়বাবু, আপনি পণ্ডিত মানুষ, আপনি কেন সিনেমাতে অভিনয় করতে যাবেন?

দেবপ্রিয় আবার আবেগের সহিত দাঁড়িয়ে উঠে বললে, আমি পণ্ডিত? বেশ! কি জানি আমরা?

দেবপ্রিয়ের চাউনিতে শিপ্রা ভয় পেলে।

—আপনি স্থির হয়ে বসুন।

—আমি মাতাল হয়েছি?

—না, না, মাতাল হবেন কেন?

—হইনি! আলবাৎ মাতাল হয়েছি, তোমরা আমায় মাতাল করেছ, পরিহাস কোরো না—অস্বীকার কোরো না। বেশ, আমি মাতাল হব। জীবন উপভোগ করতে চাই—গণেশ আমি তোমার দলের—

গণেশ ব্যঙ্গের সুরে বললে, কিন্তু আমি ত মাতাল হতে পারি না, হতে চাই, কিন্তু নেশা লাগে না।

গ্রেগরিদের টেবিলে স্যাম্পেনের বোতলটি কল্যাণের চোখ এড়ায়নি। অথচ মালতী থাকাতে তাদের টেবিলে সে যোগ দিতে পাচ্ছে না। ডিনার খাওয়া শেষ হতেই সে চঞ্চল হয়ে উঠল। এক ছোট স্টেশনে ট্রেন থামতে সে তাড়াতাড়ি মালতীকে তার গাড়ীতে পৌছে দিয়ে আবার রেস্তোরাঁ-গাড়ীতে ফিরে এল।

কনক হেসে বললে, জানতুম তুমি আসবে।

গ্রেগরি বললে, তোমার জন্যে আমরা অপেক্ষা করিতেছিলাম।

কল্যাণ কোন উত্তর দিলে না। বয়কে ডেকে আর একটি মদের গেলাস আনতে হুকুম করলে।

গ্রেগরি বললে, এ বোতলের দাম দেওয়া হয়নি।

নিজের গেলাস ভরে কল্যাণ বললে, কেন? আমি তা বলে দিচ্ছি না।

গ্রেগরি বললে, শোন ঘোষ মহাশয়? তুমি ওই তরুণীকে ভালবাস কি না, এ প্রশ্নের উত্তরের উপর নির্ভর করিতেছে কে দাম দিবে—আমাদের দুইজনের মধ্যে বাজি হইয়াছে—

কল্যাণ হেসে বললে, ও প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার চেয়ে আমি বরঞ্চ দাম দিচ্ছি।

গ্রেগরি প্রতিবাদ করে বললে, না, তাহা হইবে না, আমরা অর্ডার দিয়াছি, আমরা দাম দিব, প্রশ্নের উত্তর দিতে আপত্তি কি?

কল্যাণ ওদের মত মাথা নেড়ে বললে, গার্লটিকে তোমার পছন্দ নাকি?

—খুব striking face.

—দেখ আর্থার, তোমরা এমন bet করেছ শুনে আশ্চর্য্যি হলুম—এরকম প্রশ্নের কি কোন উত্তর হয়? আর ভালবাসা সম্বন্ধে আমার মত তুমি জান।

—সে জন্যেই ত আমি কনক রায় মহাশয়কে বলছিলুম, কল্যাণ ও মেয়েকে ভালবাসেনি।

—হতে পারে ত পথের ভালবাসা পথ-শেষে শেষ হয়ে যাবে।

—সে কি ভালবাসা?

—যাকে একবার ভালবেসেছি তাকে সারাজীবন ভালবাসতে না পারলে—

—সারা জীবনের কথা হচ্ছে না।

—তা হলে দু'দিন আর দু'বছরের মধ্যে তফাৎ করতে চাও। দেখ, এ ভয় নয়, ভক্তি নয়, এ ভালবাসা—আগুনের মত জ্বলে ওঠে আবার নিভেও যেতে পারে ত।

—দেখ, পরমেশ্বরের মত প্রেমকে কেউ কোনদিন define করতে পারেনি। ভালবাসা বলতে তুমি যা-ই বোঝ না কেন, আমরা এই প্রশ্নের উত্তর চাই, তুমি ওই তরুণীকে ভালবেসেছ কি?

গেলাসের শ্যাম্পেনের শেষ বিন্দু পান করে কল্যাণ ধীরে বললে, আমার মনে হয়, আমি ওকে ভালবেসেছি, ওর মধ্যে দেখলুম সৌন্দর্যের নবরূপ, অনির্বচনীয়; ওর মধ্যে দেখলুম আত্মার নবরহস্য, গভীর, সুন্দর; শুনলুম কোন্ নবজীবনের আহ্বান।

কনক বলে উঠল, ব্রাভো, এইটুকু শ্যাম্পেনে এত কথার ফেনা আছে জানতুম না। গ্রেগরি, তুমিই জিতলে, নেশাটা বোধ হয় কেটে গেল।

কল্যাণ একটু লজ্জিতভাবে বললে, না, না, নেশা নয় কনক। আমি ত প্রথমে বললুম, কথা দিয়ে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায় না।

কনক ব্যঙ্গের সুরে বললে, অর্থাৎ হ্যাঁ-ও বটে না-ও বটে।

গ্রেগরি খুশি হয়ে বলে উঠল, এ তুমি ঠিক বলেছ কনক রায় মহাশয়। কল্যাণ ভালবেসেছে বটে, ভালবাসেনিও বটে! ফল এই, অর্ধেক দাম আমি দেব, অর্ধেক তুমি। বোতলটা তুমিই শেষ কর কল্যাণ।

কল্যাণ ধীরে বললে, প্রশ্নটা করে তোমরা ভাবিয়ে তুললে আমাকে।

কুপের বৈদ্যুতিক দুটি পাখা বিরামহীন ঘুরে চলেছে, যেন দুটি বৃহৎ কালো পোকা একটানা আর্তনাদ করে ঘুরছে।

অনুপমার পাশে জগদীশ নিস্তব্ধভাবে বসে। মাঝে মাঝে অনুপমার দিকে শঙ্কিতভাবে চাইছে। বিপর্যস্ত বেশ, পাণ্ডুর আনন, রক্তিম অধর, উদ্‌ভ্রান্ত নয়ন, অনুপমার এমন করুণ বিহ্বল মূর্তি সে কখনও দেখেনি।

জগদীশ ভাবলে, নিশ্চয় অনুপমার খুব অসুখ করেছে, এই দীর্ঘ ট্রেন-যাত্রার ঝাঁকুনি তার সহ্য হচ্ছে না, এ রাত কাটিয়ে বোম্বে পর্যন্ত পৌঁছাতে পারলে হয়। হঠাৎ আবার রক্তস্রাব না হয়।

অনুপমার মনের ওপর যে ঝড় বয়ে গেছে, জগদীশ তা বুঝতে পারলে না; সে বেদনা বোঝবার মত প্রেমানুভূতি তার নেই। পাল-ছেঁড়া হাল-ভাঙা ঝড়ের ঝাপটা-খাওয়া নৌকার মত তার মূর্তি। জগদীশের ভয় হল।

বিমূঢ়ের মত জগদীশ দাঁড়িয়ে উঠল।

অনুপমা তার হাত চেপে ধরে আছে।

—তুমি যে উঠলে, আবার যেতে হবে নাকি?

—না, ঠিক যেতে হবে না।

—ঠিক যেতে হবে না, মানে? তুমি আর যেতে পাবে না।

—তোমার কি ভয় করছে?

জল্‌জলে চোখে অনুপমা হেসে উঠল।

মন্ত্রমুগ্ধের মত জগদীশ অনুপমার পাশে বসলে। অনুপমার মৃণাল বাহু তাকে জড়িয়ে! অসুখের পর অনুপমার এত কাছে সে কখনও বসেনি। জগদীশের কাঁধে মাথা রেখে অনুপমা এলিয়ে বসল; তার দীর্ঘ কেশভার জগদীশের বক্ষে ছড়িয়ে পড়েছে।

জগদীশ অনুভব করলে, বক্ষের রক্তধারা রুদ্রতালে নৃত্য করছে। স্তব্ধ হয়ে সে বসে রইল। মনে হল, অনুপমার দেহের তাপ অত্যধিক, নিশ্চয় তার জ্বর হয়েছে।

জগদীশের মনে পড়ল বিবাহের পর অনুপমা জগদীশকে এমনিভাবে আঁকড়ে ধরত।

—অমন চুপ করে থেকো না, কথা কও, বড় কর্কশ ট্রেনের শব্দ।

অনুপমার কাতরকণ্ঠে জগদীশ চমকে উঠল। ধীরে সে বললে, তোমাকে ট্রেনে চড়ান ভুল হয়েছে দেখছি। এ রাতটা কষ্ট করে কাটাও।

—ভুল!

অনুপমা হেসে উঠল।

—না, না, মোটেই ভুল হয়নি। এ ট্রেন-যাত্রায় কত কাণ্ডই না দেখলুম!

—শোন, তোমার কপাল বড় গরম হয়েছে, ঔষুধটা খেয়ে নাও, তা না হলে রাতে ঘুম হবে না।

—আমি আজ রাতে ঘুমোতে চাই না। ট্রেনে জেগে কাটাব।

—আমাকেও কি জাগতে হবে?

—নিশ্চয়ই। কতদিন রাত জাগিনি বল ত।

—ট্রেনের ঝাঁকুনি খেতে খেতে রাত জাগায় আনন্দ কি?

—আনন্দ আছে, আজ তোমায় ঘুমোতে দেব না। তাস খেলবে? পাশের গাড়ীতে ওরা কেমন তাস খেলছে।

—শোন, তোমাকে খুব গোপনীয় একটা সংবাদ বলি, বলা উচিত নয়, কিন্তু না বলে উপায় নেই দেখছি। ইয়োরোপে যুদ্ধ লাগছে।

—সে ত বহুদিন থেকে শুনছি।

—এবার সত্যি লেগেছে। আজ রাতেই জার্মানী পোলাণ্ড আক্রমণ করবে, তা' হলে কাল ইংলণ্ড যুদ্ধ ঘোষণা করবে নিশ্চয়।

—সে ত খুব মজার।

—মজা ? মজা কি ? যুদ্ধ কি তামাশার ব্যাপার।

—হাঁ, তাই ত।

—দেখ, তুমি এবার স্থির হয়ে শোও, টেমপারেচারটা দেখি, নিশ্চয়ই তোমার জ্বর হয়েছে, বুক বেশ গরম।

—অথবা, তোমার হাত বড় ঠাণ্ডা। আমার মোটেই জ্বর হয় নি। যুদ্ধ করা মজার ব্যাপার বললে তার জ্বর হয়েছে, সিদ্ধান্ত করতে হয় না। ইয়োরোপের লোকেরা কেন যুদ্ধ করে বুঝতে পারছি।

—কি বুঝতে পারছ ?

—তারা তোমাদের মত ঘ্যানঘেনে প্যানপেনে জীবন চায় না।

—তা কি চায় ?

—তারা বাঁচতে চায়। জীবন যখন একঘেয়ে লাগে তারা যুদ্ধ লাগিয়ে দেয়, ম্যালেরিয়ায় পিলে কেটে মরার চেয়ে শত্রুকে মেরে, নগর গ্রাম পুড়িয়ে, জাহাজ ডুবিয়ে, এরোপ্লেনে উল্কার মত মহাশূন্যে ছুটে মরা ভাল।

—থার্মোমিটার দেবার আর দরকার নেই ?

—বেশ চুপ করে বস দেখি। ভাবো আমাদের দেশে যুদ্ধ বেধেছে, তুমি চলে যেতে বন্দুক ঘাড়ে অথবা এরোপ্লেনে বোমার বস্তা নিয়ে, আমি হতুম নার্স অথবা বারুদের কারখানায়—

—ওগো, এবার চুপ করো। পিকক্স্ ব্রোমাইডটা কোথায় ?

—ওই ব্রোমাইড, আফিম, ধর্মের বুলি, রসের পদাবলী, এ সব দিয়ে তোমরা ভুলিয়ে রাখতে চাও, ঝিমিয়ে রাখতে চাও—আমি

ওষুধ খাচ্ছি না। যুদ্ধ লাগছে শুনে আনন্দ হচ্ছে—পুরাতনকে না ভাঙলে নতুনের সৃষ্টি হবে কি করে!

—তোমার কম্যুনিস্ট ভ্রাতার সঙ্গে বুঝি এইসব কথা হচ্ছিল—ওরা সব ক্রিমিন্যাল।

—ভাবো, আজ ইয়োরোপে আমাদের মত কত দম্পতি সম্মুখে মুক্তির পথ খুঁজে পেল।

—মুক্তির পথ?

—ক্ষমা করো, তোমাকে আমি বোঝাতে পারব না—এমন ভাবে বলা আমার ঠিক হয়নি।

—শান্ত হও, অনু, শান্ত হও।

—সবাই বলে শান্ত হও, সে শান্তির পথ কোথায়? শান্তিই কি কাম্য অথবা সংগ্রাম? সংগ্রাম করে শান্তি লাভ করতে হয় কেন?

—তোমার মন বড় উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। যুদ্ধের খবরটা না বললেই হত, কিন্তু না বলেও উপায় নেই যে।

—না বলে উপায় নেই? ও, বুঝেছি। তোমাকে আবার সেলুনে যেতে হবে বুঝি—যুদ্ধ বাধছে তাই এত পরামর্শ।

জগদীশ ধীরে বললে, এবার বেশিক্ষণ থাকব না, পরের স্টেশনেই চলে আসব। কয়েকটা ফাইল নিয়ে আসতে হবে। তোমার অসুখ বেড়েছে বললে সাহেব আর থাকতে অনুরোধ করবে না। তবে আমার ছুটি cancelled হয়ে গেল, জেনো।

অনুপমা সোজা হয়ে উঠে বসে বললে, বেশ যাও; আমার অসুখ মোটেই বাড়েনি—সাহেবকে সে কথা বলতে হবে না। 'কোটির অ্যাডভেঞ্চারটা' একটু খুঁজে দাও দেখি।

অত্যুজ্জ্বল রেস্তোরাঁ-গাড়ী হতে মৃদু আলোকিত ছোট ইন্টারমিডিয়েট কম্পার্টমেণ্টে ফিরে এসে মালতী স্থির হয়ে বসতে পারলে না। বুক তার দুলছে, কাঁপছে, যেন সে দীর্ঘপথ জোরে ছুটে এসেছে;

গাড়ীর সব জানালা সে খুলে দিলে, তারপর বুকে হাত দিয়ে বসল, যেন হাঁপাচ্ছে।

কল্যাণ তাকে ভালবেসেছে কি না, এ প্রশ্নের উত্তর সে কি করে জানবে?

অথচ এ প্রশ্নের উত্তর না জানলে রাতে তার ঘুম হবে না, চিত্তের চঞ্চলতা দূর হবে না।

এ সঙ্গে আর একটা প্রশ্ন যে ওঠে, কল্যাণকে কি সে ভালবেসেছে?

কখনও মনে হয় কল্যাণ তার অতি আপনার, হৃদয়ের অতি নিকটে এসেছে, আবার কখনও মনে হয়, কল্যাণ দূরে, বহু দূরে—এ তার স্বাভাবিক সৌজন্য, অথবা হয়ত একটু ফ্লার্টিং।

কিন্তু কল্যাণের সামনে বসলে তার বুক এমন দুর্ দুর্ করে কেন! সমরের সঙ্গে সে কেমন সহজভাবে ব্যবহার করতে পারে, যা-তা কথা বলতে পারে, বকুনি দিতে পারে।

সমর তাকে ভালবাসে কি না, এ কথা ত সে কখনও ভাবেনি, অথচ কল্যাণ সম্বন্ধে মনে এ প্রশ্ন কেন জাগল?

—অতি চিন্তাকুলা হেরি মালতীদেবীকে ডিনারের পরে!

চমকে চেয়ে মালতী দেখলে সামনে সমর দাঁড়িয়ে।

—সমর, কোথায় ছিলে তুমি?

—এই ট্রেনেই ছিলুম।

—প্ল্যাটফর্মে তোমায় কত খুঁজলুম, পেলুম না—কিছু খেয়েছ ?

—গেছলুম অনুপমা দিদির কুপেতে স্যাণ্ডউইচের সন্ধানে, দেখলুম গাড়ীতে কেউ নেই, খাবারও নেই।

—অনুপমাদি গাড়ীতে নেই ? বোধ হয় সেলুনে নিমন্ত্রণ হয়েছে।

—সেলুনেও নেই। বোধ হয় সন্ন্যাসীর সঙ্গে চলে গেলেন।

—সন্ন্যাসীর সঙ্গে ? কি ঠাট্টা করছ ? সত্যি বলো।

—অনুপমাদি এ ট্রেনেই আছেন ও বেশ ভাল গাড়ীতে আছেন, পরের স্টেশনে সে গাড়ীতে যাওয়া যাবে। তার আগে তোমার সঙ্গে একটা কথা ঠিক করে নিতে চাই।

মালতীর সামনে মুখোমুখি বসে সমর বললে, শোন কমরেড্, তুমি কি সত্যিই ইয়োরোপে যেতে চাও, এখন কাজ করবার অনেক লোক দরকার।

অনিমেষ নয়নে মালতী সমরের দিকে চাইলে। সমরের ঐ তরুণ দীপ্ত মুখে যেন কি অনির্বচনীয় রহস্য রয়েছে, চলে যেতে ইচ্ছে করে তার সঙ্গে। কিন্তু ভয়ও করে, অন্ধকার রাতে মশাল জ্বালিয়ে যেতে যেমন শঙ্কা হয়।

সমর উদ্বেগের সহিত বললে, চিন্তা করবার বেশি সময় নেই কমরেড্।

মালতী চিন্তিতভাবে বললে, কেন ? বোম্বে গিয়ে সব ঠিক করা যাবে।

—হয়তো আমি বোম্বেতে যাব না, পথে কোথাও সরে পড়তে হবে।

—কেন ?

—আমার খবর হচ্ছে, আজ রাতেই জার্মানী পোলাণ্ড আক্রমণ করছে।

—আবার যুদ্ধ ! এ খবর কোথায় পেলে ?

—সেলুন থেকে। ইয়োরোপে দুচার দিনের মধ্যেই যুদ্ধ বাধবে।

—তা হলে আর কি করে যাওয়া হয়?

—এখনই ত যাবার সময়। বড় বড় রাজ্য ভেঙে পড়বে, তাদের ধ্বংসস্তূপের ওপর নতুন মানব-সমাজ গড়ে তুলতে হবে।

—রাশিয়া কি করবে?

—রাশিয়া এখন থাকবে চুপ করে বসে।

—যুদ্ধের মধ্যে এখন আমরা গিয়ে কি করব?

—লক্ষ লক্ষ মানুষের রক্তে-ভেজা রণাঙ্গনে নতুন বীজ বুনতে হবে, নতুন ফসল তুলতে হবে, তারি উদ্যোগ এখন থেকে করতে হবে।

মুখে রুমাল চেপে মালতী একটা হাই তুললে।

—কি জানি, বড় ঘুম পাচ্ছে।

—তা হলে ঘুমোও মালতী দেবী, আমি চললুম।

—না, না, বোস, মুশকিল এই, আমার হাতে টাকা কিছু নেই।

—এবং কল্যাণকুমার প্রচুর অর্থবান, পিতৃসঞ্চিত সম্পত্তির দাম কত লাখ কিছু খোঁজ পেয়েছ কি?

—চুপ করো। আচ্ছা, একটা প্রশ্নের সত্যি উত্তর দেবে?

বিমুগ্ধভাবে মালতী সমরের দিকে চাইল। দীর্ঘ অক্ষিপক্ষের ছায়ায় নয়নতারকা জলে দুলে উঠল।

—কি প্রশ্ন?

ক্ষণিকের জন্য মালতী সমরের তরুণস্বপ্নভরা নয়নে চেয়ে রইল। কোন প্রশ্ন করতে পারলে না। গণ্ড রাঙা হয়ে উঠেছে, অধর কাঁপছে। যে প্রশ্ন সে করতে চাইছিল, সে প্রশ্ন করতে পারলে না। নীরবে মুখ ঘুরিয়ে নিলে।

সমর বিস্মিতমুগ্ধভাবে মালতীর দিকে চাইলে। মালতীর এ রূপ মনোমোহিনী।

অন্তরের আবেগ দমন করার জন্যে সমর উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল। তারপর দু'জনে স্তব্ধ বসে।

একটু ব্যঙ্গের সুরে সমর বললে, তুমি জানো, বুর্জোয়া ভালবাসায় আমি বিশ্বাস করি না।

—আমি ভালবাসায় বিশ্বাস করি, প্রেম বুর্জোয়াও নয়, প্রলিটেরিয়েটও নয়, মানব-হৃদয়ের পরম সত্য।

— এ মধ্যরাতে তোমার সঙ্গে প্রেম সম্বন্ধে আলোচনা করতে চাই না। তুমি কি স্থির করলে? ভাববার জন্যে পাঁচ মিনিট সময় দিতে পারি।

—আমি যাবো, আমি যাবো। কিন্তু এমন ক্লান্তি লাগছে, বড় ঘুম পাচ্ছে আমার।

—আধ-স্বপনে-আধ-জাগরণে এই রকম অবস্থা।

—না, না, আমায় ভুল বুঝো না, শোন আমি যাব, আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি আমায় জাগিয়ে ডেকে নিও, কমরেড্!

সমর কোন কথা কইলে না। নীরবে উঠে গিয়ে মালতীর পাশে বসে তার নরম ঠাণ্ডা হাত আপন প্রশস্ত করতলে দৃঢ়মুষ্টিতে ধরে বসে রইল।

মধ্যভারতের পাহাড় বন পার হয়ে রাতের অন্ধকারে ট্রেন ছুটে চলেছে।

১১

গভীর রাত্রি। ট্রেন ছুটে চলেছে। কখনও বনানীর সঘন অন্ধকার, কখনও গম্ভীর পর্বতশ্রেণীর রুদ্রমূর্তি, কখনও উন্মুক্ত প্রান্তরে আলোছায়ার রহস্যলোক।

অনুপমা গাড়ীতে একা। গাড়ীর আলো নিভিয়ে সে চুপ করে বসেছে রহস্যময়ী নিশীথিনীর মত। ভাবতে সে কিছু চায় না। সে চায় শান্তি, সে চায় সুপ্তি, ব্যাধিক্লিষ্ট দেহমনের সকল শ্রান্তির অপসারণ। কোন মন্ত্রবলে সে যদি নবজীবন লাভ করতে পারত!

কিন্তু তার মাথার ভেতরে বসে কে ভেবে চলেছে; এ চিন্তাস্রোত, সে ইচ্ছা করলেও থামাতে পারছে না। জানলা দিয়ে চোখ মেলে চাইলেই সে দেখতে পাচ্ছে, বহির্জগৎ কোন্ অলক্ষ্যে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলেছে, অনন্তগগনে গ্রহ-তারকা হতে পৃথিবীর পর্বত বন প্রান্তর ছুটে চলেছে। অনুপমা ইচ্ছা করলে এ ধাবমান বিশ্বের গতি থামাতে পারে না। তেমনি সে, তার অন্তরজগতের উত্তাল চিন্তা-তরঙ্গিনীর অবিরাম ধারা থামাতে পারে না। চিন্তার বিরামহীন স্রোত নব নব পথে প্রবাহিত হয়ে চলে, কিন্তু জীবন ত এগিয়ে চলে না, নব আশা নব বাসনা জাগে, শুধু বেদনার তরঙ্গ স্থির জীবনের তটে বার বার আঘাত করে, অশ্রুর ফেনপুঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে।

অনুপমা আর স্বপ্নজাল বুনছিল না। সে ভাবছিল, তার অসুখ আর সারবে না, এমনি ব্যাধিক্ষিণ্ণ দেহ নিয়ে কাটাতে হবে দিনের পর দিন। ইয়োরোপ যাওয়া ত হবেই না, এ ছুটিতেও কোথাও বেড়ান হবে না। বোম্বে গিয়ে আবার ফিরতে হবে কলকাতায়। সময়

নিশ্চয় ইউরোপে চলে যাবে, যুদ্ধ বাধলেও যাবে। মালতী কি কল্যাণকে বিবাহ করে নতুন জীবন গড়ে তুলবে? সন্ন্যাসী চলে যাবেন মধ্যভারতের বনমধ্যে কোন নির্জন মন্দিরে অথবা হিমালয় পর্বতমালায় কোন গভীর কন্দরে অলকনন্দার উৎসতীরে। আর অনুপমাকে ফিরে যেতে হবে কলিকাতার উপকণ্ঠে সেই চিরপুরাতন বাগান-বাড়ীতে—সেই ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আমলে তৈরি বৃহৎ থাম-ওয়ালা পুরানো বাড়ী, ঝুরি-নামা গাছের ছায়া ভরা বৃহৎ বাগান। সেই উদাস স্তব্ধতা, শূন্য বিজনতা। তার জীর্ণ গতিহীন জীবনের উপযুক্ত বাসস্থান। জগদীশ বলেছিল বোম্বের কাছে কোন সমুদ্রতীরে ভাল স্যানাটোরিয়ম আছে, সেখানে সে যেতে চায় না। চিরচঞ্চল সমুদ্রের রূপ দেখলে সে আরও অশান্ত হবে। সেই পুরানো বাগানে ভাঙা বাড়ীই তার ভাল। জগদীশকে মাঝে মাঝে দিল্লী যেতে হবে। সে থাকবে একা। জীবনের পথে সে যখন সত্যিই নিঃসঙ্গিনী তখন একাকিনী থাকাতে তার দুঃখ নেই। বার বার সে জগদীশের কাছে আসতে চেষ্টা করে, হৃদয়ের স্পর্শ দিয়ে প্রেমের স্পন্দন জাগাতে চায়। জগদীশ ত তাকে প্রথমে ভালবেসেছিল, অথবা সে শুধু যৌবনের মোহ। সে ভালবাসা আবার জাগাতে ইচ্ছে করে।

ছোট এক স্টেশনে ট্রেন হঠাৎ থামল। অন্ধকার জনহীন প্ল্যাটফর্মে কয়েকটি ক্ষীণ আলোকের প্রভাহীন বিন্দু। চারিদিকে স্তব্ধতা বড় গভীর।

ট্রেন আর নড়ছে না। যেন অন্ধকারে পথ হারিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে আছে। জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অনুপমা অধীরা হয়ে উঠল। তারাভরা আকাশ ঝিম্‌ঝিম করছে, অন্ধকার স্টেশনে প্রাণের কোন সাড়া নেই।

কুপের দরজা খুলে অনুপমা অন্ধকার প্ল্যাটফর্মে নেমে পড়ল। যেন

সে কোন্ অদৃশ্যশক্তির চালনায় নেমে পড়ল। ওই রহস্যময় তিমিরাবৃত বনে তার চলে যেতে ইচ্ছে করছে এখন যদি ট্রেন চলে যায়, এই অজানা স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে রাত্রির অন্ধকারে একাকিনী সে দাঁড়িয়ে থাকে, তারপর—

তারপর কি হবে সে ভাবতে চায় না। ওই অনন্ত গগনে নক্ষত্রদলের নর্তনের ছন্দে চিরধাবমান বিশ্বের প্রাণস্রোতের সঙ্গে সে এগিয়ে যেতে চায়। তার বুক দুলছে।

অনুপমা একটু এগিয়ে গেল। পাশের প্রথম শ্রেণীর কম্পার্টমেন্টের অত্যুজ্জ্বল আলোক তার চোখে এসে পড়ল। গানের সুর, কলধ্বনি, উচ্চহাস্য, কাচের ঝন্‌ঝনানি, যেন একটি হর্‌রা চলছে।

মনে হল, গাড়ীটা নড়ে উঠল। সত্যিই বুঝি অজানা প্ল্যাটফর্মে একা থাকতে হবে।

অনুপমা ট্রেনের দিকে ছুটে গেল, নিজের কুপের দিকের নয়, সম্মুখের আলো-ভরা প্রথমশ্রেণীর গাড়ীতে উঠে পড়ল।

গণেশদের গাড়ীতে রঙ্গ তখন বেশ জমে উঠেছে। গণেশেরও নেশা লেগেছে। দেবপ্রিয় স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছে না, মাঝে মাঝে দাঁড়িয়ে উঠে অভিনয়ের ভঙ্গীতে বক্তৃতা দিচ্ছে। তার ইচ্ছা শিপ্রা এবার নৃত্য করে। শিপ্রার নৃত্যের সঙ্গে সে একটু মূক অভিনয় করতে চায়। শিপ্রা কিন্তু নৃত্য করতে রাজী হচ্ছে না। দু'-তিন বার অনুরোধ করে দেবপ্রিয় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছে। আবার শিপ্রার কলহাস্যময় মধুর ভঙ্গীতে সে মুগ্ধ হয়ে যচ্ছে। এ পণ্ডিত-মাতালের মত্ততায় শিপ্রা পুলকিতা।

কিন্তু যত নেশা ধরছে গণেশ তত গুম্ হয়ে যাচ্ছে। তার এ স্তব্ধতায় শিপ্রা একটু ভীতা হয়ে উঠল। হঠাৎ ঈর্ষান্বিত হয়ে গণেশ

একটা কাণ্ড বাধাতে পারে, দেবপ্রিয়কে ঠেলা দিয়ে বলতে পারে, বেরোও বেরোও আমার গাড়ী থেকে। হয়ত চলন্ত ট্রেনের দরজা খুলে তাকে ঠেলে ফেলে দিতে পারে। গণেশ ঘুমিয়ে পড়লে সে বাঁচে।

হঠাৎ ট্রেন থামতে গণেশ উৎসাহের সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। তার সামনে সব বোতল খালি। গাড়ীর দরজা খুলে সে মুখ বাড়ালে, রেস্তোরাঁ-গাড়ীর কোন বয়ের দেখা পাওয়া যায় কি না।

শিপ্রা ধীরে বললে, গণেশবাবু, অন্ধকারে যেও না। এবার ধীরে শুয়ে পড়। রাত কত হবে দেবপ্রিয়বাবু?

দেবপ্রিয় হেসে বললে, ইয়ং ইজ্ দি নাইট্ শিপ্রা দেবী, আপনার মতনই তরুণী।

খুব হয়েছে, বলে শিপ্রা গণেশের অলক্ষ্যে একটা ভরা বোতল গাড়ীর এক কোণে লুকিয়ে রাখলে।

—না, অন্ধকারটা বড় বিচ্ছিরি—কোন বাবুর দেখা নেই, বলে গাড়ীর দরজা ভেজিয়ে গণেশ স্থির হয়ে বসল। দেবপ্রিয়ের দিকে সে কট্‌মট্ করে তাকালে। শিপ্রা সে চাউনির অর্থ বুঝলে, গণেশ বলতে চায়, যাও-না, আর এ গাড়ীতে কেন; ট্রেন থেমেছে, এবার নিজের গাড়ীতে শুতে যাও। দেবপ্রিয় কিন্তু কোন ভ্রূক্ষেপ করলে না।

গণেশ বলে উঠল, কি স্টেশন?

দেবপ্রিয় বাইরের অন্ধকারের দিকে চেয়ে বললে খাগোয়া হবে—ভুঁসোয়াল?

শিপ্রা উদ্বিগ্নভাবে বললে, না, না, এ কোন ছোট স্টেশন, হঠাৎ গাড়ী থেমেছে, এখুনি ছেড়ে দেবে।

গণেশ রুক্ষস্বরে বলে উঠল, কে বলে এখুনি গাড়ী ছাড়বে? ওহে শুনছ দেবপ্রিয়বাবু, একবার রেস্তোরাঁয় যেতে পারবে—

শিপ্রা একটু ভীতভাবে বলে উঠল, এ অন্ধকারে কি করে যাবেন—এখুনি গাড়ী ছেড়ে দেবে।

গণেশ ক্রুদ্ধস্বরে বলে উঠল, বড় যে—বড় যে, আচ্ছা—ওহে শুনতে পাচ্চ?

মুক্ত জানালার কাছে মুখ রেখে রাত্রির অন্ধকারের দিকে চেয়ে দেবপ্রিয় ধ্যানীর মত স্থির বসে।

গণেশ তার দিকে এগিয়ে গেল। শিপ্রা ভয়ে কেঁপে উঠল।

একটু এগিয়ে গণেশ অবাক হয়ে চাইলে। দুই কানের কাছে দুই হাত রেখে অন্ধকারের দিকে মুখ বাড়িয়ে দেবপ্রিয় জানালা দিয়ে বাহিরে ঝুঁকে যেন গোঁ গোঁ করছে।

শিপ্রার দিকে চেয়ে গণেশ বললে, মূর্চ্ছার ব্যারাম আছে নাকি?

শিপ্রা বিরক্তির সঙ্গে বললে, চুপ করো, কি বলছেন শোন!

দেবপ্রিয় তখন কানের ওপর হাত রেখে আবেগের সঙ্গে বলছে, শুনতে দাও, এ স্তম্ভিত গম্ভীর নিশীথের তমিস্রায় আর্যাবর্ত দাক্ষিণাত্যের মধ্যে গিরিবনপথে অতীতের যবনিকা ছিন্ন করে শুনতে দাও, ভারতের এ প্রাচীন পুণ্যপথে শতাব্দীর পর শতাব্দীর নব নব যাত্রীর পদধ্বনি, জয়গান শুনতে দাও—

গণেশ দেবপ্রিয়ের পাশে বিস্মিত মুগ্ধ হয়ে বসে বললে, বা, চমৎকার, দেবপ্রিয়বাবু, ভাল এ্যাক্টিং হলে আমি সব সময় appreciate করতে পারি, কিন্তু আমাদের দিকে মুখ ফিরিয়ে একটু বলুন।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে দেবপ্রিয় মুখ ফেরাল। ঠিক সেই সময় প্ল্যাটফর্মের দিকের ভেজান দরজা খুলে অনুপমা এ গাড়ীতে প্রবেশ করলে। ট্রেন দুলে উঠল।

—আপনি!

—অবাক হচ্ছেন নিশ্চয়। আমি ছিলুম পাশের কুপেতে, বড় একা বোধ হচ্ছিল, নেমে পড়েছিলুম প্ল্যাটফর্মে—

—বেশ করেছেন। Welcome—বসুন—বোতলগুলো দেখে ভয় পাবেন না।

—কিছু দেখেই আমি ভয় পাই না।

—বা। এই আমাদের দেবপ্রিয়বাবু, বড় পণ্ডিত—আর ইনি শিপ্রা দেবী—

—জানি।

—জানেন?

—দেবপ্রিয়বাবুর আমি একজন ভক্ত পাঠিকা।

—শুনছেন, ভক্ত পাঠিকা! হুঁ!

—আমার বই পড়েছেন?

—নেশাটা বুঝি কেটে গেল।

—চুপ!

—হাঁ, আপনার "সমীক্ষণ" কয়েকবার পড়েছি, সব জায়গা বুঝতে পারি না, তবে ভাল লাগে, মনে আঘাত করে।

—ও বিষয় আপনার সঙ্গে আমিও এক মত, দেবপ্রিয়বাবুর সব কথা বুঝতে পারি না, তবে ভাল লাগে—লোকটাকে ভাল লাগে।

—চুপ করো গণেশবাবু।

—ও, বুঝেছি, আপনি জগদীশের স্ত্রী?

—ঠিক বলেছেন।

—কিন্তু জগদীশবাবুকে আমি ত প্রশংসা করতে পারছি না, এ মাঝ রাতে তাঁর এমন সুন্দরী স্ত্রীকে—

—চুপ করো গণেশবাবু।

—বিশেষ কাজে তাঁকে সেলুনে যেতে হয়েছে।

—বাঃ বেশ করেছেন। মানে আপনি আমাদের গাড়ীতে এসে খুব ভাল করেছেন। দেবপ্রিয়বাবুর লেখা পড়েছেন, এ্যাক্টিং দেখেননি ত —চমৎকার এ্যাক্টর—আমাদের সিনেমা-কোম্পানীতে যোগ দিচ্ছেন।

—আপনি! সিনেমাতে অভিনয় করবেন?

—না, না—একটু রঙ্গ করছিলুম।

—বুঝেছি।

—মোটেই বোঝেন নি। প্যারিস-ফেরতের পার্ট, বুঝলেন কি-না—

—চুপ করো গণেশবাবু।

—বা, লোকটার প্রশংসা করব না—চমৎকার বলতে পারেন, এই অন্ধকারে জানালায় ঝুঁকে পড়ে কি গোঁ গোঁ করছিলেন—

—উনি পণ্ডিত লোক, কি সব শুনতে পাচ্ছিলেন!

—রাতের অন্ধকারে আপনি কি শুনতে পাচ্ছিলেন, আমাদের শোনাবেন না একটু?

—শুনবে, শুনবে তোমরা, স্থির হয়ে বোসো, শোন, সরিয়ে দাও পর্দার পর পর্দা, শতাব্দীর পর শতাব্দী—

—বলুন, দেবপ্রিয়বাবু, আমরা স্থির হয়ে শুনবো।

—শোন, দেবপ্রিয়বাবু, আমরা স্থির হয়ে শুনবো।

দেবপ্রিয় এক শূন্য পেয়ালা হাতে করে দাঁড়িয়ে উঠল। বাইরের রাত্রির আলোছায়াময় রহস্যরূপের দিকে চেয়ে প্রসারিত হস্তে দেবপ্রিয় বলে যেতে লাগল:

ভারতের এ পুণ্যপথে শুনতে পাচ্ছি সৈনিকদলের অশ্বক্ষুরধ্বনি, অসির ঝঞ্ঝনা, কামানের গর্জন। নব নব জাতিতে জাতিতে সংঘাত, সংগ্রাম, সন্ধি, সমন্বয়, শান্তি, আবার নতুন জাতির নতুন দলের আগমন,

নতুন করে সংগ্রাম সমস্যার আরম্ভ। শোন ধনুকের টঙ্কার, বানরসৈন্যের হুঙ্কার, রাক্ষস-সঙ্কুল বনপথে হরধনুভঙ্গকারী রামচন্দ্র চলেছেন পদ্মাক্ষী বন্দিনী সীতার উদ্ধারে, আর্য অনার্যের লড়াই লেগেছে। তারপর শোন রথের ঘর্ঘরে, হস্তিদলের বৃংহিতে, বান খড়্গ মুষল নানা প্রহরণের শব্দে বিন্ধ্যগিরি মুখরিত, দক্ষিণাপথ হতে সৈন্যদল চলেছে কুরুক্ষেত্রের রণে। তারপর শোন, মধ্যএশিয়ার প্রান্তরপালিত অতি ক্ষিপ্র অশ্বপৃষ্ঠে বিদ্যুদ্বেগে কাহারা ছুটে এল, রক্তাক্ত মুক্ত অসিতে বিদ্যুদ্দাম—চলেছে শকসিদীয়গণ, চলেছে পাঠান, মোগল, আওরঙ্গজেবের সুসজ্জিত বিপুল বাহিনী দাক্ষিণাত্য বিজয়ে চলেছে, অস্ত্র-ঝঞ্ঝনা শুনতে পাচ্ছ না কি? তারপর শোন কামানের গর্জন, বন্দুকের শব্দ, দগ্ধ বারুদের গন্ধে ধূমে যুদ্ধভূমি পূর্ণ; তীর নয়, অসি নয়, এ ইয়োরোপের শ্বেতবর্ণ সৈন্যদলের নূতন রণ-রীতি। সে শক যবন মোগল মারাঠা ফরাসী ফিরিঙ্গি সেনা স্বপ্নের মত মিলিয়ে গেছে, তাদের ক্ষিপ্র অশ্বদলের মত্ত ক্ষুরধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনতে পাচ্ছ কি! তারপর শোন, কি ভয়ঙ্কর শব্দ। বধির হয়ে যেতে পারো, বিষাক্ত গ্যাসে দম আটকে যেতে পারে, তবু শুনতে হবে—আর গজে গজে, ঘোড় সওয়ারে ঘোড় সওয়ারে, তরবারির সঙ্গে তরবারির আঘাতে সঙ্গীনের খোঁচায় যুদ্ধ নয়, মূর্তিমান জ্যান্ত-রাক্ষসদলের মত অগ্নিচক্ষু অনলবর্ষী ট্যাঙ্কে ট্যাঙ্কে সংঘাত, এরোপ্লেনে এরোপ্লেনে যুদ্ধ,—আবার নতুন সভ্যতার জন্ম—যুদ্ধ—লেগেছে যুদ্ধের আগুন—শোন—

শিপ্রা ভীত করুণ সুরে বললে, দেবপ্রিয়বাবু, এবার আপনি একটু স্থির হয়ে বসুন। বড় সুন্দর বলেছেন। এবার বিশ্রাম করুন।

অনুপমা আশ্চর্যের সুরে বললে, আপনি জানলেন কি করে, যুদ্ধ লাগছে?

শিপ্রা বলে উঠল, বা, উনি যে খবরের কাগজের অফিসে কাজ করেন।

দেবপ্রিয় বেঞ্চির এক কোণে বসে হাঁপাতে লাগল। অনুপমাকে তাক লাগিয়ে দেবার জন্য সে একদমে যে এত কথা বলতে পারবে, তা সে নিজেও ভাবেনি।

গণেশ একটু ব্যঙ্গের সুরে বল্লে, আমিও মশাই আপনার চেয়ে কিছু কম খেলুম না; কিন্তু আমি ত আপনার মত এমন বক্তৃতা দিতে, এ্যাক্টিং করতে পারলুম না।

পরের স্টেশনে ট্রেন থামতেই অনুপমা নিজের কুপেতে চলে গেল। গাড়ীতে আলো জ্বালা দেখে ভাবলে জগদীশ এসেছে। কিন্তু কুপেতে প্রবেশ করে দেখলে, মালতী চেয়ারে মুখ রাঙা করে বসে আছে।

—মালতি! কি খবর?

—খবর ত তোমার। কোথায় গেছলে?

—পাশের গাড়ীতে, বড় মজা হল।

—আমার গাড়ীতে আমি একা।

—ভয় করছিল?

—ভয় ঠিক নয়, ভাল লাগছিল না। তোমার কল্যাণকুমারটি সুবিধের লোক নয়।

—কেন, মাঝ রাতে জ্বালাতে গেছল? কন্‌গ্রেচুলেট করতে পারি?

—সব সময় ঠাট্টা কোরো না।

—প্রপোজালটা ডিনারের আগে হল, না পরে?

—প্রপোজাল আবার কি ?

—নেকী !

—শোন অনুদি, ভয়ঙ্কর ঘুমিয়ে পড়েছিলুম। সমর ছিল গাড়ীতে। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। চেয়ে দেখি, গাড়ীতে সমর নেই, কেউ নেই। হঠাৎ চমকে দেখি অদূরে অজানা কে বসে, চেঁচিয়ে উঠছিলুম আর কি !

—কি সাহসিকা !

—দেখি তোমার কল্যাণকুমার চুপটি মেরে বসে। বলে উঠলেন, ভয় নেই। আমি বললুম, ভরসাই বা কি ; কিন্তু এ সময় এখানে কেন ? গার্ড দেখলে মোটা ফাইন হয়ে যাবে। তিনি বললেন, মোটা জরিমানা দিতে রাজী আছি, তোমার ঘুমন্ত রূপটি বড় সুন্দর লাগছিল। আমি বিরক্তির সঙ্গে বললুম, এখন জাগ্রত রূপ সহ্য করতে পারবেন না, পরের স্টেশনেই সরে পড়ুন।

—বা, আর্টটা বেশ আয়ত্ত হয়েছে দেখছি, যত বাধা দিবি, ওদের জেদ তত বেড়ে যায়, জানিস্ ?

—না, অনুদি, আমার সত্যিই রাগ হয়েছিল। তারপর বলেন কি, তুমি ত কম্যুনিস্ট শুনলুম, কমরেডশিপ করো। আমি রেগে বললুম, কম্যুনিস্টের সঙ্গে আমি কমুনিস্ট হতে পারি, আপনার মত পাকা বুর্জোয়ার সঙ্গে কমরেডের সম্পর্ক নয়। ভদ্রলোক চুপ হতে চায় না, হেসে বললে, তা জানি, আমিও কমরেডশিপ চাই না, আমি বুঝি প্রেম—। বাধা দিয়ে হেসে উঠলুম আমি। বললুম, প্রেমের আপনি কিছুই জানেন না, প্রেম পরিহাসের জিনিস নয়।

—বা, খুব কথা বলতে শিখেছিস্ ত। দরকার পড়লে, কথা আপনিই আসে। তারপর ?

—তখন তোমার কল্যাণকুমার অন্য সুর ধরলেন, বললেন, দেখ,

আমি এসেছিলুম তোমাকে নিমন্ত্রণ করতে ; তোমার ত নিরুদ্দেশ যাত্রা, বোম্বেতে কোথায় থাকবে, কিছুই জান না ; আমার বোন আমার সঙ্গে চলেছেন জান, মালাবার হিল্‌সে তাঁর স্বামীর সুন্দর বাংলো, তুমি যদি আমাদের সঙ্গে আমাদের বাড়ীতে এসে থাকো—। আমার কেমন রাগ হল, বলে উঠলুম, দেখুন, আপনার বোনের বাড়ীতে আমি থাকতে যাব কেন, আর সে বাড়ী আপনার নয়, আপনি কি বলে নিমন্ত্রণ করচেন— তবু আপনার নিমন্ত্রণের জন্য অনেক ধন্যবাদ। ভদ্রলোক দমবার পাত্র নয়, গম্ভীরভাবে বললেন, আচ্ছা, আমার ভগ্নীপতির বাড়ী বলে যদি তোমার আপত্তি হয়, তুমি যদি বল, এসে থাকবে, আমিই না হয় বোম্বেতে একখানি বাড়ী করছি। আমি বললুম, আপনার অনেক টাকা আছে জানি, কিন্তু আমার জন্যে খামাকা বাড়ী করতে যাবেন কেন, সে টাকা আপনি ভাল কাজে সদ্ব্যয় করুন , আর এবার চুপ করুন, আপনার সঙ্গে বকে আমার মাথা ধরে গেছে। কল্যাণ মুচকে হেসে বললেন, কাচা ঘুমটা ভাঙিয়ে ভাল কাজ করিনি দেখছি, আচ্ছা, গাড়ী থামলে নেমে যাব, চেন্ টানবার দরকার হবে না, তবে আমার নিবেদনটা কাল সকালে সুনিদ্রার পর একটু বিবেচনা করবেন। তারপর দু'জনে চুপ করে বসে রইলুম। ট্রেন থামতেই আমি তোমার গাড়ীতে চলে এসেছি।

—ভালই করেছিস্। মানে, আমার গাড়ীতে এসে ভালই করেছিস, কিন্তু কল্যাণকে বেশ কবিত্ব করে প্রপোজালটা করবার সুযোগ না দিয়ে ভাল করিস্ নি।

—আমার ভাল লাগে না, এ সব।

—কল্যাণ ভেবেছিল, বোম্বের সমুদ্রতীরে কোন সন্ধ্যায় উতলা হাওয়ায় যখন তোর অলক উড়বে, তোর কানে কানে চুপে চুপে সে বলবে, আমি তোমায়—

—যথেষ্ট ! চুপ করো অনুদি। এমন করে ঠাট্টা কোরো না।

—ঠাট্টা নয় রে।

—বেশ, শোন, আমি ঠিক করেছি—

—ভুল, তুমি ঠিক করতে পার না, আমরা কোন অদৃশ্য শক্তির হাতের খেলনামাত্র—এ ম্যারিয়নেটের নাট্যলীলায় আমাদের ইচ্ছা কোথায় ? শোন্ মালতি, হঠাৎ কিছু ঠিক করিস্ না, খুব বিবেচনা করে স্থির করতে হবে।

—আমিও ত সেই কথা বলছি।

—হায়, কোন্ অপরাধে দীর্ঘ মেয়াদে সংসার গারদে আছি বল্ ! এ গারদখানা, মুক্তি কোথায় ?

—কি হল তোমার অনুদি ? আমার কথা থাক্ তোমার কথা বল, অমন করে চেয়ো না, অনুদি !

—ভুল, ভুল মালতি, একবার ভুল করলে—

—ভাই অনুদি, কেঁদো না—তোমায় কি ব্যথা দিলুম, ক্ষমা করো, তোমার শরীর ভাল নয়, স্থির হয়ে শোও।

ডিনারের পর গ্রেগরি ও কনক নিজেদের গাড়ীতে ফিরে এল।

গাড়ী স্তব্ধ, মৃদু আলোকিত। গ্রেগরির রিজার্ভ-করা বার্থে রাধাকান্ত গভীর নিদ্রিত। ওপরের বাঙ্কে বিন্নিঙ্কি শুয়ে আছে চোখ বুজে, তার চোখে ঘুম আসছে না, অস্থিরভাবে পার্শ্বপরিবর্তন করছে। সন্ন্যাসী প্রেমদাস এক কোণে ধ্যানের আসনে বসে আছেন। কল্যাণ কম্পার্টমেন্টে নেই।

গ্রেগরি বললে, দেখুন কনক রায় মহাশয়, আমার বার্থে কাল এক অভিনেত্রী শুইয়াছিলেন, আজ এক লক্ষপতি শুইয়া আছেন।

প্রেমদাস ধীরে বললেন, ওকে জাগাবেন না, অনেক রাত পরে আজ একটু ঘুমোচ্ছে, আপনি আমার জায়গায় শোন, আমি ঘুমাব না।

গ্রেগরি বললে, না, না, ওঁকে আমি disturb করিতেছি না, আপনি স্থির থাকুন—আমরা দুইজনে এই বেঞ্চে রাত কাটাইতে পারিব। আমারও ঘুম হইবে না।

দু'জনে পেছনের লম্বা বেঞ্চিতে পাশাপাশি বসল।

কনক হেসে বললে, আপনিও কি নিদ্রা-হারাদের দলে! আমি ত বুঝতে পারি না, লোকেদের ঘুম হয় না কেন? আমি ত রাত জাগতে মোটেই পারি না। কিন্তু আজ আমায় জেগে থাকতে হবে। সেজন্য আজ শ্যাম্পেন খেলুম দেখলেন। শ্যাম্পেন খেলে আমার ঘুম সহজে আসে না।

গ্রেগরি বললে, রাত্রি জাগিবেন কেন? আপনি বোম্বে যাইবেন না? মাঝে কোন্ স্টেশনে নামিতে হইবে, বলুন, আমি আপনাকে জাগাইয়া দিব।

রহস্যের স্বরে কনক বললে, হাঁ, মন্‌মদ স্টেশনে আমায় নামতে হবে, ব্যাপারটা একটু রহস্যজনক, আপনাকে বলতে পারছি না। আমি জেগে থাকবার চেষ্টা করছি, যদি ঘুমিয়ে পড়ি আপনি অনুগ্রহ করে জাগিয়ে দেবেন।

তারপর প্রেমদাসের দিকে ফিরে কনক বললে, আপনিও কি জেগে রাত কাটাবেন?

প্রেমদাস ধীরে বললেন, আচ্ছা, 'মনমদে' আপনাকে জাগিয়ে দেব, আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোন।

কনক হেসে বললে, চিন্তার বালাই আমার নেই। আর যদি নাও জাগি, তাতে খুব বেশি লোকসান্ হবে না।

প্রেমদাস হেসে বললে, বোধ হয় ভালই হবে। জীবনে কামনার তৃপ্তি নেই, সেই জন্যেই লীলা শেষ হতে চায় না।

বিস্মিতভাবে কনক প্রেমদাসের দিকে চাইলে। লোকটা মনের কথা জানতে পারে নাকি!

বহুদিন পরে শিপ্রার সঙ্গে কনকের দেখা। শিপ্রা ছিল কনকের তরুণ শিল্প-জীবনের "মডেল"। ফটোগ্রাফারের স্টুডিও বলে সে যে স্টুডিও খুলেছিল, আসলে সেটি ছিল তার আঁকবার এ্যাটেলিয়ে। শিপ্রা সেখানে ফটো তোলাবার জন্য আসত না, তার সুঠাম তনুর রেখাগুলি কনক মুগ্ধনেত্রে দেখত ও রঙে আঁকবার চেষ্টা করত। তখন নর্তকীরূপে শিপ্রার নাম হয়নি। কনকের এ্যাটেলিয়েতে সে নানা নৃত্যের অভ্যাস করত, আর কনক নৃত্যরূপগুলির ক্ষণিক চঞ্চল ভঙ্গিমা কখনও ফটো তুলে কখনও স্কেচ্ করে ধরে রাখবার চেষ্টা করত। সেই পুরাতন কয়েকটা স্কেচ্ তার সঙ্গের সুটকেশে পড়ে রয়েছে। কাঁচা হাতের আঁকা, চঞ্চল সৌন্দর্যানুভূতির অস্ফুট রূপ। এখন শিপ্রাকে আর একবার পাকা হাতে আঁকতে ইচ্ছে করে। শিপ্রাকে যদি সে দু-তিন দিনের জন্যেও পায়, হয়ত সে একটা মহাচিত্র আঁকতে পারে, বতিচেল্লীর "ভেনাসের জন্মে"র মত।

নির্বাপিত সিগারটা জ্বালিয়ে কনক আপন মনে হেসে উঠল। সন্ধ্যায় চা খেতে খেতে সে এক মৎলব করছে। গণেশ তখন রেস্তোরাঁ-গাড়ীতে ডিনারের অর্ডার দিতে এসেছিল, আসলে, দেখতে এসেছিল পানীয় কত প্রকার আছে। সেই অবসরে কনক শিপ্রাকে একটি ছোট চিঠি লিখে পাঠালে, সঙ্গে পুরানো একটা স্কেচ্ও পাঠিয়েছিল।

শিপ্রা তার প্ল্যানে রাজী কিনা স্পষ্ট বলেনি, কিন্তু তার ভঙ্গী, মুখের হাসি দেখে কনক বুঝেছিল, গররাজী সে নয়। মন্‌মদ স্টেশনে গণেশ যদি না জেগে থাকে তা হলে কোন অসুবিধা হবে না।

গ্রেগরি কনকের আরও কাছে এসে মৃদুকণ্ঠে বললে, আপনি কতকগুলি ছবি দেখাবেন বলেছিলেন, কনক রায় মহাশয়!

—এখন ?

—এখন ত বেশ ভাল সময়।

—আলো বড় কম মনে হচ্ছে।

—মনের আলো ত আছে।

সুটকেস্ খুলে কনক একটা পোর্টফোলিও বার করলে; সোনালী রঙের একটা ছবি গ্রেগরির হাতে দিয়ে বললে, দেখুন ত মডার্ণ দুর্গা-দেবীর একটি ছবি এঁকেছি। দশপ্রহরণধারিণীর হস্তে আর অসভ্য যুগের অস্ত্র নেই, দেখুন বোমা, বন্দুক, রিভলভার, ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন, হাউইট্‌জার, সাবমেরিন্, টর্পেডো, ক্রুইজার ধারণ করে রণরঙ্গিনী মূর্তি মন্দ দেখাচ্ছে না, অসুরের কি মূর্তি করব ভেবে পাচ্ছি না।

—খুব ইণ্টারেস্‌টিং! কিন্তু আপনি যে আপনার early studies-গুলি দেখাবেন বললেন।

—সেই কিশোরী নর্তকীর স্কেচ্‌গুলি ?

—যদি আপত্তি না থাকে।

—গ্রেগরি, আপনি রসিক লোক দেখছি।

নৃত্যময়ী কিশোরী শিপ্রার কতকগুলি রেখাচিত্র বাহির করে কনক গ্রেগরির হাতে দিলে।

উৎসুকভাবে ছবিগুলি দেখতে দেখতে গ্রেগরি বললে, খুব সুন্দর আপনার অঙ্কন, কয়েকটি রেখার টানে দেহের সৌন্দর্য ফুটিয়া উঠিয়াছে।

—আপনি সমজদার লোক, রেখার ফাঁক কল্পনার রঙে ভরে তুলতে পারেন।

—দেখুন, কনক রায় মহাশয়, এই ছবিগুলি দর্শনে আমার যুদ্ধের কথা মনে পড়িতেছে। গত war-এ একবার আমি no man's land-এ আবদ্ধ হইয়াছিলাম।

—সে কি রকম ?

—শেষরাত্রে অর্ডার আসিল, আক্রমণ কর। No man's land-এর ওপর পাগলের মত সকলে ছুটিয়া চলিলাম। এমন সময় অদূরে এক কামানের গোলা আসিয়া পড়িল সম্মুখের এক গর্তে, গোলাটি ফাটিতে গর্ত আরও বড় হইয়া গেল, গর্ত বলা যায় না, একটি শুষ্ক পুষ্করিণীর গর্ত। পদতলের মাটি খসিয়া পড়িল, আমি গড়াইয়া চলিলাম। যখন উঠিয়া বসিলাম, দেখি গর্তের তলদেশে গড়াইয়া আসিয়াছি, আর আমার পার্শ্বে একটি শত্রু-সৈনিক, বোধ হয় সে গর্তের অপর দিক হইতে গড়াইয়া আসিয়াছে। আমার বন্দুক খসিয়া পড়িয়াছে, পকেটে রিভলভার সন্ধান করিলাম। শত্রু-সৈনিকটির হাতেও বন্দুক নাই, সে ভীতভাবে বলিল, যুদ্ধ করিবার এখানে স্থান নাই, আসুন স্থির হইয়া বসিয়া থাকি, উঠিতে চেষ্টা করিবেন না তা হইলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। উপরে ভয়ানক শব্দ। কান বধির হইয়া যায়। দুইজনে স্থির হইয়া পাশাপাশি বসিয়া রহিলাম। সময়ের জ্ঞান নাই। কতকক্ষণ কাটিয়া গেল। একবার উঠিতে চেষ্টা করিলাম। শত্রু-সৈনিকটি জামা টানিল। বলিল, দেখিতেছেন না, উপরে অগ্নিবর্ষণ হইতেছে; স্থির হইয়া বসুন, আক্রমণ শেষ হইলে, রাত্রে উঠিবার চেষ্টা করা যাইবে। আমি বলিলাম, সমস্তদিন এস্থানে বসিয়া থাকিব কিরূপে! পাগল হইয়া যাইব। সে বলিল, আসুন, গল্প করা যাক। মনকে অন্য চিন্তায় নিযুক্ত করুন। তারপর সে কতকগুলি ছবি

পকেট হইতে বাহির করিল, cheap postcards, পৃথিবীর নানা দেশের নানা অভিনেত্রী, নর্তকীর ছবি, আরও নানারূপ ছবি, বুঝিতেছেন। সে বলিল, যখন মন অবসন্ন হয়, আমি ছবি দেখি। আশ্চর্য, জানেন রায় মহাশয়, সেই ছবিগুলি দেখিয়া দিন স্থিরভাবে কাটিয়া গেল; তা না হইলে বোধ হয় সে দিন পাগল হইয়া যাইতাম—শুধু শব্দে, অগ্নিলীলার দীপ্তিতে নয়, ভয়ে সন্দেহে পাগল হইয়া যাইতাম—আপনার ছবি দেখিয়া সেই ছবিগুলির কথা মনে পড়িল।

বিস্মিত হয়ে কনক গ্রেগরির গল্প শুনছিল। হাই তুলে সে বললে, যুদ্ধের অনেক রকম গল্প শুনেছি কিন্তু এ রকম গল্প শুনিনি।

গ্রেগরি বললে, আপনার ঘুম আসিতেছে, আমার কেবল যুদ্ধের কথা মনে পড়িতেছে, বিশেষত এই রেলের ধ্বনি শুনিলে মাঝে মাঝে মনে হয় যেন no man's land-এ আছি, চোখে আর ঘুম আসে না। আপনি নিদ্রা যান, মন্মড়ে জাগাইয়া দিব।

কনক বলিল, ছবিগুলি আপনি রাখুন, দেখুন ভাল করে। আমায় কিন্তু জাগাতে ভুলবেন না।

কনক ওপরের বাঙ্কে শুয়ে পড়ল।

আড়চোখে বিরিঞ্চি ছবিগুলির দিকে চাইছিল। স্বল্প আলোকে ছবিগুলি অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। নারীদেহের নানা ভঙ্গিমা। প্রেমদাসের সামনে ছবিগুলি চেয়ে দেখা যায় না।

চোখ বুজে বিরিঞ্চি পাশ ফিরলে। প্রেমদাস বলেছেন, তোমার মেয়ের বিবাহের জন্য ভাবনা কোরো না, বিরিঞ্চি, নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাও। কিন্তু তার মন হতে চিন্তা যে দূর হচ্ছে না। ঠাকুর যে স্পষ্ট করে বলেন না, যেন একটু রহস্য রাখতে চান। ফতেসিংকে ত বলে দিতে পারতেন, বিরিঞ্চির মেয়ের বিয়ের খরচটা দিয়ে দিও।

বিরিঞ্চি ভাবতে লাগল, ঠাকুরের কথা ত নিষ্ফল হতে পারে না। হয়ত সে অন্য কোন উপায়ে হঠাৎ অনেক টাকা পেয়ে যাবে। এই যে রাধাকান্ত মিত্তিরকে দুপুরে বললেন, তুমি আজ টাকা পেয়ে যাবে, সে ত সত্যিই টাকা ধার পেল। ফতেসিং কি সর্তে টাকা ধার দিচ্ছে, তা জানতে পারে নি। রাধাকান্ত নিশ্চয় টাকা ধার পেয়েছেন, তা না হলে অমন করে ঘুমাতে পারেন!

তার চোখে ঘুম আসছে না। পেটের ব্যথাটা আবার যেন জেগে উঠছে, অসহ্য মনে হচ্ছে।

অস্ফুট আর্তনাদ করে বিরিঞ্চি পার্শ্বপরিবর্তন করলে।

প্রেমদাস বিরিঞ্চির বাঙ্কের পাশে এসে দাঁড়ালেন, ধীরে বললেন, কি কষ্ট হচ্ছে বিরিঞ্চি?

—ঠাকুর, পেটে ব্যথা—

—সব ব্যথা সেরে যাবে।

—ঠাকুর!

—শোন, বিরিঞ্চি, তোমার কন্যার বিবাহের ভার আমি নিলুম, তুমি নিশ্চিন্ত মনে ঘুমাও, মন শান্ত কর! না, না, উঠো না, আমি তোমায় আশীর্বাদ করছি, মন শান্ত কর।

বিরিঞ্চি চমকে উঠল। ঠাকুর তার মনের কথা কেমন করে জানলেন! তার মুখে কোন কথা এল না। বিস্মিত কৃতজ্ঞতার সঙ্গে সে প্রেমদাসের দিকে চাইলে।

প্রেমদাস নিজের বেঞ্চে গিয়ে আবার ধ্যানের আসনে স্তব্ধ হয়ে বসলেন।

বিরিঞ্চি চোখ বুজলে। মাথা যেন তার ঘুরছে, ট্রেন বড় বেশি দুলছে। মনে মনে সে ভগবানের নাম স্মরণ করতে লাগল।

ছোট এক স্টেশনে হঠাৎ ট্রেন থামাতে জগদীশ কুপেতে ফিরে এল, হাতে কাগজ-ভরা মোটা পোর্টফোলিও। তার কালো মুখ আরও রুক্ষ, গম্ভীর, হঠাৎ দেখলে ভয় করে। কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর এনে সে বললে, এখনও ঘুমোওনি তোমরা? অনুপমা তার কদাকার মুখের দিকে চাইলে, কোন উত্তর দিলে না।

মালতী দাঁড়িয়ে উঠে বললে, আমি যাই অনুপমাদি।

অনুপমা মালতীর হাত ধরে বললে, তোকে ধরে রাখব না, কল্যাণের কথাটা ভাবিস্।

মালতী হেসে বললে, সবার কথাই আমি ভাব্‌ব; কোন পক্ষপাত করব না।

প্ল্যাটফর্মের অন্ধকারে মালতী নেমে গেল। তার মূর্তির পাশে পাশে আর একটি কালো ছায়া চলেছে। মনে হল সে কল্যাণ। অনুপমার ইচ্ছা করল সে-ও নেমে চলে যায় রাত্রির স্নিগ্ধ অন্ধকারের মধ্যে।

ড্রেস স্যুট বদ্‌লে জগদীশ নীরবে স্লিপিংস্যুট পরলে। সে গভীর চিন্তায় মগ্ন।

জগদীশ ধীরে বললে, এবার ঘুমাও, রাত অনেক হল।

—ঘুম ত আমার হাতধরা নয়।

—চেষ্টা কর।

—তোমাকে ত চেষ্টা করতে হবে না, তুমি শুয়ে পড়।

—ওষুধটা খাবে?

—আচ্ছা, কষ্ট যদি না হয় ত দাও, আর রাত জাগতে ইচ্ছে করছে না, দেখি যদি ঘুম হয়।

—অত ভেবো না, বসে বসে অত ভাবলে ঘুম আসবে কি করে?'

—বক্তৃতা না দিয়ে ওষুধটা যদি দিতে চাও ত দাও।

জগদীশ নীরবে অনুপমাকে ওষুধ-ভরা গেলাস দিলে।

ওষুধ খেয়ে অনুপমা বললে, duty হয়ে গেছে, এবার শুয়ে পড়।

জগদীশ ধীরে বললে, শোন, কথাটা শুনে তুমি রাগ করবে, বোম্বে পৌঁছে তার পরদিনই আমাদের ফিরতে হবে।

সে আমি জানি, বলে অনুপমা বাইরের আকাশের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসল।

শোন, ইয়োরোপের যুদ্ধ—বলে জগদীশ থেমে গেল।

উচ্চরবে অনুপমা হেসে উঠল। ব্যঙ্গের সহিত বললে, শুয়ে পড়, না হলে কোন official secret বলে ফেলবে।

কথাটা কাউকে বোলো না, বলে জগদীশ ওপরে বাঙ্কে উঠল।

অন্ধকার রাত আরও গভীর হয়ে এসেছে। ওষুধ খেয়েও অনুপমার চোখে ঘুম আসছে না। গাড়ীর আলো নিভিয়ে সে চোখ বুজে ঘুমোতে চাইলে। মাথা দপ্ দপ্ করছে।

অবিরামগতিতে ঝক্‌ঝক্ শব্দে ট্রেন ছুটে চলেছে। দেবপ্রিয়ের বক্তৃতার কথাগুলি অনুপমার মনে পড়ে গেল। ট্রেনের শব্দের মধ্যে সে শুনতে পেলে সৈনিকদলের অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা—চলেছে বন্দুকধারী সৈন্যদল

মোটর-সাইকেলে, চলেছে অগ্নিবর্ষী ট্যাঙ্কের সারি, বোমা-ভরা এরোপ্লেন —রাত্রির অন্ধকারে প্রলয়াগ্নি জলছে।

অনুপমা ভয়ে উঠে বসল। গাড়ীর আলো জেলে দিলে। চুপ করে চেয়ে রইল কালো আকাশের দিকে।

নয়নে তার অশ্রু নেই, জ্বালাও নেই; অন্তরে যেন কোন কামনা নেই, কোন ক্ষোভও নেই, শুধু শ্রান্তি, শুধু সে শান্তি চায়, শান্তিময় সুপ্তি।

এক বড় অজানা স্টেশনে ট্রেন থেমেছে। রাত্রিশেষের অন্ধকার রহস্যময়। টিপ্ টিপ্ বৃষ্টি পড়ছে।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অনুপমা প্ল্যাটফর্মের দিকে চেয়ে রইল। ওপরের বাঙ্কে জগদীশ সুষুপ্ত।

পাশের প্রথম শ্রেণীর গাড়ীর সামনে এক যুবক এসে দাঁড়াল, যোধপুরী ব্রিচেস্-পরা অদ্ভুত মূর্তি; ওই গাড়ীতে বোধ হয় ঢুকতে চায়।

সবিস্ময়ে অনুপমা দেখলে, গাড়ীর দরজা খুলে এক তরুণী নেমে যুবকটির পাশে দাঁড়াল। আর্দ্র বাতাসে তাহাদের মৃদুকণ্ঠের কথাবার্তা ভেসে আসছে।

—ভয় করছে!

—তবে নামলে কেন?

—কি, জেলাস্ জান, না?

—তুমি কি তার সম্পত্তি?

—সত্যি যাবে?

—তবে কি ঠাট্টা করবার জন্যে বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে এলুম। রাতে ঘুমাই নি।

—কাল যে আমার স্যুটিং।

—ওদের ডিরেক্টার আমার বন্ধু, টেলিগ্রাম করে দেব।

—একদিন?

—সে দেখা যাবে, তবে তিনদিনের বেশি নয়, ইলোরার ডাকবাংলো দেখলে আসতে ইচ্ছে করবে না।

—তবে শীগ্‌গীর চলো, জেগে না ওঠে সবাই।

—সেই লেখক না ফিলজফারটিও কি এ গাড়ীতে?

—হাঁ, নিদ্রায় অচৈতন্য। কনক! তুমি আমায় বিপদে ফেলবে।

—অত ভয় ত যাও গাড়ীতে ওঠ গে।

—না, না, খুব exciting লাগছে—তুমি dangerous.

—আর কথা নয়, চলো।

—কোন্ দিকে?

—এদিকের প্ল্যাটফর্মে ট্রেন দাঁড়িয়ে।

—তরুণীর হাত ধরে যুবকটি আর্দ্র অন্ধকারে কোথায় হারিয়ে গেল; চারিদিকে ছায়ামূর্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

জোরে বৃষ্টি এল, ট্রেন দুলে উঠল। অনুপমা জানলার কাচ বন্ধ করে দিলে। বারিবর্ষণমুখর যামিনীর অন্ধকারে ট্রেন ছুটে চলেছে। লৌহচক্রের কর্কশ ঘর্ঘরধ্বনি ছাপিয়ে আকুল বারিধারার সঙ্গীত বাজছে। এ গীতধ্বনিতে অনুপমার চিত্ত ধীরে শান্ত হয়ে আসছে।

যেন ঝড়ের বাতাসে দরজা খুলে গেল। দম্‌কা বৃষ্টির জলের সঙ্গে সমর গাড়ীতে প্রবেশ করলে। স্বপ্নঘোর হতে অনুপমা চমকে চাইল।

—দিদি!

—সমর! ভয়ঙ্কর ভিজে গেছিস্। বোস্ আমার পাশে। এমন ভিজে বেড়াচ্ছ কেন?

—আমার বোম্বে যাওয়া হবে না, সেজন্য তোমার সঙ্গে দেখা করতে এলুম।

—চুপ করে বোস্।

—বসবার সময় নেই দিদি, পরের স্টেশনেই আমায় সরতে হবে।

—চুপে চুপে বল্। কোথা যাবি?

—এখন পুলিশের হাত থেকে ত বাঁচি।

—কোন ভয় নেই।

—যুদ্ধ লেগেছে, ইয়োরোপে। তুমিও বাঁচাতে পারবে না।

—সমর!

—দিদি! তোমার ঘুম ভাঙালুম।

—আমি জেগেছিলুম।

—রাতে কি তোমার ঘুম হয় না?

—ট্রেনের এ শব্দে আমি ঘুমোতে পারছি না; আর ওই লেখকটির বক্তৃতা শুনে, আমি খালি শুনছি যেন সৈন্যদল কামান-গাড়ী টেনে টেনে চলেছে।

—তুমি বড় কল্পনা-প্রবণ।

—ঠিক বলেছিস্। কিন্তু তোর কল্পনাশক্তিও বড় কম নয়, তা না হলে এই রাষ্ট্র, মানব-সমাজ ভেঙে নতুন সভ্যতা সৃষ্টি করবার স্বপ্ন দেখিস্!

—দিদি, নতুন সভ্যতার কথা যাক্, তোমাকে ইয়োরোপে নিয়ে যেতে পারলুম না, এই দুঃখ।

—আমার সঙ্গে কল্‌কাতায় ফিরে চল, আমাদের পুরানো বাগান-বাড়ী ভাল লাগবে।

—আর লোভ দেখিও না। সময় আমার বেশি নেই, তোমার পাশে একটু চুপ করে বসতে দাও।

—মাথাটা কাছে নিয়ে আয়, মুছিয়ে দি।

—দিদি, তোমার বুকে এমন করে মাথা রাখলে ঘুমিয়ে পড়ব, কিন্তু ঘুমোলে আমার চলবে না।

সমর মাথা তুলে বসল। দু'জনে বসে রইল পাশাপাশি। বর্ষণমুখর তমিস্রায় ট্রেন ছুটে চলেছে।

—সমর!

—দিদি!

—মাঝে মাঝে খবর দিও। কাউকে আমি ধরে রাখতে চাই না।

—ধরে রাখাই ত বন্ধন।

—আর ভাবতে পারি না। আমি যে কি বন্দিনী, তুই জানিস্ না।

—আমাদের নতুন সমাজে কেউ বন্দিনী থাকবে না।

—ভেবে ভেবে আমি শ্রান্ত। শান্তি কোথায়?

—আইডিয়লের জন্য সংগ্রামেতেই শান্তি।

—সংগ্রামে শান্তি?

—হাঁ দিদি, তা না হলে কেউ কি প্রাণ দিতে পারত?

—সংগ্রামের শান্তি আমি চাই না, আমি চাই প্রেমের শান্তি।

—অলীক স্বপ্ন!

—চুপ! চুপ করে বোস্, কথায় শুধু কথার সৃষ্টি করে!

সমরের ভিজে কাঁধে মাথা রেখে অনুপমা চোখ বুজে চুপ করে এলিয়ে বসল।

ট্রেন ছুটে চলেছে দুর্নিবার বেগে।

নাসিক স্টেশনে ট্রেন যখন থামল, বৃষ্টি থেমে গেছে, কৃষ্ণ ছিন্ন মেঘদলে ঊষার আলোর আভাস।

সন্ন্যাসী প্রেমদাস আসন হতে উঠলেন। নাসিকে নেমে তিনি পদব্রজে যাবেন, এই সংকল্প তাঁর মনে।

রাধাকান্ত গভীর নিদ্রিত। ওপরে বাঙ্কে বিরিঞ্চি স্থির, স্তব্ধ। প্রেমদাস বিরিঞ্চির সামনে এসে ডাকলেন, বিরিঞ্চি! বিরিঞ্চি!

কোন সাড়া নেই। বিরিঞ্চির দেহে প্রেমদাস ধীরে হাত দিলেন, শীতল দেহ, বক্ষস্পন্দন অনুভব করা যায় না। প্রেমদাস যুক্তকরে এক মুহূর্ত বিরিঞ্চির স্থির শায়িত দেহের সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন, মনে মনে মন্ত্র জপ করতে লাগলেন, হে যম, হে অমোঘ শাশ্বত নিয়ম, তোমাকে প্রণাম।

ধীরে প্রেমদাস প্ল্যাটফর্মে নামলেন। ফতেসিং-এর গাড়ীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। প্রেমদাসকে দেখে ফতেসিং তাড়াতাড়ি নেমে এল।

—ফতেসিং, আমি এখানে নেমে যাচ্ছি।

—এ যে বড় ক্ষণিকের দেখা পেলুম ঠাকুর, বোম্বেতে আসতে কৃপা করুন।

—শোন, রাধাকান্তবাবুর সঙ্গে তোমার বন্দোবস্ত হয়ে গেছে?

—ঠাকুরের যখন সেই রকম ইচ্ছে, আমি দু'লাখ দেব, রাজী হয়েছি। এখন ঠাকুরের আশীর্বাদ।

—আর একটি কাজ, ও গাড়ীতে বিরিঞ্চি বলে একটি বৃদ্ধ লোক আছে, রাধাকান্তকে বলো তার এক অনূঢ়া কন্যার বিবাহের সব ব্যবস্থা করে দিতে; রাধাকান্ত ঘুমোচ্ছে, আমি সেজন্য তোমায় বলে গেলুম। আর ট্রেন বোম্বেতে পৌছালে বিরিঞ্চির সব ব্যবস্থা তুমি কোরো। বোম্বে সহর সে জানত না।

পদধূলি নিয়ে ফতেসিং বললে, এ ত বাবার অনুগ্রহ, আবার কবে দর্শন পাব?

দ্রুতপদে প্রেমদাস এগিয়ে চললেন। অনুপমার সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে হবে।

কুপের সামনে আসতেই সমর তার পথরোধ করে দাঁড়াল।

—কি চান আপনি?

—আমি চলে যাচ্ছি, অনুপমাকে একবার দেখে যেতে চাই।

—ওই দেখুন তিনি শান্ত হয়ে ঘুমচ্ছেন, দূর থেকে দেখে চলে যান। জাগাবেন না।

প্রেমদাস দেখলেন রথীন কুশানের কুপে মাথা রেখে অনুপমা এলিয়ে শুয়ে আছে, ভোরের আলোয় শিশিরভেজা অর্ধস্ফুটা কমলিনীর মত।

—বড় সুন্দর, শান্ত চিত্র। আমি জাগাতে চাই না, একটা কথা তুমি বলতে পারবে?

—কোন কথা বলতে পারব না, কারণ আমিও স্টেশনে চলে যাচ্ছি।

প্রেমদাস যুক্তকরে স্তব্ধ হয়ে অনুপমার দিকে চেয়ে দাঁড়ালেন, মনে মনে কি প্রার্থনা করলেন।

সমর মৃদুস্বরে বললে, শুনুন, আপনি ত সন্ন্যাসী প্রেমদাস ?

—হাঁ।

—আমি একজন কম্যুনিষ্ট। আমাকে পালাতে হচ্ছে। আমি আপনার সঙ্গে যাব। দরকার হলে গৈরিক বসনও পরতে পারি। আপনার শিষ্য বলে, আমাকে কিছুদিন রাখতে হবে। লুকিয়ে থাকবার জন্যে সাহায্য করতে হবে।

—তুমি যে ইয়োরোপে যাবে ?

—না, ঠিক করলুম, ভারতবর্ষেই থাকবো। আমার কাজ এই দেশে, একথা আজ রাতে দিদির পাশে বসে অনুভব করেছি।

—বেশ, চলো, দেরি কোরো না।

—কিন্তু বিপদ আছে, পুলিশ আপনাকে ধরতে পারে।

—সন্ন্যাসী কোন বিপদকে ভয় করে না। ভয়কে জয় করা সাধনার প্রথম অঙ্গ। এগিয়ে চলো।

সমরের বিদায়-করুণ রাত্রিজাগরণপাণ্ডুর মুখের দিকে প্রেমদাস চাইলেন। আবেগের সঙ্গে তিনি সমরকে আলিঙ্গন করে বললেন, আর দেরি নয়, চলো, কোন ভয় নেই।

সমরের হাত ধরে প্রেমদাস দ্রুত চঞ্চল পদে এগিয়ে চললেন। মেঘাচ্ছন্ন ঊষার আকাশের দিকে চেয়ে মনে মনে প্রার্থনা করতে লাগলেন, হে আদিত্য, অন্ধকার পর্জন্যের ঘন আবরণের উপরে তোমার অনির্বাণ অগ্নির চিরজ্যোতি জীবনের প্রতি ক্ষণে দেদীপ্যমান, এ কথা কখনও যেন ভুলে না যাই।

সন্ন্যাসীর সঙ্গে সমর চলে গেল। নিদ্রাতুরা অনুপমা জানতে পারল না, রঙীন কুশানে সে মাথাটা আরও চেপে রাখলে।

১২

বোম্বে স্টেশন।

তেরশ' উনপঞ্চাশ মাইল পাড়ি দিয়ে মেল ট্রেন এসে থেমেছে।

নানা বেশী নানা ভাষী যাত্রীজনতার চঞ্চলবন্যা, প্রভাতের মৃদু আলোক-ভরা প্ল্যাটফর্মে বিচিত্র রহস্যময় মূর্তিস্রোতের মত। হাঁকাহাঁকি, ঠেলাঠেলি, ছুটোছুটির অন্ত নেই।

স্টেশনের এই জনতার দিকে নিদ্রাপ্রফুল্ল চোখে চেয়ে কল্যাণকুমার ঘোষ পাইপে তামাক ভরলে। ইংলণ্ডে সে যে তামাক খেত সে তামাক অনেক খুঁজে যোগাড় করেছিল ; ট্রেন-পথে সে তামাক নিঃশেষিত হল, আর পাবার সম্ভাবনা নেই, এখন পাইপ ছেড়ে আলবোলায় অম্বরী তামাকের ধূমপান করতে হবে, ভায়লেটের-দেওয়া পাইপে ধূলা জমবে।

আর্থার গ্রেগরি উত্তেজিতভাবে এগিয়ে বললে, ঘোষ, কি ভয়ঙ্কর! আবার যুদ্ধ!

গ্রেগরির আর ধুতি-পাঞ্জাবি-পরা বাঙালী সাজ নেই, খাকি-রঙের হাপ্-প্যান্ট ও কোট পরা, পায়ে মোটা বুটজুতা।

কল্যাণ একটু হেসে বললে, এ সজ্জা যে, যুদ্ধে যাচ্ছ নাকি?

গ্রেগরি গম্ভীরভাবে বললে, Surely. I am going to enlist.

কল্যাণ বললে, Moral armament চলল না?

গ্রেগরি আবেগের সঙ্গে বললে, না। Hunsদের সঙ্গে reason চলে না, bombs! bombs!-

বীরপদভরে প্ল্যাটফর্মের কংক্রিট-মেজেতে বুটজুতা ঠুকে গ্রেগরি এগিয়ে গেল।

ছোট্ট ঝকৃঝকে লাইটারের সাহায্যে পাইপে অগ্নিসংযোগ করে কল্যাণ দ্বিতীয় শ্রেণীর মহিলা-গাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। দীপিকা সাজ করে গাড়ীর দরজায় দাঁড়িয়েছিল, কল্যাণকে দেখে গাড়ী হতে লাফিয়ে প্ল্যাটফর্মে নামলে ; ওই আশ্চর্যকর ঝকৃঝকে দেশলাইয়ের ওপর তার লোভ। কল্যাণের হাত ধরে ব্যগ্র হয়ে সে বললে, রাঙামামা, আমাকে দাও একবার, আমি জ্বালাব না, শুধু হাতে ধরে থাকব।

গাড়ীর জানালা হতে মুখ বাড়িয়ে শিবাজী চেঁচিয়ে উঠল, আমি একবার জ্বালাব দিদি!

সরোজিনী ছোট খোকার বিছানা পাট করে বাঁধতে বাঁধতে ধমক দিয়ে উঠল, শিবু, আবার জানালায় মুখ বাড়িয়েছ!

দেশলাই পাবার কোন আশা নেই দেখে শিবাজী চেঁচিয়ে উঠল, রাঙামামা, ইঞ্জিন দেখাবে বলেছিলে, ইঞ্জিন—

সরোজিনী উদ্বিগ্নভাবে বললে, দাদা, টেলিগ্রাম ঠিক করেছিলে? উনি ত এখনও এসে পৌছালেন না!

ভারী নিরেট গুলের মত মাথাটা নেড়ে কল্যাণ গাড়ীর জানলার দিকে এগিয়ে গেল, মালতী সম্বন্ধে সরোজিনীকে যে কথা বলতে চাইছে, সে কথা সে বলতে পারল না, হেসে শুধু বললে, অত ভাবনা কিসের, এতদুর যখন এসেছি, বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দেব।

সরোজিনী খোকাকে জামা পরাতে পরাতে বললে, আচ্ছা, কুলী দিয়ে জিনিসগুলো নামাও ত, আবার—কোথায় যাচ্ছ! না, দাদা, তুমি এখন কোথাও যেও না।

কল্যাণ কোন উত্তর দিলে না, বোধ হয় সরোজিনীর কোন কথা সে শুনতে পায়নি। সে দেখেছে মধ্যম শ্রেণীর গাড়ীর সামনে একটি ছোট ব্যাগ হাতে করে মালতী দাঁড়িয়ে, প্ল্যাটফর্মের জনতার মধ্যে সে

একাকিনী, দিশাহারা নির্বাক দাঁড়িয়ে। পাইপ টানতে টানতে কল্যাণ হন্‌হন্‌ করে এগিয়ে গেল সেদিকে।

প্রভাতের আলোকে মালতীর শুভ্র করুণ মুখশ্রী মায়াময় হয়ে উঠেছে, হালকা নীলশাড়ীর রূপালী পাড় জল্‌জল্‌ করছে।

মালতীর ছোট সুটকেশটা হাতে ধরে তুলে কল্যাণ বললে, মালতী দেবী, একটু দেরি হয়ে গেল আসতে, ক্ষমা করবেন।

মালতী একটু বিস্মিত বিরক্তভাবে কল্যাণের দিকে চাইলে। এ জনতায় সে যাকে খুঁজছে, সে তরুণ এখানে নেই, সে জানে, তবু নিশ্চল দাঁড়িয়ে দুই চোখ দিয়ে খুঁজছে।

কল্যাণ ধীরে বললে, চলুন মিস্‌ মল্লিক, আমার বোনের সঙ্গে আপনার আলাপ করিয়ে দি। আমার ভাগ্নিরা আপনায় পেলে খুশি হবে।

মালতী কোন কথা বললে না। দেহে ক্লান্তি, মনে অবসাদ, নিদ্রাহারা দুই চোখ জল্‌ছে; ভাববার প্রতিবাদ করবার শক্তি যেন তার নেই। ম্লান হেসে সে কল্যাণের সঙ্গে এগিয়ে চলল।

একটু এগিয়ে মালতী কল্যাণের মুখের দিকে চাইলে। তার মন অনেক হালকা হয়ে এসেছে। ধীরে বললে, অনুপমাদিদির গাড়ী কোন্‌ দিকে?

মুখ হতে ধূমের কুণ্ডলী বাহির করে কল্যাণ বললে, সে দিকেই ত যাচ্ছি।

মালতী শ্রান্ত কণ্ঠে বললে, তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করে যেতে চাই।

নির্জল হুইস্কির গেলাস নিঃশেষে শেষ করে গণেশ দেবপ্রিয়ের দিকে

ক্ষুব্ধনয়নে চাইলে। বিরক্তির সঙ্গে বললে, ট্রেনটা যেন থেমে গেছে মনে হচ্ছে, বড় আস্তে চলছে!

দেবপ্রিয় ভাবল গণেশের বুঝি সত্যি নেশা ধরেছে, ট্রেন চলছে কি থেমে আছে বুঝতে পারছে না। একটু ভীতভাবে সে বললে, ট্রেন ত থেমে আছে অনেকক্ষণ, আমরা বোম্বে স্টেশনে পৌছেচি।

শূন্য গেলাস মেজেতে ছুঁড়ে ফেলে গণেশ বলে উঠল, আলবাৎ চলছে ট্রেন, আমার যদি মনে হয় চলছে, ত চলছে—

দেবপ্রিয় কালো চশমা পরে বললে, ঠিক বলেছেন, আমাদের অনুভূতি দিয়ে আমরা জগৎ তৈরি করছি, তার আলাদা সত্তা কোথায়—সবই আপেক্ষিক।

গণেশ দাঁড়িয়ে উঠল। ব্যঙ্গের সুরে বললে, ওহে পণ্ডিত, তোমার ফিলজফি রাখ, ওতে আমায় ভোলাতে পারবে না। এখন শিপ্রা দেবী যে উধাও হল, তার কি করছ?

দেবপ্রিয় গম্ভীরভাবে বললে, ভাবছি, কলিকাতায় কাগজের আফিসে এ খবরটা টেলিগ্রাম করে পাঠাই।

গণেশ হেসে উঠল। বললে, বেশ বেশ, দু'পয়সা হবে। আমার নামটাও দেবে নাকি?

দেবপ্রিয় সঙ্কোচের সঙ্গে বললে, বলেন ত দেব না।

গণেশ দেবপ্রিয়ের পাশে বসে তাকে এক ঝাঁকুনি দিয়ে বললে, না, না, দেবে বৈ কি। আমার মত অনেক fool ত আছে, আমার দুর্দশা দেখে তাঁদের যদি কিছু শিক্ষা হয়!

দেবপ্রিয় বললে, এমন দুর্দশা আর কি? সত্যাই কি দুঃখ হচ্ছে? আমার ও মনে হয় good riddance—আর, এ বিষয়ে—

বাধা দিয়ে গণেশ বললে, দেখুন দেবপ্রিয় বাবু, আপনি এ বিষয়ে কিছু

জানেন না, বোঝেন না, সুতরাং আপনার কি মনে হয় তা আমি শুনতে চাই না, কিন্তু মশাই, আমার না হয় একটু মাত্রা বেশি হয়েছিল, আপনি কি একটু watchও করতে পারলেন না—এমন বোকা বানিয়ে চলে গেল—যাক্, যাবে কোথায়, আবার আসতে হবে। আপনি বলছেন বোম্বেতে আমরা এসে পৌঁছেচি। হাঁ, তাইত মনে হচ্ছে, ওই ত ডিরেক্টার আসছেন, দু'হাতে দুই বড় garland—এখন একটি মালা আপনায় পরতে হচ্ছে মশাই।

দেবপ্রিয় লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল, বিস্মিতভাবে বললে, আমাকে? না, না। চলুন নামা যাক। মা নিশ্চয় ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন।

গণেশ ব্যঙ্গস্বরে বলে উঠল, বড় যে মায়ের কথা মনে পড়ে গেল দেখছি—না, না, পালালে চলবে না—প্যারিস ফেরতের পার্টটা আপনি করবেন, ডিরেক্টারের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে দি।

রেস্তোরাঁ-গাড়ীর বয় এসে পথে আহার্য ও পানীয় সরবরাহ বাবদ বিল হাতে করে গাড়ীর দরজা খুলে দাঁড়াল। শার্টের পকেট হতে কতকগুলি দশ টাকার নোট নিয়ে না গুণে গণেশ বয়ের হাতে দিলে। বিলের মোট অঙ্কটা দেখে দেবপ্রিয় চমকে উঠল, তার তিন মাসের সংসারযাত্রার খরচ এর চেয়ে কম।

ট্রেন থেকে দু'জনে প্ল্যাটফর্মে নামল।

ফোলা-হাতা শার্টের বোতাম একটা ছিঁড়ে গণেশ বললে, আচ্ছা দেবপ্রিয়বাবু আপনি যান—আপনার মা ব্যস্ত হচ্ছেন, বুঝছি—বিকেলের দিকে একবার তাজমহল হোটেলে খোঁজ করবেন—অন্তর্হিতা শিপ্রার না দেখা পেতে পারেন, নর্মদা কাবেরী যমুনা অনেকের দেখা পাবেন—চাই কি, হিমশীতল মর্মরগহ্বর হতে মমতাজ উঠে আসতে পারে আতপ্ত

বক্ষের উষ্ণ শোণিতস্রোতের স্পর্শ পাবার জন্যে—এই ধমনীর জ্বালাময় রক্তধারার ছন্দ—হুঁ, বুঝলেন?

দেবপ্রিয় দেখলে দূরে তার মা কুলীর সাহায্যে গুড়ের নাগরি, ডাব-নারিকেলের বস্তা, ট্রাঙ্ক পুঁটলি সব নামাচ্ছেন। মুখের ভাব বিশেষ প্রসন্ন বলে মনে হয় না।

দেবপ্রিয় তাড়াতাড়ি বললে, গণেশবাবু আপনি যে জীবনরসের রসিক, তা সাধারণ লোকে বুঝতে পারে না—কিন্তু এখন একটু সময় নেই, আপনার সঙ্গে নিশ্চয় দেখা করব, আপনার সঙ্গে পরিচয়ে মুগ্ধ হয়েছি—জীবনের একটা নতুন রূপ—পরে কথা হবে—এখন যেতে হবে।

গণেশ বললে, আপনি সমজদার, তাই বুঝলেন। কিন্তু ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন? আপনার মায়ের গাড়ী—

বাধা দিয়ে দেবপ্রিয় বললে, ওদিকে যদি যান ত আমার মাকে একটু বলে দেবেন অনুগ্রহ করে, আমি এখুনি আসছি, বলবেন, একটা জরুরী টেলিগ্রাম করতে গেছি, খবরটা এখুনি কলিকাতার কাগজের আফিসে না পাঠালে দেরি হয়ে যাবে, আজ বিকেলে ছাপা হবে না—বলবেন, আমি এখুনি আসছি।

দেবপ্রিয় দ্রুতপদে টেলিগ্রাফ আফিসের দিকে এগিয়ে গেল।

সিনেমা-কোম্পানীর ডিরেক্টার সদলবলে আসছে দেখে গণেশ প্রস্তুত হয়ে দাঁড়াল। ভাবতে লাগল, দু-তিন দিনের মধ্যেই শিপ্রা বোম্বেতে এসে তার আশ্রয় ভিক্ষা করবে; তখন স্যুটিং করার দু-তিন দিন দেরির জন্য মোটা খেসারতি তাকেই দিতে হবে, তা ছাড়া আর কে দেবে। পকেটের চেক-বইটা হাত দিয়ে সে চাপড়ালে। এ বিষয়ে ডিরেক্টারের সঙ্গে দর-দস্তুর সে দুপুরেই করে নেবে। তা হলে সন্ধ্যাটা নর্মদা-কাবেরী-যমুনাদের সঙ্গে নির্ভাবনায় কাটান যেতে পারে।

ময়লা দেশী ধুতির জরিপাড় লুটান কোঁচা স্যাণ্ডল দিয়ে মাড়াতে মাড়াতে গণেশ এগিয়ে চলল।

প্রথম শ্রেণীর কুপের সামনে তাজমহল হোটেলের তকমা-পরা লোকেরা জিনিস নামিয়ে গাদা করেছে; হীরা সিং দাঁড়িয়ে আছে নিশ্চল প্রহরীর মত; জগদীশ জরুরী টেলিফোন ও টেলিগ্রাম করতে গেছে, কুপের চেয়ারে অনুপমা এলিয়ে বসে, সিফং-শাড়ীর বিচিত্র বর্ণ কুপের আলোছায়ায় রহস্যময়।

মুগ্ধ হয়ে কল্যাণ দাঁড়াল, এ যেন রেমব্রাণ্টের-আঁকা ছবি, কৃষ্ণ ভ্রূলতার তলে আয়ত নয়নের কৃষ্ণতারকার রূপ তেমনি জ্যোতির্ময়, তেমনি মায়াময়, তেমনি রহস্যঘন।

—কল্যাণ নাকি!

—তাই ত মনে হচ্ছে।

—বোম্বেতে এসে পৌছান গেল।

খোলা দরজার কাছে কল্যাণ এসে দাঁড়াল।

—ভাই, পাইপটা—

—ভেরি সরি, মনে ছিল না।

—মালতী, আয়, অমন দাঁড়িয়ে রইলি কেন!

নিঃশব্দে মালতী কুপেতে উঠে অনুপমার পাশে বসল। শুষ্ক জ্বালাময় নয়ন অশ্রুতে ভরভর। ইচ্ছা করছিল, অনুপমার বুকে মুখ রেখে একটু কাঁদে; কিন্তু অনুপমার সাজসজ্জা, সহাস্যভাব দেখে অশ্রুসম্বরণ করে বসল। বেশিক্ষণ সে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারল না।

তার বিপর্যস্ত শুষ্ক কেশভারে অনুপমা একটু আদরের সঙ্গে হাত বুলাতেই সে যেন ভেঙে পড়ল!

—ভাই অনুদি!

—চলে গেল সমর!

—তোমায় কি কিছু বলে গেছে, কোথায় গেল?

—সে কি নিজে জানে, কোথায় যাবে!

—আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলুম—

—আমিও! স্বপ্ন দেখছিলুম গভীর বন, ফুল আর ফুলে ভরা, একটি নদী বয়ে চলেছে, তার তীরে আমরা সবাই—

হঠাৎ অনুপমা চমকে সোজা হয়ে বসল। গাড়ীর জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আর্তনাদের স্বরে বলে উঠল, ওকি! ওকি! ও কে?

অদূরে প্ল্যাটফর্মে এক প্রৌঢ়ের সাদাশালজড়ান নিস্পন্দ দেহ স্ট্রেচার-বাহীগণ বয়ে নিয়ে চলেছে, শনের মত সাদা চুল প্রভাতের আলোকে চক্‌চক্‌ করছে।

অনুপমার পাংশুবর্ণ মুখের দিকে চেয়ে পাইপটা মুখ থেকে নামিয়ে কল্যাণ বললে, ও আমাদের গাড়ীর এক যাত্রী, রাত্রে কখন মরে গেছে কেউ জানে না, বোম্বে স্টেশনে যখন পৌছাল, দেখা গেল লোকটি আর উঠছে না। তবে সেই সন্ন্যাসী বোধ হয় জানতেন, কারণ তিনি ওই লোকটিকে বলে গেছলেন সব ব্যবস্থা করতে—

আবেগের সঙ্গে অনুপমা বললে, কাকে বলে গেছলেন?

কল্যাণ ধীরে বললে, ওই যে পাগ্‌ড়ি-পরা লোকটি যাচ্ছে, কোটিপতি ফতেচাঁদের নাম শুনেছ বোধ হয়—আর তার পাশে পাশে কোটপ্যাণ্ট পরে যে বাঙালী ভদ্রলোকটি যাচ্ছে, সেও বহু লক্ষপতি—কিন্তু যার

মৃতদেহ তারা সসম্মানে নিয়ে যাচ্ছে, সে রেলওয়ে আফিসের সামান্য কেরানী, টিকিট বিক্রী করে সারাজীবন কাটিয়ে দিলে—

বাধা দিয়ে অনুপমা বললে, চুপ করো! ওদের কথা আমি জানতে চাই না।

মুখ ফিরিয়ে অনুপমা অপর দিকের প্ল্যাটফর্মের দিকে চাইলে, শূন্য প্ল্যাটফর্মের পর অন্ধকার দেওয়াল।

দীপিকা ছুটতে ছুটতে এসে গাড়ীর খোলা দরজার সামনে দাঁড়াল, হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, রাঙামামা, বাবা এসেছেন, মা আপনাকে ডাকছেন, আর খোকা—

বলতে বলতে সে থেমে গেল, বিস্ময়মুগ্ধনেত্রে অনুপমার দিকে চেয়ে রইল। কানের হীরার ফুল কি সুন্দর! হাতের চুড়িগুলি কি ঝক্‌ঝক্ করছে, নখগুলি লাল রঙ করা কেন!

পাইপটা মুখে তুলে কল্যাণ বললে, তা হলে, adieu, উঠুন, মালতী দেবী!

মালতী ধীরে উঠে বললে, তা হলে, এখন যাই ভাই অনুদি!

অনুপমা হেসে বলে উঠল, বলতে হয়, 'আসি'। না, অত কাছে আসিস্ না, আমি যে রোগী, ভুলে যাস্ কেন?

কল্যাণ যেন চমকে অনুপমার দিকে চাইলে। গলাকাটা ব্লাউজের রঙীন লেসের ফাঁক দিয়ে যে সুচিক্কণ শুভ্র চর্মের আভা দেখা যায় তাহারি কোমল আবরণতলে বক্ষপঞ্জরের মধ্যে দক্ষিণ ফুসফুসে জীবন-মৃত্যুর সংগ্রাম চলেছে, হৃদ্‌যন্ত্রের ধক্‌ধক্ শব্দে এখনও ধ্বনিত হচ্ছে, জয় জীবনের জয়!

—**Au revoir!**

পাইপ টানতে টানতে কল্যাণ চলে গেল।

তার পেছনে দীপিকার হাত ধরে মালতী চলে গেল।

স্ট্রেচার-বাহকগণ ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেছে।

ওই, দেবপ্রিয় বাবু ছুটতে ছুটতে চলে গেলেন।

চেয়ারে এলিয়ে বসে অনুপমা কুশানে মাথা রেখে চোখ বুজলে। জগদীশ এখনও এল না।

চোখ বুজতেই, প্রথমে ঘন অন্ধকার, তারপর একটি আলোর শিখা জলে উঠল। সে আলোক-রেখায় দেখা গেল, দুর্গম পর্বত-পথ, বিপুল অরণ্য; বিপদ-সঙ্কুল পথে সন্ন্যাসী চলেছেন, তার পাশে সমর—অনুপমা অনুভব করতে চাইলে, সে-ও চলেছে তাদের সঙ্গে।

পাশের লাইনে একটা ইঞ্জিনের লাইন পারাপারের শব্দে সে ভয়ে শিউরে উঠে চাইলে। এক বৃহৎ কালো ইঞ্জিন-গাড়ী চলতে চলতে থেমে গেছে, আর যেন এগোতে পারছে না, চাকার একটা বিকট কর্কশধ্বনি হল, যেন চাকা ভেঙে গেল, ইঞ্জিন গতিহীন। বৃহৎ অনড় লৌহচক্রের দিকে অনুপমা ভয়ে চাইলে, মনে হল সে চাকা যেন তার গলায় চেপে বুকের ওপর থেমে গেছে, আর নড়ছে না। বুকে কি ভারী বোঝা!

অনুপমা মুখ ঢেকে চোখ বুজলে। অন্ধকার পর্দায় রঙীন স্বপ্নছবির স্রোত আর প্রবাহিত হল না।

তার মাথা টন্‌টন্ করতে লাগল। সে অনুভব করলে, ট্রেন ছুটে চলেছে, অবিরাম ঘূর্ণ্যমান লৌহচক্রের ঘর্ঘরধ্বনি বড় কর্কশ; ছুটে চলেছে চঞ্চল যাত্রীদল, তাদের পদধ্বনি বড় ব্যথা-ভরা; ছুটে চলেছে সৈন্যদল কামান-গাড়ী টানতে টানতে, তাদের অস্ত্রঝঞ্ঝনা কি উন্মাদক; অনন্তগগনে ছুটে চলেছে লক্ষ লক্ষ গ্রহতারকা, কি জ্যোতির্ময় এ

পথ! এ অবিরাম গতিস্রোতে স্থির বিন্দুর মত সে বসে। তার মাথা ঘুরছে যে!

ঠিক সেই সময় জগদীশ এসে না ডাকলে অনুপমা মূর্চ্ছিতা হয়ে পড়ত।

উৎসাহের সঙ্গে জগদীশ বললে, ওগো! শুনছ, হোটেলে যাওয়া নয়, সমুদ্রের ধারে এক সুন্দর বাড়ী পেয়েছি।

অনুপমা ক্লান্ত চোখে চেয়ে বললে, আমার পাশে একটু বোস।

বিস্ময়ের সঙ্গে জগদীশ বললে, না, না, এখন বসবার সময় নেই, ওঠো! শরীর তোমার ভাল লাগছে না?

অনুপমা ধীরে বলে, না, আমি ঠিক আছি। সমুদ্রতীর, সে বেশ সুন্দর হবে, বসে বসে ঢেউ গুনবো। চলো।